علامہ اقبال

(مجموعہ مقالات)

3

(بنگالی)

1991

আল্লামা ইকবাল

তৃতীয় খণ্ড

আল্লামা ইকবাল

সম্পাদনা কমিটি

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন [চেয়ারম্যান]
অধ্যাপক শাহেদ আলী
এস. মুজিবউল্লাহ
প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সৈয়দ তোসারফ আলী
আবদুল ওয়াহিদ

মূল্যঃ ৫০ টাকা
২ ডলার

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা
ফোনঃ ৪১৬৪৩৩

Allama Iqbal

Printed at Masro Printing & Packaging ltd. and Published by
Abdul Wahid, from 109, Nazimuddin Road, Dhaka.
Phone: 416433
Price : Taka 50
US $ 2

IQBAL ACADEMY LIBRARY PAKISTAN
30994
LAHORE

সূচী

পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

১. আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল □ আহমদ নাদিম কাসিমী ৯–৩১
২. মহাকবি ইকবাল □ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৩২–৫৩
৩. আল্লামা ইকবালের জীবন ও কবিতায় সূফী মতবাদের প্রভাব
ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন ৫৪–৫৮
৪. ইকবাল ও কাশ্মীরের আযাদী আন্দোলন
জুলফিকার আহমদ কিসমতী ৫৯–৬৩
৫. ইকবালের খুদী দর্শন ঃ আল্লাহর পথে সত্যের সংগ্রাম
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ৬৪–৭০
৬. আল্লামা ইকবাল স্মরণে □ মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন ৭১–৭৬
৭. ইকবালের ইনসান-ই-কামিল □ ফাহমিদ-উর-রহমান ৭৭–৮৮

অনুবাদ প্রবন্ধ

৮. ইকবাল ও সমকালীন ইসলামী জাগরণ □ সৈয়দ তোসারফ আলী ৮৯–৯৭
৯. ইকবালের হাস্যরস □ মতিউর রহমান মল্লিক/আবু নাঈম ৯৮–১০৫
১০. আল্লামা ইকবালের বন্ধু-বান্ধব □ ছালেহ আহমাদ ১০৬–১০৮
১১. ইকবালের ডায়েরী থেকে □ মোজ্জাম্মেলুল হক ১০৯–১১০
১২. ইকবাল ও সূফীবাদ □ ফারুক আহমাদ খান ১১১–১১৬

পুনর্মুদ্রণ

১৩. ফররুখ আহমদ অনূদিত '*ইকবালের নির্বাচিত কবিতা*'
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌ ১১৭–১২৯
১৪. প্রকৃতির উপর মানব আধিপত্য ঃ ইকবাল দর্শন
ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৩০–১৩৬
১৫. ইকবালের পয়গাম □ গোলাম মোস্তফা ১৩৭–১৪৪
১৬. মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা □ ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল ১৪৫–১৬০

Mullik

সূচী

পৃষ্ঠা

ব্যক্তিত্ব

১৭. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ তাঁর গবেষণা ও সাহিত্য সাধনা
শরীফুল মুজাহিদ ১৬১–১৭৬

ENGLISH ARTICLES

18. The Concept of Sovereignty in the West and in Iqbal's philosophy □ Advocate Mujibur Rahman 177 - 192
19. A Comparative Study of Iqbal and Ghalib
Nazeer Siddiqi 193-199
20. Iqbal and Our National Perspective
Mohammad Nurul Islam 200-203
21. The Origins and Sources of Iqbal's Philosophy
Dr. Waheed Ishrat 204 - 244

22. Allama Iqbal □ Mohammad Ganjidoost 245 - 247

23. Iqbal aur Alami Adab □ Dr. Syed Sajjad Husain 248 - 250

24. Abstract of articles in Bengali
Dr. Syed Sajjad Husain 251 - 252

২৫. 'আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন' শীর্ষক সেমিনার
আহমেদ সেলিম রেজা ২৫৩–২৫৬

যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনঃ উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী
ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন ঃ ইকবাল স্কলার
ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহঃ গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ্ ঃ কবি, লেখক, অনুবাদক, সমালোচক
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ঃ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া,ঢাকা
আহমদ নাদিম কাসিমী ঃ খ্যাতিমান লেখক, অনুবাদক
জুলফিকার আহমদ ফিসমতীঃ সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা
মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেনঃ লেখক, অনুবাদক, সমালোচক
ফাহমিদ-উর-রহমানঃ লেখক, সমালোচক, অনুবাদক
গোলাম মোস্তফাঃ মরহুম, কবি, লেখক, অনুবাদক, বিশ্বনবীর রচয়িতা
ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল ঃ রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রপথিক, নকীব
সৈয়দ তোসারফ আলীঃ সম্পাদকীয় সহকারী, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
মতিউর রহমান মল্লিকঃ খ্যাতিমান কবি, গীতিকার, সুরকার, আশির দশকে ইকবালের কবিতার অনুবাদক
আহমেদ সেলিম রেজাঃ সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
শরীফুল মুজাহিদঃ গ্রন্থকার, লেখক, সমালোচক, অনুবাদক, ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আবু নায়ীম ঃ মাওলানা, হাফেজে কুরআন, গ্রন্থকার, লেখক, অনুবাদক,
ফারুক আহমাদ খানঃ মাওলানা, লেখক, অনুবাদক, সমালোচক
মোজ্জাম্মেলুল হকঃ লেখক, অনুবাদক, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ছালেহ আহমাদঃ লেখক, অনুবাদক, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Syed Sajjad Husain: Former Vice-Chancellor, Rajshahi and Dhaka Universities.

Mujibur Rahman: Senior Advocate, Bangladesh Supreme Court.

Mohammad Ganjidoost: Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Dhaka.

Dr. Waheed Ishrat: Assistant Director, Iqbal Academy Pakistan, Federal Ministry of Education, 27-F Model Town, Lahore, Pakistan

Dr. M. A. K. Khalil : 106 Highland Drive, St. John's Newfoundland, Canada. A1A 3C5

Nazeer Siddiqi: Visiting Professor, Department of Urdu, Peking University, China.

Mohammad Nurul Islam: Vice-Presedent
Islami Bank Bangladesh Ltd.

আমাদের কথা

আল্লামা ইকবাল সংসদের এবারের প্রকাশনা কয়েকটি মূল্যবান বাংলা এবং ইংরেজী প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে ডঃ ওহীদ ইশরাত-এর প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি যে-সব সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সাধারণত সেগুলো সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। প্রথমত তিনি দেখিয়েছেন যে, ইকবাল পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন– একথা সত্য হলেও তাঁর চিন্তাধারার মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর দর্শনের যে উপাদানগুলোকে পাশ্চাত্য প্রভাবজনিত মনে হয়, সেগুলোও আদতে এসেছে কুরআনে কারীম থেকে। ডঃ ইশরাত বিশেষভাবে ইকবালের '*মর্দে মুমিন*' বা '*ইনসানেকামিল*'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এর সাথে জার্মান দার্শনিক নীচের *Superman* বা অতি মানব-এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু, ইকবালের '*মর্দে মুমিন*' একেবারেইভিন্নপ্রকৃতির। নীচের অতিমানব শুধু ক্ষমতার লিপ্সায় মত্ত। কিন্তু, ইকবালের '*মর্দে মুমিন*'' বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর খেলাফত স্বীকার করে। এ খেলাফতের কোন আভাস নীচের দর্শনে নেই। তাই যাঁরা মনে করেন যে, ইকবাল *মর্দে মুমিনের* কথাটা পাশ্চাত্য দর্শন থেকে ধার করেছেন তাঁরা একথা ভুলে যান যে, কুরআন শরীফে মানুষকে আল্লাহর খলীফা হিসেবে নানা জ্ঞান ও গুণে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। খলীফা হিসেবে মানুষের ক্ষমতার সীমা যে কোথায় সে-কথা কোন একটা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারে না এবং এটাই হচ্ছে সৃষ্টি রহস্য। ইকবাল এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই দাবী করেছেন যে, মানুষ তার তাকদীরের স্রষ্টা। দ্বিতীয় যে-কথাটির দিকে ডঃ ইশরাত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো, ইকবালের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ধরন। ইকবাল জালাল উদ্দীন রূমীর ভাবশিষ্য ছিলেন যে-কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। এ কারণে কোন কোন মহলে তিনি সুফী বলেও খ্যাত। তবে, সুফীবাদের মধ্যে বহুদিন থেকে যে দু'টি ধারা প্রবহমান। তার একটি মানুষকে শিরক-এ নিয়ে পৌছায়। এটা হলো '*ওয়াহদাতুল ওজুদ*' তত্ত্ব। অর্থাৎ, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে আদতে কোনো প্রভেদ নেই। ইংরেজীতে এটাকে বলা হয় *Pantheism*। হিন্দু দর্শনে এর নাম অদ্বৈতবাদ। প্যান্থিজম বা অদ্বৈতবাদ বললে যাঁরা আপত্তি করেন, তাঁদেরও অনেক ক্ষেত্রে স্মরণ থাকে না যে, এরই আরবী নাম '*ওয়াহদাতুওজুদ*'। এ বিশ্বাসকে ইসলামে সবচেয়ে বড় পাপ মনে করা হয় এবং এই পাপের অভিযোগে মধ্যযুগে মনছুর আল-হাল্লাজের প্রাণদন্ড হয়েছিলো। ভারতবর্ষে এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) এবং তারপর শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ)। এঁরাও সুফী ছিলেন, কিন্তু এঁদের সুফীতত্ত্বের মূল কথা '*ওয়াহদাতুশ শুহূদ*' – এই তত্ত্বে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটা তফাৎ রক্ষা করেই সুফী অগ্রসর হন এবং এটাই হচ্ছে ইসলামের তৌহিদের ভিত্তি। ইকবালের রচনায় এই '*ওয়াহদাতুশ শুহূদ*'– এর প্রতিফলনই ঘটেছে।

তৃতীয়ত, ডঃ ইশরাত আরও বলেছেন যে, ইকবালের বৈশিষ্ট্য হলো ইজতিহাদ-এ বিশ্বাস। ইজতিহাদ ইসলামের একটি মূলনীতি– একথা ইকবালের মতো সাহস করে আর কেউ বর্তমান শতাব্দীতে বলেননি। ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, এই ইজতিহাদের নীতি পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেই মুসলমান সমাজে এসেছে জড়তা। মধ্যযুগে যে শক্তিবলে মুসলমানরা চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছিলো, অথচ ইসলামের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেই যা সম্ভব হয়েছিলো তার কারণ তাঁরা ইজতিহাদের নীতি অবলম্বন করে জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চায় লিপ্ত হয়েছিলেন; ইসলামকে কতগুলো প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত করেনি। আর ইকবাল দেখিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে আমরা প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ইসলামের তাৎপর্য সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। ফলতঃ মানুষ যে আল্লাহর খলীফা, তার ওপর আল্লাহ যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন– যার কথা বহুবার কুরআনে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে সে-কথা আমরা ভুলেই বসে আছি। অন্ধকারের এমন এক আবর্তে আমরা পতিত হয়েছি, যেখান থেকে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিককালে পাশ্চাত্য জগতে প্রগতির মূলে যে শক্তি ক্রিয়াশীল সেটা তারা মধ্যযুগের ইসলাম থেকেই পেয়েছে। ইকবাল এ জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন সে মূলমন্ত্রটি পুনঃ আবিষ্কার করে নতুন পথে যাত্রা করে।

আমরা আশা করি, ডঃ ইশরাতের প্রবন্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরো কেউ আলোচনা করতে এগিয়ে আসবেন। সম্ভব হলে আমরা ভবিষ্যতে এ প্রবন্ধটির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

তারিখঃ ০১-০৬-৯১

চেয়ারম্যান

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল

আহমদ নাদিম কাসিমী

কোন জাতির জীবনে যখন উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার পরমলগ্ন ঘনিয়ে আসে, সর্বপ্রথম তার মধ্যে নিজের দুর্দশা ও পশ্চাদপদতা সম্পর্কে চেতনা দেখা দেয়। আত্মবিস্মৃত সে জাতির কোন আপনজন ইতিমধ্যে নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন এবং জাগরণীর ঘন্টাধ্বনি (বাঙ্গে দারা) বাজিয়ে নিঃশব্দ, থমকে যাওয়া কারাভাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেন, তাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেন এবং সাধনা ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের নিকট যেদিন মুসলমানদের জড়তা ও পতনের সকল লক্ষণ ও নিদর্শন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেদিনও এমনটিই ঘটেছিল। সেদিন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে এমন সব নেতার আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে মুক্তির নির্ভুল পথের সন্ধান তাঁদের স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং তাদের মৃতপ্রায় অনুভূতিকে উজ্জীবিত করে দিয়ে মহান ভাগ্য নির্মাণের পথে তাদের পরিচালিত করেন।

ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল সে-সব মহান পথিকৃৎদেরই অন্যতম ছিলেন। তিনি জাতির ভবিষ্যত চলার পথের দিক-নির্দেশ করেন। তাঁর জ্বালাময়ী কাব্য, আবেগমুখর মর্সিয়া এবং জাগরণের বাণী জাতিকে মৃত্যুনিখর সুপ্তির অতল গহ্বর থেকে জাগিয়ে তোলে এবং তাঁর একনিষ্ঠ সংগীত মিল্লাতের স্তব্ধ-শীতল চেতনাকে নতুন করে আত্মবিশ্বাসের আগুনে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

ইকবালের পূর্ব পুরুষ

ইকবালের পূর্ব পুরুষ কাশ্মীরী পন্ডিতদের এক অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন। সুলতান জয়নুল আবেদীন ওরফে বুদ শাহ (১৪২১-১৪৭৩ খৃঃ)-এর রাজত্বকালে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ পাঞ্জাবে আগমন করে সিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশের একটি শাখা এখনও কাশ্মীরে রয়ে গেছে এবং এটি 'সাপ্রু' নামে পরিচিত। 'সাপ্রু' কথাটার অর্থ 'এমন কোন ব্যক্তি, যিনি প্রথম পড়া শিখেন বা যিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।' ইকবালের পিতা বলতেন, 'কাশ্মীরী পন্ডিতদের যে-সব জ্ঞাতি ভাই তাদের দীর্ঘদিনের লালিত প্রথা এবং জাতীয় ও ধর্মীয় সম্পর্ক অস্বীকার করে প্রথম ইসলামী ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রবণতা দেখিয়েছেন, তাদেরকে এ নামে অভিহিত করার পেছনে কটাক্ষ বৈ কিছু ছিল না। অবশ্য কালক্রমে এ নামই বংশের স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে এবং বহুল পরিচিত হয়ে

উঠে। কাশ্মীরী পন্ডিতদের বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ মেধা ও দার্শনিক প্রবণতা অনস্বীকার্য। বংশানুক্রমের স্বাভাবিক ধারায় ইকবাল সম্ভবত তাঁর উত্তরাধিকারের প্রাপ্য হিস্যা একটু অধিকই পেয়ে থাকবেন।

বিখ্যাত পাকিস্তানী মনীষী মৌলভী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ কোরেশী ইকবালের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণা করেছেন। তাঁর এই গবেষণার ফলাফলের সারাংশ নিম্নরূপ ঃ 'শেখ নুরুদ্দিন ওয়ালীর সহকারী বাবা নসরুদ্দীনের এমন একজন শিষ্য ছিলেন যাঁর নাম সঠিক জানা যায়নি। অথচ খাজা মুহাম্মদ আজম দীদাহ মারী প্রণীত 'ওয়াকিয়াতে কাশ্মীর' ('তারিখে আজ্মী' নামেও পরিচিত) গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় তাঁর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি বার বছর বিদেশে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। বেশ কয়েকবার পায়ে হেঁটে তিনি মক্কায় গেছেন হজ্জ করতে। এ জন্যই তাঁর নাম হয় বাবা লোল হজ বা লোলী হাজী। তিনি কোলগাম তহসীলের অন্তর্গত আদবুন শহরের উপকণ্ঠে চাক্কু নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মুসলমান হবার পূর্বে তিনি ছিলেন অন্যতম ভূম্যাধিকারী এবং সাপ্রু গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সাপ্রু গোত্রের সে-সব পূর্ব-পুরুষদের তিনি অন্যতম ছিলেন যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ফকীরী জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেবার পর সব কিছু ত্যাগ করেন। পরে তিনি তাঁর ওস্তাদের আস্তানার সাথে সংযুক্ত হয়ে যান এবং যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। শেখ নুরুদ্দিন ওয়ালীর মাজার চত্বরেই তাঁর পীর বাবা নসরুদ্দিনের সমাধির পাশে তাঁর কবর অবস্থিত।

বাবা লোলী হাজীর মিশনকে তাঁর যে-সব শিষ্য এগিয়ে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুহাম্মদ আকবর। তিনি ছিলেন সূফী এবং যা বলতেন তা আমল করতেন। গভীর ধর্মানুরাগের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কয়েকবার পাঞ্জাবে এসেছিলেন। তিনি উচ্চ বংশসম্ভূত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় ওস্তাদ নিজের কন্যার সাথে তাঁর শাদী দেন। ওস্তাদের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। চার পুরুষ পর আফগান শাসনামলে তাঁর অধঃস্তন পুরুষদের চার ভাই কাশ্মীর থেকে হিজরত করে পাঞ্জাব আগমন করেন এবং সিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা হলেন শেখ মুহাম্মদ রমজান, শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও শেখ মুহাম্মদ রফিক। চতুর্থ ভ্রাতার নাম জানা যায়নি। তাঁদের পিতা কাশ্মীরেই থেকে যাওয়াতে সিয়ালকোটে কেউ তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি।

এদের জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতা শেখ মুহাম্মদ রমজান ফার্সীতে সূফীবাদের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায় তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে ছিল। তাঁর কন্যা ছিল, তবে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর পুরুষ বংশীয় ধারার ইতি ঘটে।

দ্বিতীয় ভাই শেখ মুহাম্মদ রফিক সিয়ালকোটে বস্ত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর বড় ছেলে শেখ নূর মুহাম্মদ–যিনি শেখ আতা মুহাম্মদ ও ইকবাল উভয়ের পিতা ছিলেন – তাঁকে তাঁর ব্যবসায় পরিচালনায় সাহায্য করতেন। শেখ রফিকের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ গোলাম মুহাম্মদ সেচ বিভাগে যোগ দেন এবং রুপারে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে শেখ রফিক রুপারে তাঁর ছেলেকে দেখতে গিয়ে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইহলীলা ত্যাগ করেন। সুতরাং ইকবালের পিতামহ রুপারেই সমাহিত রয়েছেন।

তৃতীয় ভ্রাতা শেখ আবদুল্লাহ জৈথিকি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রাম সিয়ালকোট জেলার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অধঃস্তন পুরুষদের অধিকাংশই হায়দরাবাদ রাজ্যে চলে যান। তাঁরা সেখানে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেন।

চতুর্থ ভ্রাতার নাম জানা যায়নি। তিনি লাহোরে বাস করতেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ইকবালের পিতার ডাকনাম ছিল নাথু। কারণ, শিশুকালে তাঁর নাকে নোলক ব্যবহারের সুবিধার জন্য ছিদ্র করা হয়েছিল। তিনি যদিও একজন ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন, তবুও সূফী ও সুধী সমাজে যাতায়াত করে তিনি সূফী মতবাদ ও শরীয়তী বিদ্যা উভয় দিকে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ইকবালের মাতা পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পর পর্যন্ত ইকবালের পিতা বেঁচেছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালের ৯ই নভেম্বর মারা যান। ইকবাল এ উপলক্ষে *'আমার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে যাঁকে আল্লাহ তাঁর রহমতের আশ্রয়ে নিয়ে গেছেন'* শীর্ষক একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা রচনা করেন। আকবর এলাহাবাদীও ইকবালের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশে কতিপয় শ্লোক রচনা করেন। এগুলোতে তিনি ইকবালের জীবনের গঠনমূলক প্রথম দিনগুলোতে তাঁর মায়ের অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ইকবাল তাঁর শৈশবে যে পরিবেশে লালিত–পালিত হন তা ছিল বিদ্যানুরাগ, খোদাভীতি ও ইসলামী আদব–কায়দার সুসমামণ্ডিত এক পবিত্র পরিবেশ।

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা

ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৭ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখে সিয়ালকোটে। সিয়ালকোট সে স্থান–যা অনন্য মনীষী আল্লামা আবদুল হাকিমের বাসস্থানরূপে বিশেষ গৌরবের অধিকারী ছিল। এহেন ঐতিহাসিক গৌরবের অধিকারী শহরেই জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা ইকবাল। দুই ভাই ও চার বোনের তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করার পর ইকবাল সিয়ালকোট স্কচ মিশন হাই স্কুল থেকে ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি স্কচ মিশন কলেজে ভর্তি হন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে শামসুল উলামা মাওলানা সৈয়দ মীর হাসানের কাছে আরবী ও ফার্সী অধ্যয়ন করতে থাকেন। আরবী ও

ফার্সী সাহিত্যে সুপন্ডিত মাওলানা সাহেব ইসলামী শাস্ত্রেরও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও গুণী ব্যক্তি। তাঁর সাহচর্যেই ইকবাল প্রথম সাধনার আস্বাদ লাভ করেন এবং তাঁর সুপ্ত প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। তিনি কবিতা চর্চা শুরু করেন। তাঁর ওস্তাদ মাওলানা মীর হাসান তাঁকে উৎসাহিত করে চললেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কবিতা তাঁর সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলে। সেকালের প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা দাগ দেহলবীর সাথে তিনি পত্রালাপ শুরু করলেন। ইকবাল তাঁর কাছে সংশোধন ও পরামর্শের জন্য তাঁর কবিতা পাঠাতেন। তাঁর স্নেহপরায়ণ শিক্ষকগণ তাঁকে যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা তিনি কখনও ভোলেননি। ১৯০৫ সালে তিনি যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন তখন তিনি *'মুসাফিরের প্রার্থনা'* শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় তিনি জ্ঞানার্জন এবং আরও বহু কাজের সুযোগ কামনার সাথে সাথে সুবোধ সন্তানের ন্যায় পুনরায় শুধু তাঁর পিতা-মাতার পদ চুম্বনের সুযোগই কামনা করেননি, তাঁর ওস্তাদ মীর হাসানের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করেন।

এমনি ধরনের আরও কতকগুলো কবিতায় তিনি দাগ দেহলবী, মাওলানা শিবলী নোমানী, মাওলানা হালী ও মাওলানা গিরমানীর প্রতিও উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর ভক্তি প্রকাশ করেন।

১৮৯৫ সালে সিয়ালকোট থেকে তিনি এফএ পরীক্ষা পাস করেন এবং লাহোরে এসে গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৮৯৭ সালে তিনি কলা বিষয়ে গ্রাজুয়েট হন। এখানে তিনি ডঃ আর্নল্ডের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও প্রতিভার সম্যক পরিচয় দান করেন। লাহোর আগমনের পূর্বে ডক্টর আর্নল্ড আলীগড় কলেজে ছিলেন, সেখানে শিবলীকে তাঁর পান্ডিত্য দ্বারা মুগ্ধ করেন। লাহোরে তিনি ইকবালের মধ্যে একজন প্রতিভাধর ছাত্রের সন্ধান পান এবং তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম স্ফুরণের ব্যাপারে সাহায্য করতে আনন্দ অনুভব করেন। আধুনিক দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'দি প্রিচিং অব ইসলাম'* তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর পরিচালনাধীনে ইকবাল দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যান। ইকবালের পান্ডিত্যধর্মী অধ্যয়নকে তিনি আন্তরিকভাবে অনুমোদন করেন এবং তাঁর দার্শনিক উৎকর্ষের প্রশংসা করে তাঁকে উৎসাহ দান করেন।

এ সময়ে এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হয় যা ইকবালকে অত্যন্ত মর্মাহত করে। একজন ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ধার্মিক ব্যক্তি বিস্ময়জনকভাবে তাঁর নিকট মিথ্যাচার করেন। ইকবাল এতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকদিন এ ব্যাপার নিয়ে অস্থিরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করলেন এবং মনমরা হয়ে রইলেন। কিছুই তাঁর কাছে ভাল লাগছিল না। ইকবালের এই বিমর্ষতার খবর প্রফেসর আর্নল্ডের নিকট পৌঁছলে তিনি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইকবাল গোটা ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললেন। প্রফেসর

আর্নল্ড তাঁর উদ্বেগ অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে কাটিয়ে দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে তোমাকে এমনি ধরনের আরও অসংখ্য ঘটনার মোকাবেলা করতে হবে। এ ধরনের ঘটনাবলী ইকবালের পান্ডিত্যের খ্যাতি আরও বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ইকবাল তাঁর উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য তাঁর মহাজ্ঞানী শিক্ষকের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ বোধ করতেন। ১৯০৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রফেসর আর্নল্ড যখন তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন, ইকবাল তাঁর আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। তিনি 'হারানোর ব্যথা' শীর্ষক একটি কবিতায় তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। অবশেষে পাঞ্জাবের সাথে সকল বন্ধন ছিন্ন করে তিনিও ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি জমালেন।

খ্যাতির সূচনা

লাহোরে অবস্থানকালেই ইকবালের কবিতা জনসাধারণের নিকট পৌঁছতে শুরু করে। তিনি বিভিন্ন মুশা'আরায় (কবিতা পাঠের জলসায়) যোগদান করে শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করেন। তাঁর কবিতার ভাবধারা জীবন্ত ও স্বকীয়তামন্ডিত হওয়াতে তা বিপুল প্রশংসা অর্জন করে।

পরবর্তীকালে যখন যুগের দাবী ও সৌন্দর্য চেতনার তাকিদে তিনি কতিপয় ইংরেজী কবিতার অনুসরণে কবিতা রচনা করেন, তখন তাঁর এ সাধনা বিপুলতর প্রশংসা লাভে ধন্য হয়।

শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ম্যাকলিয়ড এরাবিক রীডার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে লাহোর ইসলামিয়া কলেজে দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তিনি অর্থশাস্ত্রের উপর *'ইলমুল ইকতিছাদ'* নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এটাই ছিল উর্দু ভাষায় উক্ত বিষয়ের উপর রচিত প্রথম প্রামাণ্য পুস্তক।

তিনি যখন এম এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি ল' কলেজেও ভর্তি হন। কিন্তু এখানে তিনি এক পেপারে ফেল করেন। ১৯০১ সালে একস্ট্রা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিয়োগের জন্য পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইকবাল অংশগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল ছিল, মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে স্বাস্থ্যের বিচারে অযোগ্য ঘোষণা করেন। এটা ছিল নির্জলা বে-ইনসাফী এবং এর প্রতিবাদে কয়েকটি সংবাদপত্রে কঠোর মন্তব্যও প্রকাশ করা হয়। এই দুঃখজনক ঘটনার পরই তিনি ইউরোপ যান এবং বার এট-ল' ও ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হন।

এ সময়েই লাহোরে *'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম'* ও *'আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমান'*-এর বার্ষিক সভার জন্য তিনি সে-সব অমর কবিতা রচনা করেন যা তাঁর দ্রুত যশলাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা *'মাখজান'*-এ তাঁর এমন কতকগুলো কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সেগুলোও কম জনপ্রিয় ছিল না। এভাবেই তিনি সমগ্র উপমহাদেশে সুপরিচিত হয়ে পড়েন। তাঁর *'তারানা'*, *'নয়া শিবালা'* এবং অন্যান্য দেশপ্রেমমূলক

কবিতা দেশে সাধারণ জাগরণের এক নবযুগের জন্ম দেয়। তিনি জাতীয় জাগরণ ও রেনেসাঁসের নকীব এবং বাস্তবতার সকল স্বীকৃতি লাভ করেন।

বিদেশে তাঁর অধ্যয়ন

১৯০৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ইকবাল ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। এ কাজ শেষ হবার পর তিনি কন্টিনেন্টে গিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জার্মানী যান। সেখানে পারস্য দর্শনশাস্ত্রের উপর ডক্টরেট থিসিস করে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। জার্মানী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর *'লন্ডন স্কুল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স'*–এ যোগদান করেন এবং সেখান থেকে ডিস্টিংশন সহকারে ব্যারিস্টারী পাস করেন।

তিনি ইংল্যান্ডে ইসলামের উপর ছয়টি ভাষণ দেন, যেগুলো তাঁকে একজন ধর্ম বিষয়ক পন্ডিত হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যখন অধ্যাপক আর্নল্ড কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে মিসরে চলে যান, তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্থলে ইকবালকেই আরবীর অস্থায়ী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাসকাল আরবীর অধ্যাপকরূপে কাজ করবার পর তিনি উপমহাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯০৮ সালের ২৭শে জুলাই রোজ সোমবার লাহোর পৌছেন। শহরের গণ্যমান্য সমাজ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তাঁকে যারা স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে প্রবীণ গুণগ্রাহী এবং বন্ধু–বান্ধববৃন্দ। ইকবাল সকলের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করেন এবং দর্শকগণ লক্ষ্য করেন যে, বিলাত থেকে যারা উন্নাসিক ও দাম্ভিকতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ফেরেন তাদের সাথে তাঁর খুব কমই মিল ছিল। যদিও তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপ ঘুরে তার বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র দেখে এসেছেন, তবুও তাঁর মধ্যে সেই আগেকার সহজ–সরল দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রয়েছে, যা পূর্বেও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইংল্যান্ড গমনের পূর্বে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে দর্শন ও ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এ পদে ইস্তফা দেননি, উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন মাত্র। তিনি পুনরায় তাঁর পুরাতন চাকরি গ্রহণ করেন এবং এখন তাঁকে একই সাথে আইন ব্যবসায়েরও অনুমতি দেয়া হল। প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে হাই কোর্ট এই মর্মে এক আদেশ জারি করে যে, কোন নিম্ন আদালতেই–যে কেসে ইকবালের এটর্নি হিসাবে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে–সেগুলোর শুনানি যেন লাঞ্চের পূর্বে না দেয়া হয়। এই নির্দেশ থেকে ইকবালের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি আড়াই বছর পর্যন্ত শিক্ষক ও আইনজীবীর দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন এবং তারপর অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। তিনি এখন আইন ব্যবসায়ে আরও অধিক

সময় দিতে সমর্থ হন। তাঁর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি জন্য তিনি অধ্যাপক পদে ইস্তফা দেন। ইকবাল উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি যতদিন সরকারী চাকুরে ছিলেন ততদিন তিনি নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারতেন না। তিনি আইনজীবী হয়ে মোটা টাকা কামাবেন – এটা নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর শুধু লক্ষ্য ছিল জীবিকার ব্যবস্থা করা। তাই প্রয়োজনমাফিক অর্থ পেয়ে গেলেই তিনি নতুন কেস নেয়া বন্ধ করে দিতেন। জীবনের শেষ অবধি কখনও তিনি তাঁর এই স্ব–আরোপিত নিয়ম ভঙ্গ করেননি।

নাইট ও অন্যান্য উপাধি

১৯২০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকলসন তাঁর ফার্সী মসনভী '*আসরারেখুদীর*' ইংরেজী তরজমা করেন। একই সময়ে কর্ম সম্পর্কিত ইকবালের দর্শনের উপর কতিপয় রচনা ইউরোপীয় সাময়িকীসমূহে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাঁর মনীষা দর্শনে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। ১৯২২ সালে বৃটিশ সরকার এর স্বীকৃতিস্বরূপ ইকবালকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে। উপমহাদেশের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি–লিট' ডিগ্রী দান করে প্রকারান্তরে নিজেদেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

রাজনীতিক হিসাবে ইকবাল

যদিও ইকবাল চিন্তার ক্ষেত্রে ছিলেন উদার গণতন্ত্রী এবং আজীবন তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর উদ্দীপনাময় কাব্যের মাধ্যমে জগতকে কর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, তবুও বাস্তব অর্থে তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তবে বহু রাজনীতিবিদের চাইতেও তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখরতর। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতে, এমনকি সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবেও ইকবাল ছিলেন অসাধারণ।

একবার তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত বহু চেষ্টা–সাধনার পর তাঁকে পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিভিন্ন পথে দেশ সেবা করতে রাজী করান। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইকবাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সমর্থনে দু'জন বিশিষ্ট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার করলেও আরাইন গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নেতা মালিক মুহাম্মদ উদ্দীনের সাথে তাঁর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইকবালকে এ জন্য কিছুটা ক্যানভাস কার্যেও নামতে হয়। তাঁর নির্বাচনী অভিযান ১৯২৬ সালের ২৩শে নভেম্বর সাফল্যের সাথে শেষ হয় এবং তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। মুসলমানদের একজন দরদী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পাঞ্জাব পরিষদের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং বিভিন্ন পন্থায় কল্যাণকর প্রচুর কাজ সমাধা করেন।

ধর্ম প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ, অশ্লীল ও হীন সমালোচনা প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন প্রণয়নের জন্য তিনি পরিষদে একটি প্রস্তাব উথাপন করেন। ১৯২৬ সালে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয় এবং এটি আজও বলবৎ আছে।

তলোয়ার ব্যবহার যেন ইন্ডিয়ান আর্মস অ্যাক্ট–এর আওতাবহির্ভূত থেকে যায় এইমর্মে তিনি আরেকটি প্রস্তাব উথাপন করেন। এটিও সাফল্যমন্ডিত হয়। এ সম্পর্কে তিনি '*তরবারীরমুক্তি ঘোষণা*' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ '*জরবে কালীমে*' এই কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভূমি কর বন্ধ, মওকুফ বা হ্রাসের দাবী জানিয়ে, আয় কর ও ভূমি করের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে অথবা সরকার যেন সমস্ত ভূসম্পত্তিকে তার মনে না করে এরূপ দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব উথাপনকালে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা ছিল একাধারে তেজস্বী, যুক্তিপূর্ণ ও সুদীর্ঘ। কিন্তু তিনি মনে করতেন, এসব আইন প্রণয়ন ঘটিত কাজের তেমন ফায়দা নেই এবং তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচনে নামার কথা কখনও চিন্তা করেননি।

মাদ্রাজ বক্তৃতাবলী

১৯২৮ সালে ইকবাল ইসলাম সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের জন্য মাদ্রাজে আমন্ত্রিত হন। তিনি ডিসেম্বরের শেষ দিকে সেখানে যান এবং বক্তৃতামালা শেষ করার পর সুলতান টিপুর মাজার জিয়ারত করেন। তাঁর মতে, শ্রীরঙ্গ পত্তনের এই শহীদ প্রকৃত মর্দে মুমিন, সেখান থেকে তিনি হায়দরাবাদ যান এবং সেখানেও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। প্রত্যেক জায়গায় তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর উদ্দেশে অভিনন্দনমূলক স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। তাঁর ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতামালা–যার সংখ্যা ছিল ছয়, উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বক্তৃতামালা '*দি রিকনষ্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পথিকৃতের ভূমিকা

১৯৩০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এরপর তিনি মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এর মাধ্যমে জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্বদান করেন। এ সময়ই তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিকল্পনা পেশ করেন, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩১ সালে তিনি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশে ইংল্যান্ড গমন করেন। বৈঠক শেষে তিনি রোম ও মিসর সফর করেন এবং ফিলিস্তিনে একটি ইসলামী সম্মেলনে

অংশগ্রহণ করেন। রোম ও কায়রোয় তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংস্থার অনুরোধে অনেকগুলো ভাষণদান করেন। এগুলো অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

১৯৩২ সালে ডঃ আনসারীর আমন্ত্রণক্রমে গাজী রউফ বে ভারতবর্ষে আসেন এবং দিল্লীস্থ জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ায় ছয়টি ভাষণ দান করেন। এসব বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা ইকবাল।

একই বছরে তিনি ইংল্যান্ডে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং ফেরার পথে স্পেনে গিয়ে সেখানকার মুসলিম দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময়েই তিনি কর্ডোভা মসজিদ সম্পর্কে তাঁর অমর কবিতা রচনা করেন। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্যতম।

নিঃসঙ্গ জীবন

যতদিন পর্যন্ত তিনি কর্মক্ষম ছিলেন, ততদিন আইনজীবী হিসাবে তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতেন, যখন তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত কারণে তিনি আইন ব্যবসায় বাদ দিয়ে অবসর জীবন যাপনে বাধ্য হন, তখন মুসলিম রাজ্য ভূপাল তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। স্যার রাস মাসউদের অনুরোধে এই রাজ্যের পক্ষ থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য একটি ভাতা মঞ্জুর করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ এই ভাতা পেয়েছেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যু

জীবনের শেষ দিকে তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তাঁকে দেখতে যে-সব বন্ধু-বান্ধব আসতেন, তিনি অনেক কষ্টে তাদের চিনতে পারতেন। তাঁর মূত্রাশয়েও বার বার রোগ দেখা দেয়। ১৯৩৪ সালে তিনি ঈদের নামাজ শেষে বাড়ীতে এসে দুধ দিয়ে সেমাই খান। এর পরই তাঁর গলদেশে রোগ সংক্রমণ হয় এবং তাঁর স্বর বসে যায়। তিনি দেশীয় এবং এলোপ্যাথি উভয় প্রকারের চিকিৎসা করান, কিন্তু রোগের কোন উপশম হয়নি। ১৯৩৫ সালে তাঁর পত্নীর মৃত্যুতে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই রোগ থেকে তিনি আর সেরে উঠেননি। ১৯৩৮ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর হৃদযন্ত্র আর কাজ করতে পারছে না। কারণ, অসুস্থতা ইতিমধ্যেই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মৃত্যুর সামান্য পূর্বে তিনি মুখে মুখে একটা চতুষ্পদী কবিতা আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ

আসবে সুরের হারানো রেশ হয়তো সে আর আসবে না,
হেজায হাওয়া আসবে অশেষ হয়তো সে আর আসবে না
সীমান্তে আজ পড়লো এসে এই ফকীরের দিনগুলি,
আসবে নতুন সুধী এদেশে হয়তো সে আর আসবে না।

আল্লামা ইকবাল

১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল সকাল সোয়া পাঁচটায় মুখে একটুকরা হাসি নিয়ে তিনি চিরবিদায় নিলেন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে। মৃত্যুর সময় তিনি যেন তাঁর কবিতার সেই দু'টি লাইনের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ

মর্দেমুমিন–ঈমানদারের,
নিশানা জানাই শোন,
মরণ লগ্নে হাসি ছাড়া মুখে
চিহ্ন জাগে না কোন।

ইকবালের মাযার

সন্ধ্যার দিকে ইকবালের মরদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় এবং তাঁকে লাহোর বাদশাহী মসজিদের বাইরে এক কোণে দাফন করা হয়। তাঁর সমাধি সৌধের পরিকল্পনা করা হয় বেশ যথোপযুক্তরূপেই। মোগল স্থাপত্যরীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানকারী একটা বেষ্টনী তাঁর কবরকে ঘিরে রেখেছে।

আফগান বাদশার বিশেষ উপহার হিসাবে মূল্যবান সমাধি প্রস্তর আনীত হয়েছে আফগানিস্তান থেকে। তাঁর কবরস্তান এখন সাহস ও সংকল্পের অভিসারী মানুষদের জন্য তীর্থস্থানস্বরূপ এবং এর ছাদে উৎকীর্ণ কবিতার শ্লোকসমূহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু কবি হিসাবে নয়, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাগুরু হিসাবেও ইকবালের ভূমিকা ঘোষণা করছে। এগুলো পড়লেই ইকবাল নিজেকে কোন্ আলোকে দেখেছেন তা বোঝা সম্ভব হবে। সর্বমোট বারটি শ্লোক এখানে রয়েছে। প্রথম চারটিতে কবি হিসাবে, পরের চারটিতে চিন্তাবিদ হিসাবে এবং শেষের চারটিতে শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁর ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

ইকবাল আগাগোড়া সহজ–সরল জীবন যাপন করে গেছেন। আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মতৃপ্তির এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি, তিনি দারিদ্র্যকে আত্মমর্যাদার ভূষণে আবৃত রাখতেন। তিনি কখনও সাহায্য প্রার্থনা করতেন না এবং কারো কাছেই নিজেকে ক্ষুদ্র করে তুলতেন না। তাঁর বৈঠকখানার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ছোট–বড়, ধনী–দরিদ্র, চেনা–অচেনা নির্বিশেষে প্রত্যেকে বিনা বাধায় এবং বিনা আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর নিকট প্রবেশ করতে পারত। তিনি বিশেষভাবে তরুণ মুসলমানদের সাথে দেখা করতে আনন্দ অনুভব করতেন। তিনি তাঁর হৃদয়–এর উত্তাপ দিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াস পেতেন, ইসলামের বিপুল সম্ভাবনায় তাঁর যে গভীর বিশ্বাস ছিল এবং মুসলিম জাতির জন্য যে মমত্ববোধ তিনি অনুভব করতেন তা তাঁর সমগ্র প্রকৃতিকে অনন্য রূপদান করেছিল। ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যাঁদের সাথে ইকবালের সুউচ্চ ভাবধারার তুলনা করা চলে।

তাঁর সন্তান–সন্ততি

ইকবাল তিনবার বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান আফতাব ইকবাল একজন ব্যারিষ্টার। এ পক্ষে তাঁর একটি অত্যন্ত প্রতিভাময়ী কন্যাও ছিল, কিন্তু মাত্র বার বছর বয়সেই তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসবের পর পরই মারা যান। কন্যাটি শিশু বয়সেই প্রাণ ত্যাগ করে। তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দু'জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে–পুত্র জাভেদ ইকবাল এবং কন্যা মুনীরা বানু। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ইকবাল তাঁর উইল করে যান। এতে চার ব্যক্তিকে তাঁর সন্তান–সন্ততিদের জন্য অভিভাবক এবং তাঁর রচনাবলীর এজেন্ট মনোনীত করেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন তাঁর সন্তানদের মামা খাজা আবদুল গনি। তবে তিনি ইকবালের জীবিতাবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন। অপর তিনজন ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন (সুপারিন্টেন্ডেন্ট, প্রেস শাখা, লাহোর), শেখ ইজাজ আহমদ (সাব–জজ, ইকবালের ভাগিনেয়) ও হাকিম মুন্সী তাহির উদ্দিন (দিলরোজ আবিষ্কর্তা)। চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন উইলের প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে বিশ্বস্ততার আদর্শরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর রচনাবলী

ইকবালের সৃজনশীল রচনাবলী তিনটি ভাষায় লিখিত –উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী। উর্দু 'ইলমুল–ইকতিসাদ', 'বাংগে দারা' 'বালে জিব্রিল' ও 'জারবে কলীম'। 'আরমুগানে হিজাজ'–গ্রন্থেও কতিপয় উর্দু কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ফার্সী ভাষায় তাঁর রচনাবলী নিম্নরূপ : 'আসরারে খুদী', 'রমুযে বেখুদী', 'পায়ামে মাশরিক', 'গুলশানে রাজই জদিদ'–সহ 'যবুরে আজম' এবং 'বন্দেগীনামা' 'জাভিদনামা' 'মসনবীয়ে–মুসাফির' 'পাস চেহ বায়াদ কার্দ আয় আকওয়ামে শারক' এবং 'আরমুগানে হিজাজ' (এই গ্রন্থে উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষার কবিতা রয়েছে)।

ইংরেজী রচনাবলী নিম্নরূপ : 'দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস ইন ফার্সিয়া', 'দি রিকনষ্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম', 'এ সোসিওলজিক্যাল সার্ভে অব দি মুসলিম নেশন' ও 'দি ইসলামিক ক্যালিফেট'।

১. ইলমুল ইকতিসাদ – এটি ছিল উর্দু ভাষায় লিখিত অর্থনীতির উপর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ।

২. দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস–ইন ফার্সিয়া – এই থিসিস লিখেই তিনি পি·এইচ–ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মীর হাসানুদ্দিন বিএ,এলএল বি–কৃত এর একটি উর্দু তরজমা গ্রন্থও 'ফালসাফায়ে আজম' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইকবালের নিজের মতে, এই গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্য দর্শনশাস্ত্রের ভাবী ইতিহাস রচনার ভিত্তি নির্মাণ করা। একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থে মৌলিক চিন্তা আশা করা উচিৎ নয়। কারণ,

এর লক্ষ্য ছিল পুরাপুরিভাবেই ঐতিহাসিক। তবুও দু'টি কারণে আমি কিছুটা বিশেষ বিবেচনার দাবী করিঃ

ক· এতে আমি পারস্য চিন্তাধারার যুক্তিনির্ভর ধারাবাহিকতার সন্ধান দিতে প্রয়াস পেয়েছি এবং এ বস্তুটি আমি ব্যাখ্যা করেছি আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ভাষায়।

খ· আমি সূফীবাদকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছি এবং আবির্ভাবের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং সাধারণভাবে গৃহীত অভিমতের বিপরীতে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে, সূফীবাদ তদানীন্তন যুগের বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি এবং সুপ্ত আত্মাকে জীবনের উচ্চতর আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলতে এটা সহায়ক হবে।

৩· বাংগে দারা – এটি ইকবালের কবি জীবনের প্রথম তিনটি পর্যায়ে রচিত নির্বাচিত উর্দু কবিতার সংকলন। ইকবাল তাঁর প্রথম দিকের কিছু কবিতা এতে সন্নিবেশিত করেননি, যদিও সে–সব কবিতা অন্যান্য সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল অথবা '*আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমান*' ও লাহোরস্থ '*আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম*' – এর বিভিন্ন সভায় পঠিত হয়েছিল। মনে হয় তিনি এগুলোকে অসন্তোষজনক মনে করেছেন। যা হোক, বাংগে দারা গ্রন্থখানি ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত বত্রিশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪· বাল–ই–জিব্রিল – এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এর প্রথম অংশে রয়েছে গজল এবং পরবর্তী অংশে রয়েছে চতুষ্পদী কবিতা। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে এর বিশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ইকবাল উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন। কারণ, এতে তিনি গজলের অনুপম মাধ্যমে সে–সব বাস্তবতা, ভবিষ্যত দৃষ্টি ও শিক্ষা তুলে ধরেছেন যা জাতির মধ্যে আন্তরিকতা ও সুদৃঢ় আস্থার ভিত্তি নির্মাণে সাহায্য করে এবং পাশ্চাত্যের মোহমায়ার হাতছানি থেকে মুক্ত করে মিল্লাতের সদস্যদের খাঁটি মু'মিনে পরিণত করে।

৫· জরবে কালীম – এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে এবং কবি একে বর্ণনা করেছেন বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা বলে। এই গ্রন্থে একটি প্রস্তাবনা পর্ব রয়েছে। বাকী অংশ বিভিন্ন গজল ও কবিতাসহ মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলো নিম্নরূপ ঃ

১· ইসলাম ও মুসলিম। ২· শিক্ষা ও সন্তান পালন। ৩· নারী সমাজ। ৪· সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প। ৫· প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতি। ৬· মেহরাব গুল–আফগানের চিন্তাধারা।

প্রতিটি বিষয়ে ইকবালের অনবদ্য অভিমত, সে বিষয়ে শেষ কথার মত এবং তাঁর ভাবধারার মধ্যে যে বাণী ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে তা সমস্ত জাতি ও দেশ–এর মুক্তির কারণ হতে পারে।

এই গ্রন্থের আঠারটি সংস্করণ এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে।

৬· এ সোসিওলজিক্যাল সার্ভে অব দি মুসলিম নেশন এবং দি ইসলামিক ক্যালিফেট – এগুলো ইংরেজী প্রদত্ত ইকবালের দু'টি ভাষণের শিরোনামার প্রথমটি মাওলানা জফর আলী খান কর্তৃক এবং দ্বিতীয়টি চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত হয়েছে।

৭· আসরারে খুদী – এটি ফার্সী ভাষায় ইকবালের প্রথম গ্রন্থ, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতে ইকবাল বিভিন্ন উপায়ে প্রমাণ করেছেন যে, সমগ্র বিশ্বজগত খুদীর নির্দেশ মেনে চলে। প্রেমে উজ্জীবিত খুদী এ জগতের মধ্যে এবং এর বাইরে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইকবাল খুদী ধ্বংসের নিন্দা করেন, খুদীর অভিব্যক্তি ও চেতনাকে তিনি বরং জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন। কোন পথে খুদীর অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে সেটা দেখিয়ে ইকবাল খুদী নিখুঁত স্তরে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে, তার সাথে আমাদের পরিচিত করে দেন। খুদী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে সমর্থ করে তোলে। এই গ্রন্থ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৮· রমুযে বেখুদী – এটি প্রকৃত প্রস্তাবে *'আসরারে খুদীর'* দ্বিতীয় অংশ। ১৯১৮ সালে এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থদ্বয় এক ভল্যুমে প্রকাশিত হয়। এতে ইকবাল তাঁর বক্তব্য জোরালো করার উদ্দেশে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে প্রমাণ করেন যে, একটি জাতির জীবনীশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে ইসলামী জীবনপদ্ধতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান। যে–কোন ব্যক্তির উচিত একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা, তবে একবার এ কাজ সমাধা হওয়ার পর জাতির কল্যাণের খাতিরে ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দেয়া উচিত। যদিও গ্রন্থখানি মুসলিম জাতির উদ্দেশে নিবেদিত, তবুও *'আসরারে খুদী ও রমুযে বেখুদী'* –উভয় মসনবীতে ইকবাল গোটা মানবজাতির উদ্দেশেই কথা বলেছেন বলে মনে হয়। এসব মসনবীতেই ইকবাল ব্যক্তি ও জাতি সম্পর্কে আধুনিক যুগের বিভিন্ন ভ্রান্ত তত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির নিরাপত্তা, অস্তিত্ব, ধারাবাহিকতা ও উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের সঠিক পন্থা নির্দেশ করেছেন।

৯· পায়ামে মাশরিক – এটি বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটের *'দি ভান'* কাব্যের জওয়াব। ১৯২৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এটির চৌদ্দ সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে। এর পেছনকার মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, আমি পায়ামে মাশরিক সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করি না। 'দি ভান' প্রকাশের একশ' বছর পর এটি প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকসমাজ নিজেরাই দেখতে পাবেন এর প্রধান উদ্দেশ্য সে–সব নৈতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় বাস্তবতা তুলে ধরা যেগুলো ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মিক প্রেরণার সাথে সম্পর্কিত। প্রাচ্য, বিশেষতঃ মুসলিম প্রাচ্য সবেমাত্র তার কয়েক শতাব্দীর দীর্ঘ নিদ্রা থেকে

জেগে উঠেছে। কিন্তু প্রাচ্যের জাতিনিচয়কে বুঝতে হবে যে, আত্মার গভীর বিপ্লব সংঘটিত না হলে জীবনের বাহ্যিক পরিবেশে বিপ্লব আসতে পারে না এবং মানব হৃদয়ে প্রথম অংকুরণ না হলে নতুন জগত সৃষ্টি বাস্তবে সম্ভব নয়। প্রকৃতির যে অমোঘ বিধান অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় আল-কোরআনে ঘোষিত হয়েছে- 'আল্লাহ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যে জাতি নিজে নিজে তার ভাগ্যকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে না' তা জীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং আমার ফার্সী রচনাবলীতে এই সত্যটিকেই আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

গ্যাটে দুঃখ করেছেন, পাশ্চাত্য বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় জড়বাদী হয়ে পড়েছে এবং এ জন্য আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হবার জন্য তিনি প্রাচ্যের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। একশ' বছর চলে যাবার পর ইকবাল পাশ্চাত্য দেশসমূহের উদ্দেশে এই শিক্ষার বাণী প্রচার করেন। এতে তিনি নৈতিকতা, ধর্ম ও সভ্যতার গুরুত্ব তাদের স্মরণ করিয়ে দেন এবং আবেগ, অনুভূতি, গতিশীলতা, কর্মোদ্দীপনা ও প্রেম চর্চার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইউরোপের কাছে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আধ্যাত্মিকতা কী তা অনুধাবন করা না হলে জীবন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

১০· যবুরে আজম – *'মসনবীয়ে গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ'* এবং *'বন্দেগীনামা'* ও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালের জুন মাসে। দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে। ইকবালের *'মসনবী গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাবিস্ত্রীর *'গুলশান-ই-রাজ'*- এর অনুসরণে রচিত মূল গ্রন্থের ন্যায় এখানে ইকবাল তাঁর মসনবীতে প্রথমে নয়টি প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং পরে নিজেই তিনি সেগুলোর জওয়াব দান করেন। তিনি আধুনিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্তার একত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দান করে দেখিয়েছেন-এটা কিভাবে কর্মজগতকে প্রভাবিত করে।

'বন্দেগীনামা' প্রকৃতপক্ষে গোলামী ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে একটি জোরালো অভিযান। দাসত্ব সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে এর শুরু এবং পরবর্তী পর্যায়ের দাসদের সুকুমার শিল্প সম্পর্কে এতে মন্তব্য রয়েছে। আযাদ মানুষের স্থাপত্যের ভূমিকা দিয়ে কবিতাটির ইতি টানা হয়েছে।

১১· জাভেদনামা – এটি ইতালীয় কবি দান্তের *'দি ডিভাইন কমেডি'* অনুসরণেলিখিত। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। জিন্দারূদ (জীবন প্রবাহ)-রূপে ইকবাল তাঁর ওস্তাদ রুমী কর্তৃক পরিচালিত হয়ে খোদার সন্নিধানে গমনের এবং খোদায়ী নূরের তাজাল্লীর সংস্পর্শে যাবার সম্মান লাভ করেন।

১২· *'পাস চেহ বায়াদ কার্দ আয় আকওয়ামে শারক'* এবং *'মসনবীয়ে মুসাফির'* এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এটি সাতবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এখানে ইকবাল তাঁর শিক্ষক রুমীর জবানীতে সুসংবাদ দান করেন। 'প্রাচ্য তার গভীর সুপ্তি থেকে জেগে

উঠেছে'। রুমী এখানেও ইকবালের মুখপাত্ররূপে হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরআউনের প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করেন, তিনি তৌহীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতিই জাতির জীবনীশক্তি। স্বেচ্ছামূলক দারিদ্র্য ও আযাদ মানুষের প্রেরণাদায়ী বিবরণী ও ব্যাখ্যা দানের পর এ গ্রন্থে ইসলামী বিধানের ও সূফী ভাবধারার রহস্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি ভারতীয়দের মতভেদে দুঃখ করে একতার বাণী প্রচার করেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দান করেন এবং আরবদেরকে তাদের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সব শেষে পাশ্চাত্য বিশ্বের রাজনীতির ফলে প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কাটিয়ে জেগে উঠতে তিনি প্রাচ্যের প্রতি উপদেশ দেন।

'মসনবীয়ে মুসাফির' আফগানিস্তান সফরের স্মৃতিকথা। এই মসনবীতে সীমান্তের জনগণকে 'ইসলামের মর্মবাণী' শিক্ষা করে তিনি তাদের নিজেদের মধ্যে 'খুদী' সৃষ্টির উপদেশ দিয়েছেন।

১৩· 'আরমুগানে হিজায'–ইকবাল মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায়ই এই গ্রন্থের কাজ সম্পূর্ণ করেন। তবে, এটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে। এর দু'টি অংশ, প্রথম অংশে ফার্সী ভাষায় রচিত চতুষ্পদী (রুবাইয়াত) ও দ্বিতীয় খন্ডে কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। যেমন 'আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে' 'রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সান্নিধ্যে' 'মিল্লাতের দরবারে' 'মানবতার দরবারে' 'সহযাত্রীদের উদ্দেশে' ইত্যাদি। এসব কবিতায় এমন একটা ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কবি যেন কল্পনায় হেজাযের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছেন। এসব ছোট কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবধারার গভীরতা ও অনুভূতির প্রখরতা।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে '*শয়তানের পরিষদ*' এবং '*পুত্রের প্রতি বৃদ্ধ বালুচের উপদেশ*' 'চিত্র ও চিত্রকর' 'দোযখ' 'গায়েবী আওয়াজ' এবং 'মোল্লাজাদা জয়নাল লোলাটী কাশ্মীরী' কবি প্রতিকৃতি' ও অন্যান্য উর্দু কবিতা। এসব কবিতায় আধুনিক যুগের কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। কতিপয় সুরক্ষিত গূঢ় রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন এবং নির্ভুল পথের নির্দেশদানে এগুলো সাহায্য করে। এগারতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

১৪· '*দি রিকনষ্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*' – এটি মাদ্রাজ হায়দরাবাদ রাজ্যে ইকবালের প্রদত্ত ছয়টি ভাষণের সংকলন। ১৯৩০ সালে লাহোর থেকে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে সম্ভাব্য রদ–বদল ছিল এবং একটি অতিরিক্ত ভাষণ ছিল। তৃতীয় সংস্করণ পুনরায় লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের কতিপয় প্রধান বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, দর্শনের নিরিখে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আল্লাহর ধারণা, প্রার্থনার মর্মকথা, মানবীয় অহম এবং তকদীর, স্বাধীন ইচ্ছা, মুসলিম তমদ্দুনের মর্মবাণী, ইসলামে আন্দোলনের নীতি (অর্থাৎ, ইজতিহাদ)।

এই সকল ভাষণে ইকবাল আমাদের নিকট একটি আধুনিক ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। এসব বিষয় তিনি ইসলাম ও আধুনিক দর্শনের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং এতে করে তিনি আধুনিক যুগের চিন্তাবিদদের জন্য ইসলামী গবেষণার নতুন দিগন্ত তুলে ধরেছেন। এসব ভাষণ সৈয়দ নজীর নিয়াজী কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত এবং ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইকবালের চিন্তাধারার সাথে পরিচয়ের জন্য এসব ভাষণ পাঠ অপরিহার্য। এসব গ্রন্থ ছাড়াও ইকবালের পত্রাবলীর কয়েকটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। অনায়াসে রচিত সাবলীল ভাষার এসব পত্র ভাব কল্পনার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান।

তাঁর ইংরেজী ও উর্দুতে লিখিত বেশ কিছুসংখ্যক রচনা বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলো এবং তাঁর অন্যান্য ভাষণ, বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাণী বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয়ে কতিপয় সংস্থার উদ্যোগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- 'স্ট্রে রিফেক্সনস' 'গুফতারে ইকবাল' 'মাকালাত-ই-ইকবাল' 'হরফ-এ-ইকবাল।'

জীবনদর্শন

দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়া (এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের উর্দু তরজমা) গ্রন্থে ইকবালের জীবনদর্শনের নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়েছেঃ

১. ইসলামের প্রতি ইকবালের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তিনি মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম উৎসাহী প্রচারক। তাঁর মতে, আল্লাহ চিরন্তন স্রষ্টা। আল্লাহ সব সময় সৃষ্টি করে চলেছেন, এই সৃষ্টিকার্যের এক মুহূর্তের তরেও বিরাম নেই। জীবন সৃজনশীলতা ছাড়া কিছুই নয় (মানুষ নিজের জীবনের কার্যকারণ পরম্পরা সম্পর্কে সচেতন হলে তাঁর সৃষ্টিশীলতার গতি নির্দেশ করতে পারে)।

২. মানুষের বিবর্তন আল্লার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মধ্যে এসে একটা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। নবুয়তের পদ তাঁর মধ্যেই সমাপ্তি লাভ করেছে এবং এখানেই নবুয়তের শেষ। জীবনের সমস্ত মৌলিক বাস্তবতা এখানেই রয়ে গেছে। আল্লাহর অবতীর্ণ শেষ কিতাব আল-কোরআনে সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে এবং মানুষের অনন্ত বিকাশের পথ এখন উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ইসলামী মিল্লাতের কখনও ইজতিহাদের নীতি ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, প্রকৃত জীবন এবং তার লক্ষ্যের সর্বোত্তম লালন অবিরাম সংগ্রাম ও নিরন্তর ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। জীবনের উপকরণাদি পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু ধারণার পুনর্গঠন এবং মূল্যবোধ গঠনের ব্যাপারে কোরআন সব সময় বিবর্তন ও বিকাশের প্রতিটি স্তর নিয়ন্ত্রণ করবে।

৩. মানুষের উচিৎ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়বিধ বাস্তবতার উপর নিয়ন্ত্রণ সাধনের মাধ্যমে তার বোধ ও শক্তি বৃদ্ধি করে চলা।

৪· ইকবাল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে সমালোচনামুখর। তিনি ইউরোপের সংকীর্ণমনা যুক্তিবাদ ও জড়বাদে বিক্ষুব্ধ। মুসলমানরা কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের মত এগিয়ে যাক এটা তিনি চান। কিন্তু একই সাথে তিনি চান তারা যেন জড়বাদী ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ ঘটিয়ে একে মানবতার সর্বোচ্চ রূপে রূপান্তরিত করেন।

৫· জীবনের সর্বস্তরে তিনি কামনা করেন ইসলামী বিধানের প্রতি আনুগত্য, অন্য কিছুর প্রতি নয়।

৬· ইকবালের মতে, ইসলামের মৌলিক অনুশাসন ও বিধানাবলীর প্রতি কঠোর আনুগত্য কোন ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও শুদ্ধির জন্য অপরিহার্য। তিনি অবশ্য যে-কোন কিছুর বাহ্যিক দিকের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

৭· ইকবাল অনৈসলামী যে-সব উপাদান ইসলামী শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেগুলো বর্জন করতে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তবে রুমীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ সূফীদের রচনাবলীর মধ্যে যে খাঁটি সারবত্তা দেখতে পাওয়া যায় সে-সবের প্রতি তিনি অনুমোদন ও আস্থা জানিয়েছেন।

৮· দার্শনিক হিসাবে ইকবাল সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদী।

৯· খুদীর পরিচয় লাভ ও উন্নতি বিধান ইকবালের বিশেষ উপজীব্য। আল্লাহকে চিনতে হলে খুদীকে চিনতে হয়। এ ধারণা সুপ্রাচীন। কিন্তু ইকবাল একে এমনভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দান করেন যার নজীর নেই।

১০· খুদী ছাড়াও ইকবাল প্রেম সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী। প্রেমকে তিনি খোদায়ী গুণ মনে করেন। যুক্তিবাদী চিন্তা নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না, একমাত্র প্রেমই ঐশ্বরিক ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টিদান করতে পারে। এই মরমী জ্ঞান ও প্রজ্ঞাও একটি পুরাতন বিষয়। কিন্তু ইকবালের অনুভূতি ও পারদর্শিতা এবং তাঁর অসাধারণ কবি প্রতিভা একে অনন্য বিস্তৃতি, প্রাণময়তা ও গভীরতা দান করেছে। একজন চিন্তাবিদ হিসাবে ইকবাল ইসলামী মিল্লাতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম বিবেচিত হওয়ার দাবীদার। মুসলমানদের চেতনা ও অবচেতন অবস্থা তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিকে নিরন্তর ব্যাপৃত রেখেছে। তাঁর সময়ের সমস্ত চিন্তাবিদ ও নেতাদের মধ্যে একমাত্র ইকবালই মুসলমানদেরকে নৈরাশ্যের কুয়াশা কাটিয়ে স্বাধীনতা ও গবেষণার পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হন এবং তাঁর প্রভাব এই উপমহাদেশের সীমানার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে এবং তা শুধু আফগানিস্তান ও ইরান নয়, আরব বিশ্ব এবং পাশ্চাত্য জগতেও অনুভূত হচ্ছে।

তাঁর মত ব্যক্তি সমগ্র মানব সমাজকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারেন। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব বহু শতাব্দীর ব্যবধানে সৃষ্টি হয়।

যুগান্তকারী ভূমিকা পালন

একজন মহান কবি, চিন্তাবিদ ও সংস্কারক হিসাবে ইকবাল প্রশংসনীয়ভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। জীবনে তাঁর লক্ষ্য অর্জনে তিনি কি পন্থা অবলম্বন করেন এবং কিভাবে তিনি তাতে সফল হন – সেদিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যাক। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ কোরেশী কর্তৃক বর্ণিত এ কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক ঃ

ইকবালের বহুমুখী প্রতিভা ছিল বিচিত্র পথগামী, আর তাঁর আগ্রহের অভিব্যক্তি ছিল ব্যাপকভিত্তিক। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রেই শুধু নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করেননি, দর্শনের ক্ষেত্রেও নতুন ধারণার জন্মদান করেছেন। তাঁর দার্শনিকতা ও নৈতিকতাস্নাত কবিতা মৃতপ্রায় জাতিকে নব জীবন দান করে।

দার্শনিক শুষ্ক ও প্রাণহীন পদ্ধতিতে সত্যকে বিশ্লেষণ করলেও কবি বাস্তবতার যে ভাষ্য রচনা করেন তা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। একজন দার্শনিক বিশ্বজগতের যে চিত্র উপলব্ধি করেন সেটা তাঁর বহিরাকৃতি, এটাই তিনি তাঁর উপলব্ধিজাত আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তু নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু ইকবাল বলেন, এটা কবির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর কবিতা সার্থক, অনর্থক যা–ই হোক না কেন, ধরা–ছোঁয়ার যোগ্য নয়।

আসল কথা হল একজন কবিকে অসংখ্য অসুবিধার মোকাবেলা করতে হয় এবং এর একটি এই যে, যখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান তখন সর্বপ্রথম তাঁকে রচনাশৈলী ও স্টাইলের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তাঁর এমন একটা পন্থা খুঁজে বের করতে হয় যার মাধ্যমে প্রকাশ সহজতর হয়। তাঁর সাফল্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। তিনি তাঁর প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করে তোলেন, ভাষা নিয়ে খেলেন যাদু। যদিও প্রতিটি শব্দই অভিধানে পাওয়া যায় এবং এগুলো কোন কবিরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তবুও একজন কবি একে তাঁর নিজস্ব করে তুলতে পারেন এবং বিশেষভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপর নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে দিতে পারেন। ফলে শব্দগুলো তাঁর নিজস্ব হয়ে যায়, অভিধানের থাকে না। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এমন কতিপয় স্তর থাকতে পারে যখন কবি নিজস্ব রচনাশৈলী গড়ে তুলতে রীতিমত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটান। এসব স্তর অবহেলা করে কবির সৃজনী প্রয়াস অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইকবাল একবার এই জটিলতায় এত বিক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, সাধারণ লোক জানে না একজন কবিকে কত পরিশ্রম করতে হয়। তারা তো শুধু তৈরী কবিতাই দেখে থাকে। সেই সূক্ষ্ম আত্মিক যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র খবর তারা রাখে না, যা না হলে যথার্থ শব্দ যথার্থ স্থানে সাজানো সম্ভবপর হত না, যখনই তোমরা সুন্দর কবিতার একটি বা দু'টি লাইন দেখতে পাবে, মনে রাখবে এর পেছনে কোন যীশুখৃষ্টের ক্রুশযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা রয়ে গেছে। একটি সুন্দর অভিধারার জন্মদান অর্থ হল একাধিক অসুন্দরের প্রায়শ্চিত্ত সাধন।

এ সম্পর্কে কোন শব্দই নেই যে, ইকবাল প্রকৃতপক্ষেই ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিশ্বজগতের হৃদয়তন্ত্রীর উত্তাপ, এর জীবনের নাভির স্পন্দন অনুভব করেছিলেন এবং প্রাণোচ্ছল ভঙ্গি ও সুরের মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গজল রচনার মাধ্যমে তিনি যাত্রা শুরু করলেও গজলের সম্রাট হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সাময়িক আবেগ ও স্বপ্রিয় অনুভূতিকে বিদায় জানিয়ে উচ্চমার্গে উড্ডয়নের জন্যই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ-জন্যই তাঁর চোখ খুঁজে ফিরেছিল সে সব দিগন্ত, যেখানে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা, বিপুলায়তন ও বিস্ময়কর গগনচুম্বী শৃঙ্গ এবং আদিগন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত উপত্যকারাজি। তাঁর হৃদয় কল্পনা করছিল নক্ষত্র জগতের উর্ধ্বে আর এক অদৃশ্য জগতের।

লেখক হিসাবে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে অধিকতর আস্থাবান হয়ে উঠার পরই ইকবাল কবিতার অন্যান্য প্রশস্ততর আঙ্গিকের দিকে মন দেন। অবশ্য তিনি গজল রচনা একেবারে বাদ দেননি। ডাঃ শেফায়েত আহমদ এ সম্পর্কে বলেনঃ শুরু থেকেই ইকবাল অনুভব করতেন তাঁর জীবনের একটি লক্ষ্য, একটি মিশন রয়েছে, কিন্তু এটা যে আসলে কি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও জানতেন না। তিনি অনুভব করতেন যে, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজি সব কিছুর মধ্যেই রহস্য লুক্কায়িত আছে। সত্যের সন্ধানে তিনি এর প্রত্যেকের প্রতিই প্রশ্ন উথাপন করতেন। মোমবাতিকে তিনি প্রশ্ন করেন, পতঙ্গ তাকে ভালবাসে কেন? বর্ণাঢ্য ফুলকে তিনি আদর জানিয়ে বলেন যে, তার দৃষ্টি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন চোখের দৃষ্টি বৈ নয়, আর আশা করেন এতে করে তাকে হয়তো তার গোপন কথা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। তার ভাষায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের কালিমামুক্ত হিমালয়ের সাদামাটা অস্তিত্বের রহস্যের কাহিনী শুনতে তিনি করেন আকুলতা প্রকাশ। এমনকি রেলের তলার স্লীপারের নিকট দিয়ে যাবার সময় এগুলোও তাঁর নজর এড়ায়নি। তিনি তাদের কাছে তাদের শেষ পরিণতি জানতে চেয়েছেন। সমস্ত বস্তুই নানা প্রকার আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলেছে এবং এটা-ওটা সম্পর্কে তাঁকে কিছু জ্ঞানদান করেছে।

একস্থান থেকে হয়তো তিনি অন্তহীন জিজ্ঞাসার শিক্ষা লাভ করেছেন, অন্যান্য জায়গায় চির সুন্দর এবং একত্ব ও বহুত্বের রহস্যাবলী তাঁর সম্মুখে নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। অন্য কোথাও হয়তো সৌন্দর্যের মর্মান্তিক পরিণতি তাঁর অস্তিত্বে কাঁপন তুলেছে। কিন্তু তখনও তিনি এসবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেননি। প্রতিটি বস্তুকেই মনে হয়েছে অন্য সব কিছু সম্পর্কে উদাসীন এবং তার যেন একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র বক্তব্য রয়েছে। কবি এই বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান খুঁজে ফিরেছেন, এমন একটা একত্ব যা শুধু তাঁর জন্য আশ্বস্ততার উৎস হিসাবেই কাজ করে না; বরং বিশ্বকে আলোকিত করার জ্যোতিও প্রমাণিত হয়। এই ইতস্তত ছুটাছুটি, এই ভবঘুরে, এই অতৃপ্তি ও উত্তেজনার কারণে প্রায় সব সময় তিনি অস্থির থাকতেন এবং এক মুহূর্তও শান্তি পেতেন না। নদীর সংকীর্ণতার রোগ থেকে তিনি দূরে থাকতে চাইতেন

এবং সমুদ্রের প্রসারতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ন্যায় উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠতেন প্রায়শই। তিনি কামনার ঝলকরূপী এই জীবন সম্পর্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন এবং ফুলের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করতেন। কারণ, ফুলের জীবনে কামনারূপী অগ্নির দহন নেই এবং যদিও ফুল দরবারের রওনক বৃদ্ধি করে, তবুও তার হুলোড় থেকে সে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। কতক কবিতায় তিনি এমন একটা কিছুর সন্ধানে রয়েছেন যা তাঁকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে। তিনি এমন একটা কিছু খুঁজেছেন যার কোন সূত্র হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তিনি কতকগুলো সমস্যার সাথে সংগ্রাম করে চলছেন, তিনি এগুলোর সমাধান চান, অথচ এ জন্য কোত্থেকে শুরু করতে হবে তা–ই বুঝে উঠতে পারছেন না। বার বার মনে এমন সব প্রশ্নের উদয় হচ্ছে যার কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। যখন নিজের অস্থিরতার উন্মাদনায় তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেন, গঙ্গা নদীর প্রসারতার কাছে প্রার্থনা জানান তার বক্ষে তাঁকে গ্রহণ করতে, যেন সেখানে তিনি ডুবে যেতে পারেন।

এতদিন পর্যন্ত তাঁর সংগীতের একটি মাত্র সুর ছিল বেদনার বাণী, ফেরেশতার আন্দোলন নয়। কিন্তু তিনি কখনও নিজেকে হতাশার সাগরে ডুবে যেতে দেননি। তিনি তখনও তাঁর পাখার শক্তি পরিমাপ করে স্বস্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলে চলেছেন। অমানিশার অন্ধকারে তিনি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেতেন। এমনি সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, হজরত বেলাল (রাঃ)–এর পদচিহ্ন অনুসরণ করলে তাঁর দুঃখ–যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন, আর বেলালের নিকট প্রেম তো ছিল এক ধরনের সুমিষ্ট যন্ত্রণা, যা এক মুহূর্তের বিরামে বিশ্বাস করত না। এসব সময়ে তিনি কন্টকময় সমস্যাটির সমাধানের আনন্দ উপভোগ করতেন এবং তাঁর নিষ্ফল প্রচেষ্টার শত ফসলের আনন্দলাভ করতেন।

এ সময়েই ইকবাল *'তারানায়ে হিন্দ'* এবং *'হামারা ওয়াতান'* প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী কবিতা রচনা করেন। তিনি দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য দেখে মর্মাহত হন। মাতৃভূমির সন্তানদের মধ্যেকার মতানৈক্য তাঁর কাছে দুঃখজনক লেগেছিল। তিনি বার বার তাঁর স্বদেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, এদেশের বুকে মুসীবত নেমে আসার আর বিলম্ব নেই এবং একে ধ্বংস করতে বিধাতার দরবারে আলোচনা নিশ্চয়ই শুরু হয়েছে।

সংক্ষেপে যুগের উদ্বেগ, অস্থিরতা ও উত্তেজনা ছিল সেই দার্শনিক উপদেশ ও গাম্ভীর্যের স্তরের ভূমিকাস্বরূপ। ইকবাল ইউরোপ সফরের পর একথা বলতে সমর্থ হন যে, তাঁর সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অস্তিত্বের ঠিক মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করছে। খুদীর দরবারে এমন সময় ঝটিকা সৃষ্টি হল যখন ইচ্ছার সংগীত শোনা যাচ্ছিল এবং সিফতের বুৎখানায় রহমতের নহবৎ বেজে উঠল। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতেই কোন না কোন গূঢ় রহস্য প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর কাছে মনে হয় প্রেম, সৌন্দর্য ও সত্য প্রকৃত প্রস্তাবে একই বস্তুতে পরিণতি লাভ করছে। ক্রমে ক্রমে সব

কিছুই তাঁর কাছে প্রেমের বাণীবাহক বলে মনে হয়, কিন্তু এ প্রেম শুধু প্রেম ছিল না, এর দৃষ্টিতে ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর জন্য কোন পরোয়া ছিল না, তিনি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, একটা কর্মমুখর জীবনকে এ সব কিছুই নিস্তব্ধ করতে পারে না।

তিনি যখন বিদেশ গমন করলেন, জানতে পারলেন যে, ইউরোপে স্বদেশপ্রীতি সেখানকার জনগণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঠুলিতে এমনভাবে অন্ধ করে রেখেছে যে, অন্যান্য জাতির দুঃখ-বেদনায় তারা একদম অবিচলিত থাকে। তারা শুধু সারা জগতের সম্পদ লুণ্ঠন করে তা নিজেদের করায়ত্ত করতে উদগ্রীব। ইউরোপীয়দের এই অহংসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মর্মাহত করে এবং তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, যদি সব মানুষ একটি পরিবারের অন্তর্গত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে এতটা বৈষম্য থাকবে কেন? এই শোষণ আর কতদিন চলবে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যা করতে কোমর বেঁধেছে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি তাছাড়া আর কিছুই নয়?

এই অস্থির মনোভাব বহু কবিতায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।—কতগুলো কবিতায় এই অনুসন্ধান ও প্রত্যাশার উল্লেখ দেখা যায়।— ক্রমে এই সব জটিলতা এমনিতেই সহজ হয়ে আসতে লাগল। পর্দা বিদূরিত হল এবং রহস্য প্রকাশ পেতে লাগল। যে-সব প্রশ্ন কবি মনকে এতদিন অধীর করেছিল তার জবাব পাওয়া যেতে লাগল এবং তাঁর যন্ত্রণাকাতর আত্মা কিছুটা শান্ত হতে লাগল।

এ যুগের পরবর্তী ভাগের কবিতায় এসব প্রশ্নের কোনও বিস্তারিত জবাব দেখা যায় না। তবে এখানে-সেখানে যে সব নিদর্শন মেলে তাতে প্রমাণিত হয় যে, এই উত্তর সৃষ্টির পালা শুরু হয়ে গেছে। যে বিষয়টা তাঁকে সবচাইতে বেশী উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তা ছিল, ইউরোপীয়রা কি কখনও স্বার্থান্ধ ও অহংসর্বস্ব আচরণের পথ ত্যাগ করবে না? খোদার দুনিয়ায় শোষণ ও লুণ্ঠনের ধারাই কি অব্যাহত থাকবে? শক্তিমান কি সব সময় দুর্বলের উপর অত্যাচার করে চলবে? এসব বিয়োগান্ত পরিণতি থেকে বিশ্বকে মুক্ত করবার কি কোনই উপায় নেই? কিন্তু তিনি যখনই ইসলামের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করলেন, তাঁর উদ্বেগ আপনা-আপনিই উঠে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, এর সব কিছুই একদিন দূরে চলে যাবে। সময় বদলে যাবে। চাকচিক্যময় সভ্যতা, যা মানুষের চোখে আজ এত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, তা শীঘ্রই তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলবে। ইসলামের আদর্শ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং যে কথা মানুষের মনে এতদিন বোবা হয়ে রয়ে গিয়েছিল তা এখন প্রতিটি বাজারে ও সড়কে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাঁর একটি কবিতায় এই ভাবধারাগুলো তিনি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।—ইকবাল সুস্পষ্টভাবে তাঁর এই সংকল্প ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তাঁর কবি প্রতিভার সবটুকু শক্তি মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে ব্যয় করবেন এবং তাঁর পশ্চাৎপদ মিল্লাতকে পুনরায় সাহস সঞ্চয় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন।

এসব বিষয়ে চিন্তার পর তিনি মুসলমানদের তাদের জড়তাগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠতে এবং তাদের গোলামীর অবসান ঘটাতে একটি কর্ম পরিকল্পনা রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত যে, মুসলমানদের সামনে রয়েছে এক গৌরবময় ভবিষ্যত এবং পৃথিবীর ভবিষ্যত আশা-ভরসা তাদের উপরই নির্ভর করছে। তিনি জাতিকে তৌহীদবাদ, ভ্রাতৃত্ব ও কর্ম প্রেরণার বাণী শিক্ষা দেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তাঁর মিল্লাতের উচিত নিজেদের জানা আত্মবিশ্বাস চর্চা করা, তাদের নিজেদের সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া এবং এসব নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা। কারণ, এতে করেই তারা উন্নতির ও বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারবে। তিনি সবর, ঈমান, তাওয়াক্কুল, ইবাদাত, স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য ও সন্তোষ প্রভৃতি শব্দের এক ধরনের ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেন এবং এসব ধারণার প্রকৃত অনুশীলন ও প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে জাতির প্রতি আহবান জানান। যদিও রুমীর আবেগ ও আনন্দানুভূতি এবং রাজীর উষ্মা ও ক্রোধের মধ্যকার সংঘাতের এই স্তরে অথবা জাতি, দেশ ও বৃহত্তর বিশ্বের প্রতি তাঁর বাণীতে তিনি যা কিছু বলেছেন তার সব কিছুই ছিল ছন্দে, তবুও তাঁর কবিতা তাঁর মতামত, ভাবধারা ও চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে।

খুদী সম্পর্কে ধারণা ঃ ইকবালের চিন্তাধারা মানবজীবনের সব দিক সম্বন্ধেই সমান সচেতন। ধর্ম বা বিশ্বাস, নীতিশাস্ত্র বা সভ্যতা, সংস্কৃতি বা রাজনীতি যে বিষয়েই হোক, এর মধ্যে সব কিছুই স্থান পেয়েছে, সব কিছুরই উপলব্ধি রয়েছে এতে। ইকবালের চিন্তা পদ্ধতি এবং তাঁর দার্শনিক শিক্ষা একটি একক উৎস থেকে গৃহীত। ইকবাল যাকে বলেন খুদী-তাঁর বাদবাকী চিন্তাধারা শুধুমাত্র এই ধারণার সাথেই আবর্তিত, এর সাথে বৈজ্ঞানিকও যুক্তিনির্ভরভাবে সংযুক্ত এবং সেগুলো এর শাখা-প্রশাখা ও অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। এই ধারণার খুদী নামকরণের পূর্বে ইকবালকে কঠিন মানসিক যন্ত্রণার স্তর অতিক্রম করতে হয়। তিনি খুদী শব্দটাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যাদান করে সকলকে হকচকিয়ে দেন।

ইকবাল স্বয়ং বলেনঃ খুদী শব্দটিকে অতিকষ্টে এবং নির্লিপ্ততা সহকারে নির্বাচন করা হয়েছিল। সাহিত্যের দৃষ্টিতে এর ত্রুটি বহু এবং নীতিশাস্ত্রে ও উর্দু-ফার্সী উভয় ভাষাতেই একে সাধারণত খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়, এর অন্যান্য দার্শনিক প্রতিশব্দ যেমন সমভাবে খারাপ অর্থজ্ঞাপক। আত্ম বা অহম-এর এমন একটা নিরপেক্ষ প্রতিশব্দ দরকার ছিল যার কোন নীতিশাস্ত্র ঘটিত তাৎপর্য থাকবে না। আমি যতদূর জানি, উর্দু বা ফার্সীতে এমন কোন শব্দ নেই। ফার্সী শব্দও একইরূপ ত্রুটিপূর্ণ। যা-ই হোক, কবিতার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার ধারণা হল, খুদী শব্দটা সবচাইতে উপযুক্ত হবে।

ইকবালের দৃষ্টিতে খুদী শব্দটার অর্থ আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংরক্ষণ এমনকি জীবনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আত্মদাবী এবং মৃত্যুর মোকাবেলা ও সত্য, সুবিচার, কর্তব্য প্রভৃতির প্রতি অটল থাকার শক্তি। তাঁর মতে, এই আচরণ নীতিসম্মত। কারণ, এতে করে ভাঙন ও অবলুপ্তির শক্তির বিরুদ্ধে অহমের শক্তিসমূহের সংহতি ও দৃঢ়তা আনয়নে

সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্রীয় অহম খোদায়ী আইনের নির্ধারিত দু'টি অধিকার–জীবন ধারণের অধিকার এবং স্বাধীনতা অধিকারের বাহক।

ইকবাল তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর বাণী সাফল্যমণ্ডিত হবে। তাই দেখা যায় যে, ১২–৪–১৬ তারিখে মহারাজা কিষান প্রসাদকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আসরারে খুদী', শীর্ষক এই মসনবী একটি উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিত। আমি মেজাজ ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মরমী উন্মাদনা, আনন্দ ও হর্ষোৎফুল্লতার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু যিনি আমার জীবন, আমার সম্পদ এবং আমার মর্যাদার নিয়ন্ত্রক, সেই এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এটা আমার নিজের স্বাধীন উচ্ছামত রচনা করিনি, আমাকে এটা রচনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমার আশ্চর্য লাগে যে, কেন এ বিষয়ে লিখতে আমাকে বেছে নেয়া হয়েছে। এর দ্বিতীয় অংশ 'রমুযে বেখুদী' শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, এটাই আমার একমাত্র কর্তব্য এবং সম্ভবত শুধু এটাই আমার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। আমি জানতাম যে, এমন অনেকে আছেন যারা এর বিরোধিতা করবেন। কারণ, আমরা সকলেই এক পতন যুগের সৃষ্টি। আর পতনশীলতা সবচাইতে শক্তিশালী যে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তা হল, এর শিকারের কাছে–তা সে জাতিই হোক, ব্যক্তিই হোক, তার সমস্ত উপাদান–উপকরণ ও কারণই আকর্ষণীয় ও বাঞ্ছিত বলে মনে হয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, দুর্ভাগা শিকার সে–সব কারণকেই তার জন্য সর্বোত্তম কল্যাণপ্রদ ধারণা করে, যার ফলে তার পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু 'আমি তো অনাগত যুগের কবি'। এবং 'আমি বিশ্বাস হারিয়েছি আমার পুরনো সাথীদের উপর, আমার সিনাইয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যাতে মূসাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়।'

ইকবালের বিরুদ্ধবাদী ও ইকবাল কেউই এখানে বেশী দিন থাকবে না, কিন্তু ইকবাল শুষ্ক জমিনে যে বীজ বপন করেছে তা একদিন অঙ্কুরিত হবেই, সে চারা একদিন বেড়ে উঠবেই এবং সমস্ত বিরোধিতার মধ্য দিয়েও তা একদিন ফুলে–ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। আমাকে এর জীবনীশক্তির ওয়াদা দেয়া হয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ তা'য়ালার প্রাপ্য'।

ইকবালের এই জীবনদায়িনী বাণীই আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে এবং আমাদের রক্ত প্রবাহের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যুগ–যুগান্তের ঘুমন্ত জাতি এভাবেই জেগে উঠল। নব উদ্যম ও আত্মনির্ভরশীলতার একটা আবেগ জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল এবং ক্রমে তা বিস্তৃত হয়ে চলল। সে গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলে আযাদ জাতিতে পরিণত হল এবং ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করল। এই স্বপ্নেরই ফসল পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের পথ ধরেই আজকের বাংলাদেশ। *[ইকবাল শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত]*

মহাকবি ইকবাল

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মহাকালকে আত্মিক বা তাত্ত্বিক সত্তা যেভাবেই ভাবা যাক্ না কেন, তার প্রবহমানতা বা গতিকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে–কালের গতি অবিচ্ছিন্ন–তার আদি ও অন্ত আজও মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত। তবু আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাতে রেখা টেনে ভাগ করি এবং পুরাতন, মধ্য ও আধুনিক যুগ বলে তাতে তিনটে পর্যায়ের সৃষ্টি করি। আধুনিক যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনের ইতিহাসবিদ মিলি বলেন–"বর্তমান কালের ইতিহাসের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চিন্তার পুনর্জাগরণ, সমালোচনা করার মনোবৃত্তির জন্মলাভ, গুরুবাদের ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নির্বিশেষবাদ *(Absolutism)* ও সংঘবাদের *(Collectivism)* বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চিন্তায়, অনুভূতিতে ও কার্যে স্বাধীনতার দাবী। রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের ক্রান্তিকাল থেকে যে প্রভাব ছিল কার্যকরী–তাই পরবর্তী শতাব্দীতে রয়েছে ক্রিয়াশীল এবং এখন পর্যন্ত তা শান্ত হয়নি।* এ মতবাদের পোষকতায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা হয়–দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের গ্রীক মনীষার সাথে বর্তমান কালের সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে মধ্যযুগ ছিল বর্তমান কালের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। গ্রীকদের চিন্তা রাজ্যে কোন আপ্তবাক্য *(Authority)* বা কোন সংঘবদ্ধ চিন্তার শাসন ছিল না। ছোট ছোট নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মনীষীরই আপনার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল। এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণার ফল কোন ধর্ম সংক্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। সক্রেটিস, প্লেটো বা এরিস্টটলের চিন্তাধারায় তাই স্বাধীন মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি কাব্যে ও নাটকে সেই সাশ্রয়ী মানসের স্বাক্ষর রয়েছে। হোমার, সকোক্লিস, এসকাইলাইস প্রমুখ মহাকবি ও নাট্যকারের অমর অবদানে এ সত্যই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে। মতামত ব্যক্ত করার প্রবৃত্তি প্রাচীনকালে ছিল–এ থিয়োরী সত্য হলেও প্রচলিত প্রত্যয় বা রীতি–নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা সে যুগেও শাস্তি লাভ করেছে। সক্রেটিসের জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ–আবার মধ্যযুগেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উদাহরণ রয়েছে। সেলজুক্ বাদশাহ্ মালিক শাহের আমলে তার উজির নিমাজ–উল–মূলক প্রতিষ্ঠিত নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ওমর খৈয়াম তাঁর *'রুবাইয়াতে'* যে–সব আদিম ও সার্বজনীন প্রশ্ন উথাপন করেছেন– তার তুলনা করলে অতি আধুনিক তত্ত্ব–জিজ্ঞাসাও ম্লান হয়ে পড়ে। আবার এ বিংশ শতাব্দীতেই টি, এস, এলিয়ট তাঁর কাব্যে ধর্মাশ্রিত দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

---

* ১। *History of Philosophy – By Frank Thilly -p 226*

এ বিভাগকে তাই সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেও তার মধ্যে ব্যতিক্রমের অবকাশ রয়েছে বলে স্বীকার করতেই হবে, এ বিভাগ করার মূলে রয়েছে যে মানদন্ড তাকে স্বাধীন চিন্তা বা ধর্মসংক্রান্ত প্রত্যয়শীলতা বলেও গ্রহণ করা যায় না। স্বাধীন চিন্তার মূলেও রয়েছে জীবন-দর্শনসম্ভূত প্রত্যয়শীলতা -আর ধর্মকেন্দ্রিক প্রত্যয়শীলতাতে যে এক প্রচন্ড জীবনবোধ রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কোন জীবন-বেদ ব্যতীত যে সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব নয় তা যে-কোন মহাকাব্যের বিশ্লেষণেই প্রমাণিত হয়। হোমার বা বাল্মীকির কাব্যে আমরা সে প্রত্যয়শীলতারই নিদর্শন পাই-ইলিয়ট ও ওডিসিতে যে প্রত্যয়শীলতা-'সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়' নামক নীতির স্বীকৃতিতে প্রমাণিত হয়, রামায়ণেও সে নীতিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে পার্থক্য এই -রামায়ণের সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্যেও সে নীতির কার্যকারিতা দেখা যায়। সকোক্লিসের নাটকাদিতে নিয়তির অমোঘ বিধানের উপর নাট্যকারের অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বিশেষত্ব হচ্ছে ধর্মীয় প্রত্যয়শীলতার পটভূমিতে জীবনের সমালোচনা করার প্রবৃত্তি। এ জন্যই সে যুগের কাব্যকে ধর্মীয় বাণী থেকে পৃথক করা কষ্টসাধ্য। জালাল-উদ-দীন রুমীর মসনবীতে একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও কাব্য-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। মরমী তত্ত্ববাদী যেমন এ কাব্য থেকে তাঁর সাধনার অনুকূল প্রেরণার উৎসের সন্ধান পান- তেমনি কাব্য-রস-পিপাসু রসিকজন তাতে উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ আবিষ্কার করে অভিভূত হন।

এ ধারা মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও এখনও তার ইতি হয়নি। বাঙলা কাব্যের বৈষ্ণব পদাবলীতে সে ধারারই অনুসরণ দেখা যায়। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কাব্যের পটভূমিকায় এবং মীরার ভজনে সে মানসিকতাই বর্তমান। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাউলদের গানে সে ধারার অনুবর্তন লক্ষিত হয়।

এভাবে কাব্যের মধ্যে ধর্মীয় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকায় তাকে দু'দিক থেকেই বিচার করার সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান কালের সূচনায় জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যেভাবে পৃথক করা হয়েছে- মধ্যযুগে সে পার্থক্য এত উৎকট হয়ে দেখা দেয়নি বলে একই মানসে তা কোথাও ধর্মের আবেগরূপে, কোথাও কাব্যের অনুরাগরূপে অপরূপ ভঙ্গিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। সম্ভবত এ জন্যই মধ্যযুগীয় কাব্য সাধনা তথা ধর্মীয় প্রত্যয়শীলতার ফল cult-এ পরিণত হয়েছে।

আমাদের আধুনিক মানস স্বভাবতঃই স্বাশ্রয়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী। সে জন্য ধর্মাশ্রিত কাব্যকে সত্যিকার কবি মনের প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কাব্যের রয়েছে এ সার্বজনীন আবেগ। এ দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেখানেই মানুষ থাক না কেন-সেখানেই কাব্যের আদর হয় বলে তাকে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। ধর্মের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতা থাকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীতমুখীন ভাবধারা থাকায় কোন বিশিষ্ট ধর্মের অনুসারীর মর্মবাণী অপর ধর্মের মানুষের মনে আবেগের সৃষ্টিতে

সক্ষম কি-না-সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে। আবেগের বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করলে এবংবিধ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বলে প্রতিভাত হয়। তবে মানব-মানসের দিক থেকে (From the subjective standpoint) বিচার করলে বুঝতে পারা যায়- ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও ধর্মের মধ্যে রয়েছে এক মহান ঐক্য। মানব-মন স্বভাবতঃই বহির্মুখীন এবং তার স্বাভাবিক প্রবণতার দরুনই এ বিশ্বের পশ্চাদপটে বিরাজমান আদিসত্তাকে জানতে চায়। জ্ঞানের এ প্রেরণাই তাকে তার সীমাবদ্ধ জীবনের পরিস্থিতি থেকে সীমাহীন সত্তার অন্বেষণে ধাবিত করে। জীবনের এ জোরালো চাহিদার তৃপ্তি সাধনে তৎপর রয়েছে বলেই মানব-মানস ধর্মমুখীন। সে তৃপ্তির জন্য যে-সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অথবা যে-সব ধারণার আশ্রয় লওয়া হয়- সেগুলো ধর্মের রাজ্যে মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে - মনের যে আদিম চাহিদা এবং তার তৃপ্তির জন্য মানব-মানসের বহির্গমন। ধর্মীয় আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য যে-সব ধারণা গ্রহণ করা হয় - সেগুলো মানব-জীবনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেগুলো ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ রূপায়িত দেখে তৃপ্তি লাভ করে। কোথাও আদর্শকে প্রেমিক হিসাবে, কোথাও পিতারূপে, কোথাও বা প্রেমিকারূপে গ্রহণ করে ধর্মীয় মানস স্বস্তি পায়। এসব আদর্শের উপলব্ধির পথ বিভিন্ন হতে পারে। তবে মানব-জীবনে যে আবেগের ফলে তাদের উৎপত্তি - তা এক ও অবিভাজ্য।

তবে আদর্শের সংঘর্ষের ফলে এবং সে-সব আদর্শের রূপায়ণের মাধ্যমে বিভিন্নতার দরুন অনেক সময় ধর্মীয় অনুষঙ্গ সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে না, এ জন্যই বোধ হয় কোন কোন মধ্যযুগীয় কবি তাদের ধর্মীয় আবেগকে মানবিকরূপ দান করেছেন- ইরানী কবি হাফেজের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানেই। তিনি অতি গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে অতি সহজভাবে মানব-প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গিমার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর *'দিওয়ানের'* সর্বত্রই আপাতঃদৃষ্টিতে মানব-প্রেমেরই এক লালসাপূর্ণ অধ্যায়ের প্রকাশ পাওয়া যায়ঃ

প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকো না হাফিজ, ছেড়ো না পেয়েলা লাল
এ যে গোলাপের চামেলির দিন, এ যে উৎসব কাল -

(তরজমা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এবংবিধ উক্তির মর্মমূলে আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় অর্থ থাকলেও আপাতশ্রুতিতে তাতে কামনাময় শারীরিক সম্বন্ধজাত আবেগের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ধরনের সৃষ্টির উদাহরণ রয়েছে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কাব্যে। তাঁর ধারণাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরিক রূপ পরিত্যাগ করে কবি-জীবনের চরম সখারূপে দেখা দিয়েছেন ঃ

তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিত পাতিয়া
বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোয়াইব হরি বিনে দিন রাতিয়া।

তবে কাব্যের বিষয়বস্তু ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করুক অথবা মানবীয় রূপেই প্রকাশিত হোক– তার পশ্চাদপটে বিশিষ্ট জীবন–দর্শন থাকা অবশ্যম্ভাবী। সে জীবন দর্শনেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। নানাবিধ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মহাকাব্যে কতকগুলো লক্ষণ ফুটে ওঠে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হচ্ছে তার অন্তর্গত নানাবিধ ভাবধারার সমাবেশ। তাতে এমন কতকগুলো ভাবধারা বর্তমান থাকে যার ফলে তার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানবজীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার ফলে তার মধ্যে নানাবিধ ভাবধারা থাকে বর্তমান, যার ফলে তত্ত্বানুসন্ধানী দার্শনিক তার মধ্যে খুঁজে পান দর্শনের জটিল তত্ত্বের সমাধানের প্রয়াস, মানব–প্রেমিক তার মধ্যে আবিষ্কার করেন মানব–প্রেমের বা মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামায়ণে বর্ণিত রাজা রামচন্দ্রের চরিত্রে যেমন আদর্শ নরপতির উদাহরণ পাওয়া যায়, তেমনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে বনবাসে প্রেরণের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের *(Democracy)* আদি বীজেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে রয়েছে মহাকাব্যের সাদৃশ্য। ধর্মের মধ্যে যেমন মানবজীবনের নানাবিধ দিকের সন্তোষের জন্য রয়েছে বিধি–বিধান, মহাকাব্যের মধ্যেও তেমনি মানবজীবনের নানাদিকের সন্তোষ বিধানের রয়েছে উপাদান। এ দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে সমাজনীতি ও রাজনীতির মৌলিক সূত্র বর্তমান। এসব নীতিকে ধর্মপ্রবর্তকগণ কেবল প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বাস্তব জীবনেও তার রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মকে সাধারণত অহিংসার ধর্ম বলেই গ্রহণ করা হয়, অথচ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের ষড়যন্ত্রের ফলে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে যে কর্ডনিং প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে জঘন্য প্রথার ফলে সর্বসাধারণ মানুষের জীবনে সংকট দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দলবলসহ যুদ্ধ করেছেন। যীশুখৃষ্ট দাসের দল নিয়ে ইহুদীদের সুদ লেনদেনের প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করেছেন এবং হজরত মুহাম্মদ (সঃ) দাসকে মুক্ত করা তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এসব ধর্মে জনগণের কল্যাণকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেয়া হয়েছে বলে অম্লান বদনে স্বীকার করা যায়, তাই দেখা যায় পারলৌকিক মুক্তির সাথে সাথে ইহলৌকিক কল্যাণও এসব ধর্মের লক্ষ্যের বিষয়।

এখানেই মহাকাব্যের স্রষ্টাগণ অপরাপর সৃষ্টিধর্মী মানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বহুধা বিস্তৃত জীবনের নানাবিধ ভূয়োদর্শনের ফলে এদের মানস এত গভীর ও সমৃদ্ধ হয় যে, মহাসমুদ্রের মত তাতে হাঙ্গর, কুমীর, তিমি থেকে শুরু করে অতি নিরীহ ঝিনুকাদিও স্থান পায়। বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে কৃতী বলেই তারা এ জগতে অমর হয়ে বিরাজমান।

তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে স্মরণ করা কর্তব্য যে, মহাকাব্য রচনায় সফল হওয়ার পূর্বে এসব অপূর্ব প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী শিল্পীগণ নানা স্তর পার হয়ে সেই চরম–স্তরে উপনীত হন। সৃজন ধর্ম স্বভাবজাত হলেও তাকে সার্থক করে তুলতে হলে সাধনার বিভিন্ন সোপান উত্তীর্ণ হতে হয়। ইকবালকে মহাকবি বলার অর্থ এই যে, তাঁর মধ্যে মানবজীবনের

নানাদিকের নানা প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা রয়েছে। সাধনার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার আগে তাঁকে নানা স্তর পার হতে হয়েছে।

২

মহাকবি ইকবালের কাব্য-পাঠে সর্বপ্রথমেই ভেসে উঠে তাঁর অতি জোরালো প্রত্যয়শীলতা। সে প্রত্যয়শীলতা প্রথমদিকে আধুনিক ভাবধারা দ্বারা বিকশিত হয়েছে এবং বিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে ধর্মীয় ধারণার দ্বারা পুষ্ট হয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমদিকে তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে তিনি বিজাতীয় ধারণা বা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণ ইসলামী সংস্কৃতির ধারণার মাধ্যমে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তার ফল প্রকাশ করেছেন। অবশ্য উভয় পর্যায়েই তিনি আধুনিক চিন্তাধারার সমালোচনা করে তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান-নিয়ত সৃষ্টিশীল আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, মানবজীবনের গতিশীলতা, খুদী, তকদীর ও অমরতা। এসব ধারণায় তিনি অকস্মাৎ এসে উপনীত হননি। ক্রমবিকাশের ধারায় সর্বশেষ স্তরে তাঁর মানস এসব ধারণার মর্ম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। তাঁর মহাকাব্যের বিকাশের ধারার অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই প্রথমে তিনি জীর্ণ-শীর্ণ এ ঘুণে ধরা সমাজের নানাবিধ গ্লানিতে অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি অধ্যুষিত এই বিশাল দেশে কোথাও প্রাণের স্পন্দন তিনি পাননি। গতানুগতিক আচার-পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ সেই পুরাতনেরই আরাধনা করছে। তাতে বাইরের খোলসটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, অন্তরের কোন সাড়া তাতে প্রকাশ পাচ্ছে না। সে যুগের ইকবাল-মানসের পরিচয় হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাকে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়-

শূন্য পড়িয়া আছে বহু যুগ হতে হৃদয়ের লোকালয়
এসো এক নতুন শিবালয় এই দেশে বসাইয়া দেই -
পৃথিবীর তীর্থ হইতে উচ্চ হউক আপন তীর্থ
আকাশের বক্ষাঞ্চলের সাথে তাহার চূড়ার কলস মিলাইয়া দেই -
(অনুবাদঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

এ যুগেরই অপর এক কবিতায় তাঁর এ মনোভাব আরও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে -

ওগো ব্রাহ্মণ! মন্দিরের দেবতা তোর পুরানো হয়ে গেছে
নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ- এতো তুই তার কাছেই শিখেছিস
খোদাই শিখিয়েছেন ওয়াইজকে ঝগড়া বিবাদ করতে -
মসজিদ-মন্দির কোনটাতেই আমার ভক্তি নেই -

ব্রাহ্মণ মোল্লা দুই–ই ছেড়েছি আমি
তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে
জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা কিন্তু আমার দেবতা –
নূতন শিবালয় তৈরী করব প্রাণের বসত ভূমিতে
উদার আকাশে মেলে দেবে এ চূড়ার পাখা
সকল তীর্থের সেরা তীর্থ হবে এই –
মানুষের মুক্তি আন্‌বে প্রেমের ভিতর দিয়ে –

(নয়া শিবালা– অনুবাদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

এ ক্ষেত্রে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় তথাকথিত হিন্দু বা মুসলিম কোন সংস্কৃতিতেই তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন জীবনের অন্বেষণে ধাবমান। সত্যিকার জীবন কোথায়–কিভাবে তাকে আবার ফিরে পাওয়া যায়–এ–ই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। এ যুগের অপর একটি কবিতায় এ ভাবটি সুপরিস্ফুট। 'চাঁদ' নামক কবিতায় তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়ের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় –

কাহারে খুঁজিছ তুমি, কোন সে সুন্দর
ফিরিছ তালাশ করি আমারি মতন?
অনন্ত আলোকে যার মানব–অন্তর
আলোকিত প্রভাসিত প্রদীপ যেমন।

(ইকবাল চয়নিকাঃ বাঙ্গ–ই–দারা; তরজমাঃ মীজানুর রহমান)

এ পর্যায়ের তাঁর মানসে স্বদেশ–প্রেম ছিল অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত। অতি আধুনিক যুগে স্বদেশ–প্রেমকে অনেক মনীষীই মানবজীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহাপ্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করছেন। বার্টান্ড রাসেল স্বদেশ–প্রেমের জন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, তার বয়স খুব বেশী নয়। জোয়ান–অব–আর্ক কর্তৃক তা সর্বপ্রথম ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন তা জার্মানীতে আমদানী করেন। মেটারনিক তার বীজ ইটালীতে বপন করেন এবং শেক্সপীয়রের মত এমন মধুর ভাষায় আর কেউই এ বিষ পরিবেশন করেননি। স্বদেশ–প্রেমের প্রথমদিকে থাকে আত্মরক্ষামূলক মনোবৃত্তি এবং পরিশেষে তাতে দেখা দেয় আত্ম–প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে শোষণের প্রবৃত্তি। ভৌগোলিক পরিবেশ, রক্ত, ভাষা, অর্থনৈতিক সংস্থা প্রভৃতি থেকে মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। এ জাতীয়তার সর্বপ্রধান লক্ষ্য অপর জাতির অধিকার থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। আবার এভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে, পরবর্তীকালে আপনাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সমাজ মনে করে–অপরাপর জাতির রক্ত মোক্ষম করে

এ শক্তির ধাতই হচ্ছে নব নব সৃষ্টিতে পর্যবসিত হওয়া। এ জন্যই কালকে বের্গসঁ বলেছেন বিশ্বসত্তা। কালে যেভাবে কোন স্থিতি নেই-গতিই একমাত্র সত্য-তেমনি এ-বিশ্বে স্থিতিশীল বলে কোন কিছুই নেই। কালের বা বিশ্বসত্তার স্বাভাবিক ধর্ম গতিশীলতা হলেও তাতে কোন লক্ষ্য নেই। অর্থাৎ কোন আদর্শের বাস্তবায়নে বা কোন লক্ষ্য পানে পৌছার জন্য সে গতিরও কেউ নিয়ন্ত্রণ করেনি। গতির ফলেই ক্রমবিকাশের ধারায় নিত্য-নতুন নানা মূল্যমানের সৃষ্টি হচ্ছে। ইকবাল গতিবাদকে স্বীকার করে তাকে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে ক্রমবিকাশের ধারার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত জীবনের সন্ধান। বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের উৎপত্তি এক মহান ব্যাপার। মানুষকে হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। সে খলীফার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে এ দুনিয়ায় আল্লাহর রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই সেই আল্লাহর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকল্পেই বিবর্তনের ধারা ছুটে চলেছে এবং মানুষের মাধ্যমেই তা এ দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়িত হবে। এই ভাবধারাই ইকবাল প্রকাশ করেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়-

ঝরণা চায় নদীতে মিশতে

নদী চায় সমুদ্রে মিশে যেতে

সমুদ্রের ঢেউ কামনা করে চাঁদের জ্যোৎস্নাকে

জীবন-রহস্যের সন্ধান নাও খিজিরের কাছে থেকে

দুনিয়ায় কারোর আশাই তো পূর্ণ হলো না

(কোশেশ-ই-না-তামাম; অনুবাদঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, যদিও ইসলামী ভাবধারায় খিজির (আঃ) এখনও জীবিত এবং তাঁর কাছে থেকেই জীবন-রহস্যের সন্ধানের জন্য ইকবাল তাকিদ করছেন, তবু শেষ পংক্তিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছেন - *দুনিয়ায় কারোর আশাই তো পূর্ণ হলো না।* এখানেস্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, খিজিরের কাছে জীবন-রহস্যের সন্ধান পেলেও কারো আশাই পূর্ণ হবে না - অনন্ত জীবনব্যাপী তাকে উপলব্ধি করার জন্য অন্বেষণ করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে কবি-মানস আরও সমৃদ্ধতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত অভিযোগমূলক কাব্য *'শেকোয়া'* ও তার *জওয়াব* প্রকাশ করেন। মানবাত্মা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও *আসরারে খুদীর* মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। আসরারে খুদীর মধ্যে তাঁর দার্শনিক মতবাদ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। *শেকোয়া* বা অভিযোগমূলক কাব্যের প্রবর্তন এ-দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন নয়। ইকবালের বহু পূর্বে ওমর খৈয়াম তাঁর অপূর্ব বচন ভঙ্গিমায় মানুষের পক্ষ থেকে

অভিযোগ করেছেন। সাধারণভাবে মানুষকে তার পাপের জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু পাপের সৃষ্টি তো খোদ আল্লাহর দ্বারাই হয়েছে। কাজেই মানুষ সর্বতোভাবে ক্ষমার যোগ্য –

পাপের কালো মূর্তি নিয়ে জীব জগতে ঘুরছ হায়,
মানুষ তোমায় করছে ক্ষমা তুমিও দেব ক্ষমিয় তায়।
(রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম, তরজমা ঃ কান্তি চন্দ্র ঘোষ)

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন–এ দুনিয়ার সৃষ্টির উপাদান শুধু মৃত্তিকা। একে নন্দনকানন করে গড়ে তোলেননি ভগবান। সে গড়ার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে মানুষকে, অথচ মানুষের হাতে স্বাভাবিক কোন যন্ত্র নেই যে, তার মাধ্যমে সে এ মাটির পৃথিবীকে সুন্দর ও শোভন করে তোলে। তবু সে ভার মানুষের উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে –

তুমি তো গড়েছো শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে
দিয়াছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

এ–সব অভিযোগকে সার্বজনীন অভিযোগ বলা হয়। এ দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতিনিধি হয়েই ওমর খৈয়াম বা রবীন্দ্রনাথ এ–সব অভিযোগ করেছেন। ইকবাল অভিযোগ করেছেন এ দুনিয়ার এ বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে ভাববার বিষয় এই, মুসলিমদের এক আদর্শবাদে প্রত্যয়শীল দল বলেই তিনি গ্রহণ করেছেন। ইস্‌লামের ঐতিহ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, আদিযুগ থেকেই মুসলিমরা এ দুনিয়ায় আল্লার ওহ্‌দানীয়ত্ বা ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধ মতবাদী লোকের সাথে সংগ্রাম করেছে। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেন্টে ও আল্–কোরআনে সে সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। হজরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) থেকে এ দুনিয়ায় আল্লাহর ওহ্‌দানীয়ত ও সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনায়–কাফের বাদশা নমরূদের শত্রুতা–থেকে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল এবং যে সংগ্রাম এখনও চলেছে অত্যাচারী রাজা–বাদশাহ বা তথাকথিত জননেতার বিরুদ্ধে, সে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একটি বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়েই তিনি এ অভিযোগ করেছেন। এ মানবগোষ্ঠীর জীবনে কোন বংশের বা গোত্রের প্রতিষ্ঠা বা স্বার্থ আদায় করার প্রবৃত্তি ছিল না। এরা ছিল এক বলিষ্ঠ জীবন–বোধে অনুপ্রাণিত। এ দুনিয়ায় কোন ব্যক্তির নয়, কোন জাতির নয়, কোন অধিপতির নয়– খোদ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠায় এরা ছিল উন্মুখ। ওরা চেয়েছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা করে এ

এ মতবাদের পোষকতায় বলা হয়, মানুষ তার স্বকীয় ভূয়োদর্শনের ফলে যে–মতবাদ গঠন করতে সমর্থ হয় তা–ই তাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপাদান বাইরের পৃথিবী থেকে আহরিত হয় এবং সে–সব উপকরণের ভিত্তির উপর আমাদের মানস একটা সৌধ গঠন করে। সে সৌধের মধ্যে গুরুবাক্য বা আপ্তবাক্যের *(Authority)* কোন স্থান নেই। প্রাকৃতিক রীতি–নীতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও মানুষ অপর মানুষের দ্বারা প্রতারিত হতে বা প্রচলিত কোন নীতি মানতে বাধ্য নয়। সে তার নিজের সুখ–সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে আপন মতবাদ গঠন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মানব–জ্ঞানের মূল উপকরণ বলে স্বীকার করলে মানুষের পক্ষে আপনার সুখ–শান্তির আকাঙক্ষা ছাড়া আর কোন কিছুই কাম্য হতে পারে না। কাজেই ব্যষ্টিবাদ তার পরিণতিতে সুখবাদ বা *Hedonism*-এ পরিণত হয়। জনলক্ যে ধারণা প্রচার করেছিলেন, তার পরিণতিতেই ইংলন্ডে *'সুখবাদ'* ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং স্টুয়ার্ট মিল্ ও বেনথাম তাকে একটু পরিবর্তিত আকারে প্রচার করে তাঁদের দেশের তথা তৎকালীন সভ্যজগতের প্রশংসা লাভ করেন। প্রাচীনকালে গ্রীকদের মধ্যে যে সুখবাদ প্রচলিত ছিল তাতে ব্যষ্টির পক্ষে সর্বতোভাবে তার নিজের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যই কামনা করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। মিল্ ব্যষ্টির নিজস্ব সুখের স্থলে নীতি হিসাবে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকার *(Greatest good of the greatest number)*–কে মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এতে ন্যায়শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। তা দর্শনের ছাত্র মাত্রই অবগত আছেন। প্রত্যেকে তার সুখ চায়–কাজেই সকলেই সকলের সুখ চায়–একটা মস্ত বড় তর্ক শাস্ত্রীয় ফাটলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জন্ লকের ধারণা ছিল মানুষ একক হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। একা তার পক্ষে এ জীবনে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়, গতিকে তাকে বাধ্য হয়ে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে সমাজ গঠন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তার মননশীলতার দ্বারা চালিত হয়েই সে সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়। রুশো তাঁর বিখ্যাত বাণীতে বলেছিলেন,–*Man is born free but everywhere he is in chains.* মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে, তবে সবখানেই সে বন্দী।' তাঁর ধারণা ছিল লকের ধারণারই অনুরূপ। মানুষ একা জন্মায় এবং সৃষ্টিই সমাজের আদি সংখ্যা, তবে তার নানাবিধ প্রক্ষোভ *(Emotion)* তাকে অক্ষরের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য করে। বাধ্য হয়েই সে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি গঠন করে বটে, তবে যতই সে এসব সংস্থা গঠনে অগ্রসর হয়, ততই সে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। জন্লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এখানেই। লক্ মানুষকে বুদ্ধি–প্রধান আর রুশো প্রক্ষোভ–প্রধান জীব হিসাবে ধারণা করেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রিক হলে তার পক্ষে নিজের সুখ–সুবিধা আদায় করা বা সে–সবের জন্য প্রাণপণ করে চেষ্টা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের অপর এক উদাহরণ পাওয়া যায় জার্মান মনীষী নীচের চিন্তাধারায়। তাঁর ধারণা ছিল জ্ঞান অর্জন মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ জীবন-আহবে *(Struggle for existence)* টিকে থাকতে পারে। জ্ঞান মানুষের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকার অস্ত্রবিশেষ। এ জগতে কেবল শক্তিশালীই টিকে থাকে। যারা পঙ্গু, যারা বিকলাঙ্গ তারা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই মানুষের পক্ষে শক্তি আহরণ করা উচিত এবং এমন সব গুণের অধিকারী হওয়া উচিত যাতে সে মহামানবে পরিণত হতে পারে। শক্তির অধিকারী হতে হলে আমাদের নৈতিক পরিবর্তন করতে হবে। ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে খৃষ্টান জগত প্রেম, দয়া, মমতা প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী বলে স্বীকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো দাস জাতির গুণাবলী। বীরের গুণাবলী হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে উর্ধ্বে আরোহণ করার শক্তিবত্তা। সর্বসাধারণ মানুষ অতি মানুষের কাছে যন্ত্র সদৃশ। ক্রমবিকাশের ধারায় অনিবার্যভাবে অতিমানুষের সৃষ্টি হচ্ছে।

নীচের ভাষা থেকে বুঝা যায়, তিনি হিট্‌লার বা মুসোলিনীর মত নাৎসী ধারাকেই অতিমানব বলে ধারণা করেছিলেন এবং ক্রমবিকাশের গতি যে এরূপ, মানুষের সৃষ্টিতে তা তিনি তাঁর দিব্যচক্ষুতে দেখেছিলেন। ইকবাল খুদীর বিকাশ বলতে লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে বা রুশোর ব্যষ্টিবাদকে ধারণা করেননি। নীচের মত অতি পাষন্ড অতি মানুষ তৈরীর কোন পরিকল্পনাও করেননি। তাঁর খুদীর অর্থ ছিল মানবজীবনে আল্লাহ্‌র যে-সব গুণাবলী রয়েছে সে-সব রহমানী গুণাবলীর বিকাশ, শয়তানী গুণাবলীর বিকাশ নয়।

এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার অনুসরণ করতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তানায়ক অপর মহাকবি জালাল উদ্দীনের অহম্‌বাদের আলোচনা করতে হয়। জালাল উদ্দীনের চিন্তাকে গ্রীক বা ভারতীয় চিন্তার তীব্র প্রতিবাদ বলা যায়। থেলিস্ *(Thales)* থেকে গ্রীক চিন্তাধারার সূচনা হয় এবং তার পূর্ণ পরিণতি প্লেটোর দর্শন। এরিস্টটল প্লেটোর নানাবিধ ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। এ চিন্তায় নির্বিশেষই চূড়ান্ত স্থান লাভ করেছে- বিশেষ *(particular)* প্লেটোর কাছে ক্ষণিক বলেই প্রতিভাত হয়েছে। এরিস্টটল নির্বিশেষকে বিশেষের মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন, তবু মর্যাদার দিক থেকে নির্বিশেষই উচ্চ স্থানের অধিকারী বলে পরিগণিত হয়েছে। প্লেটো মানবাত্মার অমরত্ব স্বীকার করেছেন এবং নির্বিশেষের সাথে তার যোগসূত্রের জন্য এ জীবনে কিভাবে মানবাত্মা অধীর আগ্রহ প্রকাশ করে তাও চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে গরজটা মানবাত্মার দিক থেকেই প্রকাশ পায়- নির্বিশেষ এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানবাত্মার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় না। ভারতীয় দর্শনেও তেমনি দেখা যায় শংকরাচার্য-কৃত বেদান্ত ভাষ্যে ব্রহ্মকেই চরম স্থিতি বলে গণ্য করা হয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমে মানবাত্মা সে

এই হীনমন্যতায় কতকাল কাটাবে জীবন?
তোমার কর্দম হতে সৃষ্টি কর জ্বালাময় নতুন সিনাই।
(ইকবাল চয়নিকা ঃ আসরার–ই–খুদী;
তরজমাঃ আঃ কা'শ' নূর মোহাম্মদ)

সক্রিয়, জীবন্ত, চঞ্চল'ও গতিশীল আত্মার উদ্বোধনের জন্য তিনি আবেগময়ী ভাষায় '*রমুযে বেখুদী*'তেও মানব সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর চোখে আমাদের সমাজের সূফীদের ধারণা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁরা মানবাত্মর অসহায় অবস্থা ও তার পরিণতি সাহিত্যে ও কাব্যে প্রচার করেছিলেন। তাতে রোজ–ই–আলাস্তে মানুষের ভাগ্যলিপির নির্ণয় ও তার ফলে পুতুলের মত জীবন–নদের স্রোতে তাদের ভাসমান অবস্থার জন্য বিলাপ করেছিলেন। মহাকবি হাফিজ তাঁর অনবদ্য ভাষায় মানুষের এ করুণ চিত্র এঁকেছিলেন। ইকবাল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন ফার্সী ভাষায়–

মানবগণ যাহারা আফিমের নেশায়
বিভোর হয়ে এ জগৎকে নীচ বলে ঘৃণা করছ
উঠো জাগো, চোখ খোলো, এ জগতের দুঃখ–দুর্দশার
নিন্দা করো না–
এ দুঃখ–দুর্দশা মুসলিমদের সমাজজীবনকে
গঠন করার জন্য ও তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির
স্ফূরণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে
রমুয–ই–বেখুদীর অন্যত্র তিনি বলেছেন–
বিচিত্র ছন্দে ও তালে সঙ্গীত তাহার
মৃত পৃথিবীতে করে প্রাণের সঞ্চার
তাহার নিকট থেকে আলোর আস্বাদ
পৃথিবী গ্রহণ করে নূতনের স্বাদ।

এই তো সে আদর্শ, যার প্রতীক্ষায় মানুষ আকাশ–বাতাস, জল–স্থল–অন্তরীক্ষ সবই অপেক্ষা করছে। সবল–সরল মেরুদণ্ডের অধিকারী উন্নত শীর্ষ মহামানবের অপেক্ষায় সতত সৃষ্টিশীল কর্মচঞ্চল বিশ্বসত্তা আজও অপেক্ষা করছে। তার এ উন্নত অবস্থার পটভূমিতে রয়েছে তওহীদে তার শিক্ষা। তওহীদের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই সে উন্নত শীর্ষ মহামানব এ জগতের বুকে করে আদর্শ পুণ্য ভূমির প্রতিষ্ঠা–

তওহীদের মূল–মন্ত্র তাহার শিক্ষায়
তাহার নিয়ম পূর্ণ শৃঙখলা প্রথায়–

অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল মানুষ সে নয়–তার প্রত্যেক কথায় ও কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা।

পরবর্তী বা শেষ স্তরে ইকবাল–মানস তত্ত্বজ্ঞানের দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়ে। '*পায়ামে মাশরিক*' বা প্রাচ্যের বাণী ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তখ্‌সীয়ে ফিতরত বা সৃষ্টির অধিকার নামক খন্ডকাব্য এর অন্তর্ভুক্ত। এ কা'ব্য জার্মান দেশীয় দার্শনিক কবি গ্যেটের *Gest Westerliche Diwan*-এর উত্তরে রচিত। দেশে বিদেশে এ–কাব্যের নানাদিক নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। এ যুগে তাঁর ভাব–বিহবলতা উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর লোকে উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে দিব্যধাম স্পর্শ করে। এ যুগে '*যবুরেআজম*', '*জাওয়ীদনামা*','*মুসাফির*','*বাল–ই–জিব্‌রীল*', '*পস–চে বায়াদ কর্দ*', '*যরবে কলীম*', '*আরমুগানে হিজাজ*' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। 'জাওয়ীদনামা' মহাকবি দান্তের *Divinia Commedia*-এর আদর্শে রচিত। বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন সূত্র, জগতের ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা এ বইখানার পাতায় পাতায়।

'*যবুরে আজমে*' কবির দার্শনিক চিন্তা তাঁর আশাবাদে উজ্জ্বল ও প্রোজ্বল হয়ে আবার দেখা দিয়েছে। জালাল–উদ্‌দীন মানুষের যে সত্তাকে আদি ও অদ্বিতীয় সত্তা বলে গ্রহণ করেছিলেন, দেহের মাটির পিঞ্জরে আবদ্ধ সে সত্তাই ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর লোকে আরোহণ করে ফেরেশতাদের আলোকের চেয়ে উচ্চতর হবে, সে সম্বন্ধে কবি ছিলেন নিঃসন্দেহ –

মানুষের ধূলি একদা ফেরেশতার
আলোকের চেয়ে উজ্জ্বলতর হবে;
এ পৃথিবী জানি মোদের ভাগ্যপথে
তারকা–দীপ্ত আকাশের রূপ লভে।
মোদের মাথার সহস্র কল্পনা –
ঝঞ্ঝা যাহার খাদ্য যোগায় ভাই,
জানি একদিন উঠ্‌বে আকাশ–পথে,
ধরা–আবর্ত ছেড়ে পাবে রোশনাই।
কেন জিজ্ঞাসা করছো আমার কথা?
মানুষের কথা ভাবো, আর দেখো চেয়ে ঃ
এ হৃদয় আরো উন্নত, হলে পর

হবে যে মহান স্বর্গ–ধরায় নেয়ে।
সময় মতন মামুলি চিন্তাধারা
যদি বিকাশের মহান সুযোগ পায়,
তবে তার স্থান আনন্দ উচ্ছ্বাসে
হবে নিশ্চয় খোদার মনের ছায়।
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা ঃ আবদুর রশীদ খান)

মানুষের সকল আশা–আকাঙক্ষা, প্রেম, ভালবাসা সব কিছুরই মূল্য রয়েছে বিশ্ব–বিধানে। এর কণামাত্রও নিরর্থক নয়, বিকশিত হলে এসবের প্রত্যেকটি ভাব ও ধারণা খোদার মনেতে স্থান পাবে। মানবতার বিকাশের পথে কিন্তু চাই সত্যিকার প্রত্যয়শীলতা–সত্যিকার ঈমান। মাটির গড়া এ কায়াকে স্বর্গীয় আভায় দীপ্তিমান করে তুলতে হলে তাকে ঈমানের রশ্মিতেই উজ্জ্বল করতে হবে –

জীবন্ত এই আত্মাখানির
ঈমানটুকু বাজে স্বপ্ন নয় –
ছড়ানো এ ধূলো দিয়েই
নকশা গড়া অধিক শক্তিময়–
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা ঃ আবদুর রশীদ খান)

ঈমানের রোশনীতে উদ্দীপিত আত্মার পক্ষে তাই এগিয়ে চলাই হচ্ছে সারতত্ত্ব। ধূলিময় এ পৃথিবীতে অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা তার পক্ষে উচিত নয়। মানুষকে কান পেতে শুনতে হবে পৃথিবীর অদম্য চলার গান। মানুষকে ভাবতে হবে অতীতের কথা শুধুমাত্র নিজেদের ঐতিহ্যের সাথে যোগসূত্র রাখার জন্য। তাকে প্রস্তুত হতে হবে ভবিষ্যতের জন্য, আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করতে হবে অনাগত দিনগুলোর জন্য, তাই তিনি পরিষ্কার ভাষায়ই বলছেন –

পৃথিবীর জনপদে আমিও তো ধূলির মতন
কাহার কোমল গান তারপর শুনেছি এ বুকে ঃ
সময় নদীর উৎস খুঁজে পাবে আমার ঝর্ণায়
অতীত কেবল মোর শৌর্য–বীর্য হারানো দিনের
এখন আগ্রহভরে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা আমার।
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমাঃ আবদুর রশীদ খান)

মানুষের ধূলি তার কর্ম–জীবনের দ্বারাই উজ্জ্বল হয়ে লোক থেকে লোকান্তরে, নিম্নতর পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে আরোহণ করে এবং সর্বশেষে এমন লোকে অধিষ্ঠিত হয় যাতে ফেরেশতারাও ঈর্যান্বিত হয়ে পড়ে –

সবচেয়ে উঁচু মন্ডল পরে এমনি গতি যে মোর
ফেরেশতাগণ তা দেখে আমায় ধরিতে লাগায় সোর
মানুষের ধূলি নিত্য–নূতন কর্মে উজ্জ্বল হয়
পুরানো দিনের মত চাঁদ তারা এখনো আলোকময়

(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা ঃ আবদুর রশীদ খান)

মানুষ তার তেজদীপ্ত বাহুকে বাজুবন্দ পরে শক্তিহীন করেছে, তাই তাকে আবার প্রাণময় করার জন্য খুদীর প্রদীপ জ্বেলে আপনার প্রকৃত সত্তার পরিচয় লাভ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খুদীর বিকাশের পথে তাকে রসূল (সঃ) নির্দেশিত পথেই হতে হবে অগ্রসর –

বাজুবন্ধের আড়ালে যেহেতু মানুষ লুকালো আনি
মুসার হাতকে, তাই জ্বালি মোর প্রদীপখানি
এসো গো নামাজে, শাহজাদা দ্বারে দিও না ধর্না আর
তাই ছিল মোর পূর্বপুরুষ পুরাকালে এ–ধারার

(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা ঃ আবদুর রশীদ খান)

প্রকৃতপক্ষে ইকবালের কাব্য–সাধনাকে অন্যান্য কবিদের কাব্য–প্রচেষ্টার সাথে তুলনা করা যায় না। নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি বা সৌন্দর্য পূজার সাধনা তিনি করেননি। শিল্পের জন্যই শিল্পের সৃষ্টি *(Art for art sake)* করার চেষ্টা তিনি কোন কালেই করেননি। অস্কার ওয়াইল্ডের এবংবিধ ভাবধারা দ্বারা তিনি কোন কালেই প্রভাবান্বিত হননি। অপরদিকে গ্রীক অথবা আধুনিক নিসর্গবাদ বা *Paganism* দ্বারাও তিনি প্রলোভিত হননি। সুইনবার্নের Atlanta in Calydon-এ নিসর্গ পূজার যে অতি স্পন্দনময় নিদর্শন পাওয়া যায় তার কোন প্রভাবই ইকবালের কাব্যে পড়েনি। বাঙলা কাব্যের রবীন্দ্রনাথ বা বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নানাবিধ কবিতায় নিসর্গবাদের যে চমৎকার নিদর্শনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎলাভ হয় ইকবালের কাব্যে তার কোন উদাহরণই নেই। ভাব, ভাষা ও ছন্দের একত্র সমাবেশে বাঙলা কাব্যে উর্বশী যে অপূর্ব স্থানের অধিকারী, সেরূপ শ্রুতিমধুর বা মায়াময় রূপ সৃষ্টিধর্মী কবিতাও ইকবাল সাহিত্যে বিরল। মহাকাব্যের বিরাট পটভূমিতে যেভাবে নানা মানুষ ও নানা চরিত্রের

সমাবেশ রয়েছে, ইকবাল কাব্যে তার কোন আভাসই নেই – খন্ড কবিতার স্বল্পপরিসর আলোর মাঝে জীবনের কোন বিশিষ্ট দিক বা ভাবও তাতে মূর্ত হয়ে উঠেনি। তাঁর কাব্যের গোড়াতেই রয়েছে এক তীব্র প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদ সর্বপ্রথমে দেখা দিয়েছে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং ক্রমবিকাশের ধারায় তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে মানব–জীবন সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পোষিত নিরাশাবাদের বিরুদ্ধে। এ প্রতিবাদ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রচার করার উদ্দেশ্যে এবং তাতে তিনি সফল হয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। যদিও নজরুল ইসলামের মত তিনি মানব–ব্যক্তিত্বকে সার্বিক ও পরম শক্তিময় রূপদানে কুণ্ঠিত ছিলেন; জগদীশ্বর, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম সত্য বলে তিনি দাবী করেননি, তবু তাঁর সীমিত ভাষায় মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতির যে আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ব–সাহিত্যে তা অনবদ্য। তাঁর দার্শনিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় ব্রহ্মকেন্দ্রিক বা পরমাত্মা–কেন্দ্রিক মানব–সৃষ্টির স্থলে তিনি মানব–কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ়–সংকল্প। এ জন্যই এ মাটির মানুষকে তিনি জ্যোতির্ময় ফেরেশতাদের উপরেও স্থান দিতে একটুও ইতস্তত করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর এ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপের পরিপূরক বলা যায়। ব্রহ্মবাদের অতল তলায় তলিয়ে যাওয়া মাটির পৃথিবীতেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ব্রহ্মাস্বাদ '*এ মাটির বেড়ার প্রান্ত হতে অমর্তের পেয়েছি সন্ধান*'– খেয়ালী কবির কল্পনা–বিলাস নয়। এ বক্তব্য মহাধ্যানীর জীবন সাধনার সিদ্ধিজাত ফল। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের সব উপাদান বিরাজমান বলে ধারণা করা রবীন্দ্র–দর্শনের পরিণত ফল। সেই মাটির মানুষের ব্যক্তিগত সুখ–দুঃখ ও হাসি–কান্নার বিভিন্ন রূপ তিনি মায়াময় তুলিকা–স্পর্শে অমর করে তুলেছেন। শ্রেণী–সংগ্রামের পর্যুদস্ত অসহায় নির্বিত্তের করুণ চিত্রও তিনি দূর থেকে দেখেছেন। আফসোসও করেছেন। তবে মানুষকে এ–সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে কোন অনুপ্রেরণা দান করেননি। ইকবাল এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হয়েছেন এবং মাটির ধরার অধিবাসী আপাতদৃষ্টিতে নানাবিধ দুর্যোগে সম্পূর্ণ অসহায়, পঙ্গু ও অশক্ত মানব নামধারী কদল জীবকে তাদের 'খুদী', তার প্রকৃত সত্তার পরিচয় লাভ করার জন্য উদাত্ত স্বরে আহবান জানিয়েছেন। এখানেই তাঁর কাব্যের বিশেষত্ব।

শুধুমাত্র আনন্দ পরিবেশনই তাঁর কাব্যের লক্ষ্য নয়, মানুষকে এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শে উদ্বোধিত করে তোলা এবং তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। তাঁকে মহাকবি এ জ্যই বলা যায়। নতুনভাবে জগত ও জীবনকে দেখার প্রেরণা ও পদ্ধতি উভয়ই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। মুসলিম জীবনের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের জন্য নিকলসন *(Nickolson)* প্রমুখ সমঝদারেরা তাঁকে মুসলিমদের কবি বলে একটি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ওঁরা ভুলে গেছেন ইসলাম ও মুসলিম জাতি এক নয়। ইকবাল বারবার বলেছেন, এ দুনিয়ার নানাবিধ সংকটের সময় মুসলিমেরা ইসলামকে রক্ষা করেনি; বরং ঠিক উল্টোভাবে ইসলামই মুসলিমদের রক্ষা করেছে। ইকবাল ইসলামকে

শুধুমাত্র প্রত্যয় হিসাবে গ্রহণ করেননি; বরং এক অভিনব পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও জীবন-পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের অনুশীলনের ফলে মানুষ *'ইনসানেকামিল'* বা পূর্ণ বিকশিত মানুষে পরিণত হতে পারে। সে জীবনদর্শনে প্রত্যয়শীল মানুষ গোষ্ঠীকেই তিনি সত্যিকার মুসলিম বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং *শেকোয়াতে* সেই আদর্শবাদী মানুষ গোষ্ঠীর তরফ থেকেই তিনি আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করেছেন। বর্তমান কালের নামসর্বস্ব মুসলিমদের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে আহাজারি করেননি।

প্রকৃতপক্ষে খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে দামেস্কে উমাইয়াদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাগদাদে আব্বাসীয়রা যে শাহানশাহী ও জাঁকজমকের প্রতিষ্ঠা করেছিলো, পাক-ভারতে পাঠান-মুঘলেরা যে জৌলুস প্রদর্শন করেছে তার সাথে ইসলামের কোন যোগসূত্র নেই। আপনাদের বংশ গৌরবের প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব এ-দুনিয়ায় চিরস্থায়ী করার উদ্দেশে ওরা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই নির্যাতন করেছে। এসব তথাকথিত মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে উমাইয়া বংশের হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ একমাত্র ব্যতিক্রম। ওদের কার্যকলাপের মধ্যে ব্যক্তিগত ও বংশগত অহমিকার প্রকাশ ছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কোথাও ব্যতিক্রম দেখা দিলে তাদের বংশের অপরাপর অহমবাদীরা তা কিছুতেই সহ্য করেনি। মহাকবি ইকবালের দরদ এহেন শক্তিমদমত্ত অহমিকাপুষ্ট তথাকথিত মুসলিমের জন্য উথলে উঠেনি। এ দুনিয়ায় যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে চায়, আল্লাহর মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং নিজে *'ইনসানে কামিল'* হয়ে আল্লাহর কাজের সহায়ক হতে চেষ্টা করে সে মানব-সমষ্টিই ছিল ইকবালের চোখে সত্যিকার মুসলিম। এ জন্যই তিনি সে আদর্শবাদী মানুষের আবাসস্থল বলে সারা দুনিয়াকে গ্রহণ করেছিলেন। 'পাকিস্তান' চাওয়ার মূলে ছিল সে আদর্শবাদী মানুষ গড়ে তোলার জন্য একটা পরীক্ষাগারের সৃষ্টি-কাজেই তাঁকে নামসর্বস্ব মুসলিম জনসাধারণের কবি-প্রতিনিধি বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, তিনি মানবজীবন সম্বন্ধে যে আশার বাণী ঘোষণা করেছেন অনাগত ভবিষ্যতে তার প্রেরণায় মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে আরোহণে সমর্থ হবেই হবে।

আল্লামা ইকবালের জীবন ও কবিতায় সূফী মতবাদের প্রভাব

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

প্রাচ্যের অসাধারণ প্রতিভাবান দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবাল প্রচলিত অর্থে কোন সূফী সাধক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর জীবন ও কবিতায় সূফী মতবাদের প্রভাব ছিল গভীর ও অপরিসীম। এ প্রভাব আসে প্রধানতঃ দু'ভাবে। প্রথমতঃ তাঁর নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশ থেকে, দ্বিতীয়তঃ ইসলামী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে।

আল্লামা ইকবালের পূর্ব পুরুষ সুপরো গোত্রের কুলীন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ধর্মে খোদাতত্ত্ব দর্শনে ব্রাহ্মণদের অবদান অতি সুবিদিত। কয়েকশ' বছর পূর্বে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে তাঁদেরই একজন উৎকৃষ্টতর জীবনের অন্বেষণে পাঞ্জাব প্রদেশের সিয়ালকোট নগরে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর উক্ত বংশে বাবা লোল হাজ্জ নামে একজন সূফী সাধক গত হয়েছেন। গবেষকগণ এ তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর এ বংশ পরিচয়ে বেশ গর্ব ছিল।

আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ একজন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। তাঁর ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী তাসাউফের প্রতিফলন ঘটেছিল অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল তাঁর শৈশবকালের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। একদা গভীর রাত্রে তাঁর মাতা বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরের দিকে গেলেন। তিনিও ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সন্তর্পণে তাঁকে অনুসরণ করলেন। দেখতে পান তাঁর পিতা নামাযরত ও তাঁর চতুর্দিকে একটি স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁকে ঘিরে আলোকিত করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী তাসাউফের ইতিহাসে এহেন ঘটনার অবতারণা ঘটেছে বহুবার। ওলী-আল্লাহদের বেলায় এটা স্বাভাবিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

শেখ নূর মুহাম্মদ যদিও ধনী লোক ছিলেন না, তথাপি নিজ এলাকায় তাঁকে অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তাঁর উপর তাসাউফের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি দৈনন্দিন সাংসারিক দায়িত্বসমূহ হতে উদাসীন ছিলেন না। সারাজীবন নিজ হাতে উপার্জন করেছেন। টুপীর ছোটখাট ব্যবসা ছিল তাঁর। অন্তরে খোদা প্রেম ও হাত কর্মব্যস্ত, এই নীতিতে তিনি অবিচল ছিলেন।

খোদা প্রেমে বিভোর একজন কাদেরীয়াপন্থী পীর সাহেবের তাঁর ওখানে আসা-যাওয়া ছিল। তিনি তাঁর মুরীদ ছিলেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর পিতার হস্তে বায়'আত নিয়েছিলেন। এই কথার উল্লেখ করে তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীর নামে ১২ই নভেম্বর ১৯১৬ সালের এক পত্রে লিখেছেনঃ

"সেলসেলায়ে কাদেরীয়ার অবস্থাও তাই, যাতে আমি নিজে বায়'আত নিয়েছি"।

শেখ নূর মুহাম্মদ একজন পাকা মুসলমান হিসাবে কুরআন কারীমের মর্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার উপর অত্যন্ত জোর দিতেন, যা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য মুসলিম সূফী সাধকদের কাছে একটি অন্যতম অতি পরীক্ষিত উপায়। পিতার এ মহৎ গুণ সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল ছাত্র জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ

"আমি যখন সিয়ালকোটে অধ্যয়নরত ছিলাম তখন প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে নামাযান্তে কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করতাম। পিতা ওজীফা ইত্যাদি শেষ করে আসতেন ও আমাকে দেখে চলে যেতেন। একদিন এমনি করে তিনি আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, কখনো সুযোগমত তোমাকে একটি কথা বলবো। অবশেষে বহুদিন পর একদিন সকালে অভ্যাসমত কুরআন পাঠে লিপ্ত ছিলাম। তিনি আমার কাছে এসে বললেন; বাবা বলতে চেয়েছিলাম, তুমি যখন কুরআনতেলাওয়াত কর, মনে করবে তা তোমারই উপর অবতীর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ, উপলব্ধি করবে যেন আল্লাহ পাক স্বয়ং তোমার সাথে কথা বলছেন।

সত্যিকার অর্থে পিতার এ শিক্ষাই আল্লামা ইকবালের জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ছিল। মাওলানা সুলায়মান নদভী বর্ণনা করেন, আল্লামা ইকবাল বলতেন, পিতা গুরুর উপরোক্ত কথাটি আমার অন্তরের একান্ত গভীরে বসে যায় এবং তার স্বাদ আমি আজো অনুভব করি।

এটাই ছিল ঐ বীজ যা আল্লামা ইকবালের অন্তরে তাঁর প্রথম জীবনে বপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে যার বৃক্ষের বিস্তৃত শাখাসমূহ ধরাবক্ষে তাঁর ছন্দময় কান্নাসমূহ ছেয়ে আছে। আল্লামা ইকবাল এ শিক্ষাটি আজীবন মনে রেখেছেন এবং বার বার বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ করেছেন। যথা ইংরেজী গ্রন্থ– *"দ্য রি–কনষ্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম"*– এ একস্থানে লিখেছেনঃ

কোন এক সূফী সাধকের কথামত একজন মুমেনের জন্য কুরআনে পাকের মর্ম উপলব্ধি করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুধাবন করে যে, তা তার উপর ওভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে যেমনিভাবে রসূলে পাকের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

তিনি তাঁর উর্দু গ্রন্থ *'বালে জিবরীলের'* একটি গযলে এই কথাটি কবিতার ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

"তেরে যমীর পে যব তক না হো নযুলে কিতাব
গেরাহ কুশা হে না রাযী না সাহেবে কাশ্‌শাফ

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন তব অন্তরে অবতীর্ণ হয়, প্রসিদ্ধ তফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীই হোন বা তফসীরে কাশ্‌শাফের লেখক আল্লামা যমখশরীই হোন, কেউ এর মর্ম গ্রন্থী খুলতে পারবে না।

ফলে, আল্লামা ইকবাল যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন তাঁর গন্ডদ্বয়ের উপর দিয়ে অশ্রু দ্বারা একাধারে বইতে থাকতো। তাঁর সে অশ্রুসিক্ত কুরআনখানি আজো অন্যান্য সব স্মৃতি বহনকারী বস্তুসমূহের সাথে জাভিদ মনযিলে সুরক্ষিত আছে।

তাসাউফভিত্তিক পারিবারিক এহেন পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লামা ইকবাল *'যরবে কলীমে'* স্বীয় প্রিয় পুত্র জাভিদকে সম্বোধন করে লিখিত কবিতায় বলেনঃ

এ কাল হলো দ্বীন–এর জন্য সর্বনাশা/এর স্বভাব হলো নিছক পৌত্তলিকতা
শাহী দরবার থেকেও হলো উত্তম/ খোদাভীরু পাক পুরুষদের আস্তানা
কিন্তু এ কাল হলো ঐন্দ্রজালিক/ সবার স্বভাব হলো অপরিবর্তনীয়
জীবনের ঝরনাধারা হয়েছে শুষ্ক/ কোথায় আর বাকী নিশি রাতের পানীয়
তাদের থেকে শিক্ষাঙ্গন শূন্য হলো/ যাদের দৃষ্টি ছিল প্রখর চাবুক
কিন্তু যে পরিবারের হলে প্রদীপ তুমি / তার অভিরুচি রয়েছে খোদাতত্ত্ব জ্ঞানে

তাসাউফভিত্তিক পরিবেশের প্রভাবের কারণেই তিনি আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতে যেতেন এবং তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতেন। সমকালীন বুযুর্গানে দ্বীনের দরবারেও তাঁর নিয়মিত হাজিরা দেবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তিনি ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে ইউরোপে যাবার পথে দিল্লীতে হযরত খাজা নিযাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহের মাযার যিয়ারত করেন এবং মাযারের শিয়রে দাঁড়িয়ে *"এলতেজায়ে মুসাফির"* মুসাফিরের ফরিয়াদ শিরোনামে *'বাঙ্গে দারা'তে* শামিল কবিতাটি অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেন।

২৫শে জুলাই ১৯১৮ সালে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদীকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি বলেনঃ

"ছুটিতে ইনশাল্লাহ দিল্লী যাবার ইচ্ছা আছে। কারণ, অনেক দিন থেকে হযরত মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার মাযারে হাজির হবার বাসনা রাখি। আশ্চর্যের কিছু নয়, যদি আল্লাহ পাক উক্ত বাসনা পূর্ণ করার তৌফিক দান করেন।"

আবার ২৯শে মার্চ ১৯১৯ সালে দাক্ষিণাত্য হায়দ্রাবাদের পরম হিতৈষী বন্ধু মহারাজা স্যার কৃষ্ণ প্রসাদ–এর নামে পাঠানো এক পত্রে লেখেনঃ

"দিল্লী গিয়েছিলাম এবং দু' দু'বার হযরত খাজা নিযাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহের মাযারে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আক্ষেপ! পীরে সঞ্জরের মাযারে যেতে পারিনি। ইনশাল্লাহ আবার যাবো এবং আস্তানার যিয়ারত করে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে ফিরে আসবো।"

তরীকতে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে পীরে কামেলের সুনজরের উপর আল্লামা ইকবালের গভীর বিশ্বাস ছিল। এ প্রসঙ্গে জগৎ বিখ্যাত পারস্য কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর ও

আল্লামা ইকবালের জীবন ও কবিতায় সূফী মতবাদের প্রভাব

মুগল আমলের বাদশা আকবরের রাজত্বকালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে-সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহের যথাক্রমে হযরত শামস তাবরিজ ও হযরত বাকী বিল্লাহ কর্তৃক এ প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানগুলো দ্রুতগতিতে অতিক্রম করার কথা উল্লেখ করা যায়। আল্লামা ইকবালও এ ধরনের কোন অলৌকিক ঘটনার আশায় বিভিন্ন দরবারে হাজিরা দিয়েছেন। ইকবাল সাহিত্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এ মানস-কামনা অপূর্ণই রয়ে গেল। তাঁর অন্তরে সত্যিকারের অন্বেষা ছিল, যা আল্লাহর পথে অনেক মূল্যবান বস্তু। অবশ্য পাওয়া না পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

ইসলামী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেও আল্লামা ইকবাল তাসাউফ বা সূফী মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আর্নল্ড-এর পরামর্শে ১৯০৫ সালে ইউরোপ গিয়ে তিনি গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে *"ডেভেলপমেন্ট অব ম্যাটাফিজিকস ইন পার্সিয়া "* মনোনয়ন করেন। উক্ত বিষয়ের উপর গবেষণা করে থিসিস লিখতে গিয়ে তাঁকে মুসলিম বিশ্বের তাসাউফভিত্তিক পুরো সাহিত্য অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করতে হয়। ফলে ইসলামী তাসাউফের উপর তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। যদিও উক্ত জ্ঞানের প্রায় সবটাই ছিল গ্রীক দর্শনের প্রভাবে সর্বেশ্বরবাদ-এর উপর স্থাপিত। শুধু মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মাঝে তিনি মানব সত্তার একটি পৃথক অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করেন। এটাই ছিল তাঁর ভবিষ্যত দর্শন কাঠামো নির্মাণের জন্য আলোকবর্তিকা। ওজূদী বা সর্বেশ্বরবাদী তাসাউফের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর বিখ্যাত খুদী দর্শন পেশ করেন মূলত তাঁরই প্রেরণায়। এ জন্যই তিনি *"বালে জিবরীল"* ও অন্যান্য ফার্সী-উর্দু গ্রন্থসমূহে মাওলানা রুমীকে তাঁর আধ্যাত্মিক পীর ও মুরশেদ বলে আখ্যায়িত করেন।

রূহানী জগতে মানবজীবনের চরম চাওয়া-পাওয়াই হচ্ছে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ এবং তার সুন্দর সোপানগুলো পাতানো রয়েছে তাসাউফ বা সূফী মতবাদে-মুজাহাদার ফলস্বরূপ মুশাহাদায় বা ঐকান্তিক অনুশীলনের উপঢৌকনরূপে খোদা দর্শনে । এর অপূর্ব স্বাদ ও অনাবিল আনন্দ শুধু আল্লাহ তায়া'লার প্রিয় বান্দাগণই উপভোগ করে থাকেন। অন্য কথায়, যেহেতু অনুশীলন মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপনের পথকে সুগম করে এবং *'ওয়া আতাইনাহ মিললা দুন্না ইলমা'* অনুসারে এতদ সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞান ইলমে লাদুন্নীর মাধ্যমেই অর্জিত ও আহরিত হয়। সেহেতু মানব জাতির সমস্ত সাধনার মূলে রয়েছে এই মতবাদ। যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হলেন আল্লাহ পাক। সুতরাং তাসাউফের জ্ঞান মানব জীবনের সর্বোচ্চ জ্ঞান। যে আল্লাহকে জানতে ও চিনতে পারলো সে যেন সব কিছুই পেয়ে গেল। আরবীতে প্রবাদ আছে, *'মান লাহুল মাওলানা ফালাহুল কুল'* অর্থাৎ, যে প্রভুকে পেয়ে গেল, সব কিছুই যেন তারই হয়ে গেল। এ তত্ত্ব জ্ঞান লাভে সত্যিকারের শিক্ষা বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। কেননা তা মানুষকে জ্ঞানের উৎপত্তিস্থলের অনেকটা কাছে এনে দেয়।

কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে পার্থিব জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আল্লাহ তা'য়ালার অধীন ও মূল জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা। অবশ্য তন্মধ্যে ইলমে দ্বীনের মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট অনেক উর্ধ্বে। আল্লামা ইকবাল তাই একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "পিতার অভিপ্রায় ছিল, আমি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি। আমার মেধাশক্তি বেশ ভালই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের উদ্দেশে ইউরোপ চলে যাই এবং সময়টা নষ্ট করি"।

তবু আমরা দেখতে পাই নিয়মিতভাবে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করতে না পারলেও এ অভাব পূরণকল্পে তিনি অতি মনোযোগ সহকারে ইসলামী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন এবং উপমহাদেশের তাঁর সমকালীন বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম যথা মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, আলী ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা ফুলওয়ারী প্রমুখদের সাথে সদা যোগাযোগ রেখেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ইসলামের বিভিন্ন জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান চেয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি কুরআন-হাদীস ও গোটা ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হয়েছিলেন, যার বদৌলতে মুসলিম জাহানে তাঁকে আল্লামার সর্বোচ্চ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

আল্লামা ইকবালের কবিতায় ও লেখায় আমরা তাসাউফ বা সূফী মতবাদের যে প্রভাব দেখতে পাই তা ওজুদী বা সর্বেশ্বরবাদী তাসাউফের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এসেছে। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে উক্ত জীবন দর্শনে মানব জাতির কল্যাণ দেখতে পাননি। তাঁর মতে, ঐ দর্শন মানব জীবনে কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা জাগরণ করার পরিবর্তে নিস্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতা আনয়ন করে আর তাই তা বর্জনীয়। তিনি তাঁর ফার্সী কাব্যঃ *'আসরারে খুদী'*তে ধারাবাহিকভাবে খুদী দর্শন পেশ করার পূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং প্রতীক হিসাবে প্রাচ্যে সর্বেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, পারস্য কবি হাফেজ-এর অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি উপমহাদেশের বহু হাফেজভক্ত কবি-সাহিত্যিকদের বিরাগভাজন হন। ফলে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের এক তুমুল ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদের পরামর্শক্রমে তিনি *'আসরারে খুদী'র* পরবর্তী সংস্করণে হাফেয সংক্রান্ত অধ্যায়টিতে মূল বক্তব্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সংশোধন আনয়ন করেন। তাতে সমালোচকদের রোষানল বহুলাংশে প্রশমিত হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আল্লামা ইকবাল কিন্তু তাঁর কাব্য জীবনের শুরুতে সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। ঐ ধরনের ভাবধারার কিছু কিছু নমুনা তাঁর প্রথম উর্দু কাব্যগ্রন্থ *"বাঙ্গে দারা'তে"* দেখতে পাওয়া যায়। তবে *'আসরারে খুদী'* এবং পরে অন্যান্য উর্দু ও ফার্সী গ্রন্থসমূহে তাঁর সমস্ত ভাবধারা সর্বেশ্বরবাদের পরিবর্তে খুদী দর্শনকে কেন্দ্র করেই লিখিত হয়েছে।

ইকবাল ও কাশ্মীরের আযাদী আন্দোলন

জুলফিকার আহমদ কিসমতী

ইসলাম ও মুসলিম জাতির অকৃত্রিম দরদী, দার্শনিক কবি আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল মুসলিম জাতির অধঃপতন, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণ এবং তাদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে হৃদয় থেকে অনেক কথাই বলে গেছেন। কোন মুসলিম দেশের দুরবস্থা দেখলে তাঁর প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠতো। গৌরবোজ্জ্বল কোন মুসলিম স্মৃতির স্পর্শ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর দেহ-মনকে নাড়া দিতো; আর সাথে সাথেই সে সম্পর্কে তাঁর কাব্যিক মন সোচ্চার হয়ে উঠতো, সক্রিয় হয়ে উঠতো তাঁর ক্ষুরধার লেখনী। বিভিন্ন মুসলিম দেশের জন্যে ছিল ইকবাল চিত্তের গভীর টান। তিনি এত দরদের সাথে মুসলিম দেশসমূহের আলোচনা করতেন যে, তা শুনে যে-কোনো শ্রোতার অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। ইউরোপ সফর শেষে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ইতালীর নিকটস্থ সিসিলির উপর তাঁর নজর পড়ে। এক সময় সিসিলি ছিল মুসলিম শৌর্যবীর্যের কেন্দ্র তাঁর হৃদয়পটে তখন সেই স্মৃতি এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। তখনই তিনি বলে উঠলেন ঃ

আহ্! আয় সিসিলি সমন্দর কী হায় তুঝ সে আবরু,

রাহনুমা কি তরাহ ইস্ পানি কে সাহ্‌রা মে হায় তু।

অর্থাৎ, হায়! সিসিলি, তোমার নিমিত্তেই এই সমুদ্র গর্বিত,

তুমি এই পানির মরুভূমিতে পথিকৃত তুল্য।

তিনি পুরো একটি কবিতায় ইসলামী দেশসমূহের করুণ অবস্থা দেখে মাতম করেছেন। সিসিলি এবং কর্ডোভার ধ্বংসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি অশ্রু বিসর্জন দেয়ার পর কনস্টান্টিনোপলের আলোচনা এভাবে করেছেন ঃ

আয় মুসলমাঁ! মিল্লাতে ইসলাম কা দিল হায় ইয়েহ শহর,

সাইকোড়োঁ ছদীউঁ কি কুশত ওয়া খুন কা হাসিল হ্যায় ইয়েহ শহর।

অর্থাৎ, হে মুসলমান! এই শহর হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র,

এই শহরটি শত শতাব্দীর রক্ত মাটির নির্যাস।

ইকবালের চিন্তাজগতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বিরাট আসন পেতে রেখেছিল। এর প্রথম কারণ হলো ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ কাশ্মীরের অধিবাসীদের সাথে রয়েছে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক, দ্বিতীয়

কারণ হলো কাশ্মীরের মাটি। এই মাটির সাথে রয়েছে তাঁর বংশগত যোগসূত্র। এই সম্পর্কদ্বয়ের মধুর অনুভূতির প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে, নিচের কবিতাংশ থেকেই তা সহজে অনুমেয় ঃ

তনম গুলে যে খিয়াবানে জান্নাতে কাশ্মীর

দিল আয হারীমে হেজায ও নাওয়ায শরীযাস্ত।

অর্থাৎ, আমার দেহ কাশ্মীরী উদ্যানেরই একটি ফুল, অন্তর আমার হেজাযের চেতনায় উদ্দীপ্ত, আর চিন্তা আমার শিরাজের ধ্যানধারণায় লালিত।

নিছক ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতাকে ইকবাল স্বাধীনতা মনে করতেন না। চিন্তা ও আত্মার গভীর অনুভূতিসঞ্জাত এক প্রেরণা ও বিশ্বাসের নামই ছিল তাঁর কাছে আসল স্বাধীনতা। কারণ, এই স্বাধীনতা নিছক ভৌগোলিক স্বাধীনতার চেয়ে অনেকগুণ বেশী সত্য ও পবিত্র হয়ে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে বিমন্ডিত হয়। আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার প্রেরণা মুসলিম চিত্তের অভিন্ন অংশ। তাই, স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং এর সহজাত সত্যকে তিনি মতাদর্শের আকারে পেশ করেছেন। বস্তুত এ কারণেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জীর্ণদশা এবং একে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখে একজন সহানুভূতিশীল মুসলিমের ন্যায় আল্লামা ইকবালের অনুভূতিও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলে উঠেন ঃ

আহ! ইয়েহ্ কওম নজীব ও চরবেদস্ত ও তর দিমাগ

হায় ক্যাঁছা রোযে মুকাফাত আয় খোদায়ে দেরগীর।

অর্থাৎ, হায়! এই সভ্রান্ত কর্মঠ জাতি ও সুনিপুণ হস্তশিল্পের অধিকারী সম্প্রদায়, তোমাদের ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হবে? হে ধৈর্যশীল প্রভু! তারা কবে নিজেদের শ্রম সাধনার প্রতিদান পাবে?

কোন জাতি বা সম্প্রদায় তখনই দাসত্বের অবমাননাকর জিঞ্জিরে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে যখন তার মধ্য থেকে অপমানবোধ বিদায় নেয়, সে কর্মবিমুখ হয় এবং পরস্পর হিংসাবিদ্বেষ, কলহদ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের শিকার হয়ে পড়ে। তখনই লোভী, অত্যাচারী, সম্প্রসারণবাদী কোনো শক্তি এহেন অবস্থায় তার স্পর্ধামতো সে জাতির স্বাধীনতা কেড়ে নেয়াকে মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করতে থাকে।

কাশ্মীরী মুসলমান ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে লোভী শাসকশ্রেণীর লোভাতুর দৃষ্টির শিকার হয়ে আছে। সেখানকার অমুসলিম শাসকরা কাশ্মীরী মুসলমানদের শ্রমের বিনিময়ে আগত সম্পদের সিংহ ভাগ দ্বারা নিজেদের বিলাস জীবন অতিবাহিত করে আসছে, অথচ দরিদ্র, ক্ষুধাক্লিষ্ট

কাশ্মীরীরা নিজেদের দেহ রক্ষার মৌলিক চাহিদাটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। আল্লামা ইকবাল মজলুম কাশ্মীরীদের এই অবস্থায় দুঃখ করে লেখেন ঃ

বরেশম কাবা খাজা আয মেহনতে উ,

নসীবেতনাশজামা–এ–তার–তারে।

অর্থাৎ, কাশ্মীরী কর্মকর্তাদের রেশমী সূতায় প্রস্তুত পোশাকপরিচ্ছদ কাশ্মীরের মজদুর জনতারই শ্রম– মেহনতের ফল। তাদের শরীরের শোভা বর্ধনকারী লেবাসের প্রতিটি সূতা ঐ শ্রমিকদের কষ্টশ্রমেরই নিদর্শন।

কাশ্মীরী শ্রমিক, কারিগর এবং অন্যান্য দক্ষ শিল্পী–কারিগরদের উপার্জিত অর্থে শাসকগোষ্ঠী ও পুঁজিপতিদের বিলাসজীবন এবং তার পাশাপাশি কাশ্মিরীদের চরম দৈন্যদশার তুলনা করে ইকবাল এই জাতির আত্মপরিচিতি সম্পর্কে অনুতাপ করে বলেছেনঃ

না দাব দীদা–এ –উ –ফরূগে নেগায় হ্যা,

না দাব সীনা এ– উ– দিলে বে কারারে।

অর্থাৎ, তাদের চক্ষু দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যহীন

অন্তর তাদের উৎসাহ–উদ্দীপনা বঞ্চিত।

আল্লামা ইকবাল কাশ্মীরীদেরকে তাদের পতিত জীবন থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আপন খুদী বা ব্যক্তিত্বকে উজ্জীবিত ও মানসিক বিপ্লব সাধনে এগিয়ে আসার আহবান জানান্। আহবান জানান আত্মপরিচয়ে প্রত্যয়শীল হবার জন্য। বলা বাহুল্য, বিলম্বে হলেও জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিম চিত্তে আজ আত্মসচেতনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

অমুসলিম শাসকরা কোনো কোনো কাশ্মীরী গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে কাশ্মীর ত্যাগে বাধ্য করেছে। অনেক পরিবার শাসকমহলের জুলুম–নিপীড়নে দারিদ্র্য জর্জরিত হয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্কারমূলক সংগঠন 'আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমান লাহোর" প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইকবাল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সেখানে একটি কবিতায় তিনি যা বলেছেন, এতে তাঁর সংবেদনশীল মনোভাবেরই প্রমাণ মেলে। যেমন–

উনহেঁ গর্মো মে মগর মুঝ কো এক সদা আয়ী

কে বয়েত কওম কী ইসলাহ কে হোয়ে মওযুন।

হাজার শোকর কেহ্ এক আঞ্জুমান হয়ী কায়েম

একীন হ্যায় বাহ কে আয়েগা তালেয়ে ভাবো।

অর্থাৎ, শত দুঃখচিন্তার মধ্যে আমার প্রতি এসেছে একটি আহবান, জাতির সংস্কারের একটি অর্থবহ ছন্দ হয়েছে রচিত।

হাজার শুকরিয়া একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস যে, একদিন আসবে সফলতা।

ইকবাল আঞ্জুমানের মঞ্চ থেকে কাশ্মীর মুক্তি আন্দোলনের জন্যে যেই উপাদান ব্যবহারের আহবান জানান, কাশ্মীর গেজেটে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির প্রশ্নে তার গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

১৯৩২ সালের ২১ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণে ইকবাল বলেন: কাশ্মীরের কথা বলতে গেলে সেখানকার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করার প্রয়োজন আমার নেই। যে জাতির মধ্যে আত্মচেতনার অগ্নিশিখা *(ego-flame)* প্রায় নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিলো, তাদের স্পষ্টতঃ আকস্মিক পুনর্জাগরণ তার সংশ্লিষ্ট অপরিহার্য দুর্ভোগ সত্ত্বেও আধুনিক এশিয়ার জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সকল ব্যক্তির কাছেই বিশেষ উল্লাসের কারণ হবে। কাশ্মীরের জনগণের দাবী সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত এবং এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ যে, এমি একটি বুদ্ধিমান ও কর্মনিপুণ জাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অনুভূতির পুনর্জন্ম পরিণামে কেবল এই রাজ্যের অধিবাসীদেরই নয়; বরং, সমগ্রভাবে ভারতীয় জনগণের জন্য একটি শক্তির উৎস বলে প্রমাণিত হবে। অবশ্য সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাব এবং কাশ্মীরী ভাইদের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সহানুভূতি হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের পাল্টা আন্দোলনের *(counter-agitation)* সৃষ্টি করেছে। তারা হাতাশার বশবর্তী হয়ে এর ফলস্বরূপ প্যানইসলামী চক্রান্ত ও কাশ্মীরে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের ন্যায় অবাস্তব কল্পনা আরোপ করতে চায়। এই ধরনের আন্দোলন ও তা দিয়ে কাশ্মীর প্রশ্নকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের ফলে একটি মাত্র পরিণতি সৃষ্টি হতে পারে–তা হচ্ছে হিংসাত্মক দমননীতি অবলম্বন ও তার ফলে রাজ্যে দীর্ঘবিলম্বিত *(prolonged)* অরাজকতা সৃষ্টি। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে, জম্মু প্রদেশের কোনো কোনো অংশে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে এবং কেবলমাত্র বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতিই তাদের অবস্থান স্থলসমূহে পরিস্থিতি আয়ত্তে রেখেছে। রাজ্য কর্তৃপক্ষের সর্বাধিক হিংসাত্মক ও লজ্জাজনক নির্যাতনের মৌখিক খবর এখনো এসে পৌছছে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন তদন্ত কমিশনও কিছু মাত্র কাজে আসতে পারে না। মিড্‌লটন রিপোর্টে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ স্বীকার করা হয়েছে, অথচ তা' থেকে কোনো ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা হয়নি, তার ফলে তা মুসলিম জনগণকে খুশী করতে পারেনি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে,

যে পর্যায়ে তদন্ত দ্বারা কার্যকর ফল লাভ করা যায়, ব্যাপারটি সে পর্যায় অতিক্রম করে গেছে। যে শাসন ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ চালিত হয়, সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতা বোধ তাতে তাদের ক্রমাগত অধিকতর অংশগ্রহণের আকাঙক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃতি দাবী করছে। রাজনৈতিক রক্ষণ-ব্যবস্থা *(political tutelage)* আদিম মানুষের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যখন কোনো পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি গতিশীল সংস্কার-ব্যবস্থা *(radical reform)* দাবী করে তখন তা এড়িয়ে যাওয়া শাসন কর্তৃপক্ষেরই স্বার্থের অনুকূল হয়। সম্ভবত কাশ্মীরের বিচিত্র অবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার ফলেই সেখানকার অধিবাসীরা কোনো প্রকার জনপ্রিয় পরিষদ *(popular assembly)* কায়েম করার দাবী করছে। আমরা আশা করবো যে, রাজ্যের শাসক ও ভারত সরকার যথাসম্ভব অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গিতে জনগণের দাবী বিবেচনা করবেন। আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, নয়া প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ জাতির স্বভাবসুলভ শাসন সংক্রান্ত সূক্ষ্মদর্শিতা সহকারে বিষয়টির অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করবেন এবং একটি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন অথচ অবহেলিত জাতিকে কর্মতৎপরতার সুযোগ দান করবেন-যে জাতি একদা প্রাচীন ভারতের কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছে এবং পরবর্তী আমলে মোগল সংস্কৃতির প্রকৃত জৌলুস বাড়িয়েছে। আমাদের নিজ দেশের মতো কাশ্মীরে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে অসুবিধা থাকতে পারে ; কিন্তু স্থায়ী শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এসব অসুবিধা দ্রুত অতিক্রম করতে হবেই। বর্তমান বিশৃংখলার তাৎপর্য যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা না হয় এবং তার কারণ যদি এমন সব দিকে খুঁজে বেড়ানো হয়, যেখানে তার সন্ধান মিলবে না, তা হলে কাশ্মীর সরকার রাজ্যের পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলবে বলে আমার ভয় হয়।”......

কাশ্মীরী জনগণের খুদীকে সমুন্নত করার আহবান জানিয়ে সেদিন ইকবাল তাদের স্থবিরতা, অনুভূতিহীনতা, হীনমন্যতা এবং নির্লিপ্ততার দেয়ালে আঘাত হেনে যেই উষ্ণতা সৃষ্টি করেছেন, তা বৃথা যায়নি। অতঃপর তিনি কাশ্মীরীদের জন্যে মহাপ্রভুর দরবারে প্রার্থনা জানান।

আজ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তার সেই প্রত্যাশিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মশাল আকৃতি ধারণ করে সেখানকার স্বঘোষিত প্রভু এবং অমুসলিম বাহিনীর জন্যে প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীরের মাটিও যে বীর প্রসবিনী এবং বিজয়, বীরত্ব ও সফলতার দিক থেকে বন্ধ্যাগ্রস্ত নয়; তার লক্ষণ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরী জনগণ আজ তাদের যাবতীয় স্থবিরতা, হীনমন্যতাকে ঝেড়ে-মুছে এখন বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে হলেও নিজেদের খুদী ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ডিক্টেটরদের স্টীম রয়'লারের মুখ থুবড়ে একদিন ভূস্বর্গ কাশ্মীরী জনগণের আযাদী যে প্রতিষ্ঠা হবে-এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

ইকবালের খুদী দর্শন ঃ আল্লাহর পথে সত্যের সংগ্রাম

প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল একটি নাম, একটি ইতিহাস। তাঁর পরিচিতি আন্তর্জাতিক। বিশ্ব কবি, নবযুগের কবি, ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি। আল্লামা ইকবাল দর্শন মিশ্রিত তাঁর অগণিত কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার ডাক দিয়েছিলেন। ইকবালের চিন্তাচেতনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। অর্থাৎ, মানুষের কল্যাণ এবং উন্নতি ও অগ্রগতি। বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শনের মর্মকথা।

ইকবাল তাঁর দীর্ঘ কাব্য চর্চায় ইসলামের শাশ্বত বাণীরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কুরআন–হাদীসের মর্মবাণী তথা ইসলামী জীবন দর্শনের নীলনকশার বিকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। পার্থিব কল্যাণ আর পারলৌকিক মুক্তির অকৃত্রিম দিগদর্শন তুলে ধরেছেন বিশ্ব মানবতার সামনে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও দর্শন, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও কৃত্রিম প্রবৃদ্ধিকে তিনি মানবতার চরম ঘাতক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে আগুন তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল তা–ই তিনি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে । ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতা–সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা জীবনকে তিনি দোযখের কষ্টদায়ক ও নিকৃষ্টতম জীবন থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন। এমনি অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বিশ্ববাসীকে ইসলামী জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছেন। ইকবাল স্বীয় জাতিকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করেছেন, ইসলামের আন্তর্জাতিক দর্শন তুলে ধরেছেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানব মুক্তির পথকে আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আল্লামা ইকবাল যে এক *'কাল্পনিক দোযখী'র* মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা প্রমাণ করে মানুষকে আল্লাহমুখী করার চেষ্টা করেছেন তা–ই বিবৃত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর চরিত্র, কার্যাবলী ও পারস্পরিক সম্পর্ক মানব জীবনকে এমন দুর্বিষহ করে তুলেছে যে, দোযখীর ভাষায় –*'এ পার্থিব জগতের জীবন থেকে দোযখের জীবন অনেক উন্নত।'* এ প্রসঙ্গে ইকবাল যে কাহিনী কাব্যের অবতারণা করেছেন তা এ রকমঃ

একবার এ দোযখী মহান আল্লাহর নিকট এই বলে মুনাজাত করল যে, হে খোদা! এ দুনিয়ার মানুষ স্বার্থপর। তোমাকে ছেড়ে অন্যের পূজা–পার্বণ পালন করে। শুধু তখনি তোমার পূজা করতে এগিয়ে আসে যখন তারা তাদের স্বার্থ রক্ষায় নিরাশ হয়, তাদের মূর্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। অন্য কথায়, যখন মানুষ বিপদে পড়ে অথবা স্বার্থ নষ্ট হতে দেখে তখনি তোমাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করে। মূর্তি বলতে ইকবাল নফস এবং শাসক উভয়কে বুঝিয়েছেন। মানুষ যখন

নফসের ইচ্ছা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা শাসকের নিকট থেকে স্বার্থ রক্ষা সম্ভব না হয়, কেবল তখনি আল্লাহর কথা মনে পড়েঃ

جب دیا رنجے بتوں نےتو خدا یاد آیا-

"নফস অথবা শাসক যখন কষ্ট দিল তখন খোদাকে স্মরণ করলো।"

হে খোদা! এ দুনিয়ার মানুষ তোমাকে এবং তোমার নবীকে ছেড়েছে, তোমার কুরআন ছেড়েছে, আর ছেড়েছে তোমার দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। তৎপরিবর্তে নফস এবং শাসকগোষ্ঠীকে প্রভু বলে গ্রহণ করেছে। ফলে আজ না হিন্দুর পূজা অর্চনা তার কোন উপকারে আসছে, না মুসলমানের নামায তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফ্যাসিবাদী শক্তিশালী জাতিসমূহ অন্যান্য মানবকুলের দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও বোকামীর সুযোগ নিয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ জন্য হিন্দু পূজা আর মুসলমানের নামাযসহ অন্যান্য আংশিক ধর্মীয় কাজের প্রত্যক্ষ কোন উপকার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মুসলমান দিন-রাত নামায পড়ে, হিন্দু পূজা-পার্বণ যথাযথ পালন করে, অথচ তাদের দাসত্বের শিকল আরো মজবুত হচ্ছে। দুর্বল জাতিসমূহ বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাত আরো দুর্বল হচ্ছে। শোষণ, বঞ্চনা আর নৈরাশ্য তাদের জীবনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হে খোদা! প্রত্যেক শাসকই শহর এলাকায় বড় বড় দালানকোঠা, ক্লাব ও ব্যাংক, সিনেমা এবং পার্ক, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হোটেল আর শিল্প-কারখানা নির্মাণের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। অথচ, ঐ শহরেই অগণিত মানুষ রোগে-শোকে আর আর্থিক দুর্গতিতে জীবন বিসর্জন দিয়ে চলেছে। হাজার হাজার নারী এক টুকরো রুটির জন্য আপন ইজ্জত বিক্রি করে চলেছে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ অন্যের ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে, নয়তো বা আত্মহত্যা করছে। লাখো-কোটি ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অগণিত কর্মক্ষম যুবক বেকারত্বের অভিশাপে দগ্ধ হচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জের সহজ-সরল মানুষ ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে দুঃখ-দুর্দশায় কাল যাপন করছে। তদুপরি শাসকগোষ্ঠী কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেই চলেছে। শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে টুঁশব্দ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে সাধারণ মানুষ; বরং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের নামে এরা ধোঁকা খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। শহর-বন্দরে উন্নয়নের নামে যে-সব কর্মকান্ড চালানো হচ্ছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসকদের স্বার্থ রক্ষা। হে খোদা! তোমার দাসত্ব ও আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের দাসত্ব করানোই এসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী শাসক-গোষ্ঠী মানুষকে মানবতার পুন্যময় জীবন থেকে পশুত্বের স্তরে নিয়ে আসছে।

হে খোদা! জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে আমার বাস, ফুটন্ত গরম পানি আমার পানীয়, বিভিন্ন শাস্তি ও বালা-মুসীবত আমার নিত্য সাথী হলেও আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করছি এ জন্য

যে, আমি এখানে পরাধীন নই; বরং সম্পূর্ন স্বাধীন। এখানে (দোযখে) মানুষের উপর মানুষের শাসন-শোষণ, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে আমি মুক্ত। একমাত্র তুমি খোদাই আমার একমাত্র স্মরণীয় সত্তা। আমরা দোযখের অধিবাসীরা মানুষের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দাসত্ব, কর্তৃত্ব বরণ করে নেওয়ার চেয়ে দোযখের জীবনই শ্রেয়। বিশেষ করে, মুসলিম মিল্লাত তো দাসত্ব ও পরাধীনতাকে মেনে নিতেই পারে না। গোটা মুসলিম মিল্লাতের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বীয় খুদীকে জাগ্রত করা। আর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে খুদীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন মহান আল্লাহর দাসত্ব ও প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে জীবনের সর্বস্তরে তাঁরই বিধানকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা। কতই না উত্তম হতো যদি মুসলিম মিল্লাত উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো যে, কবর বা কবরস্তান ভেঙ্গে চুরমার করার চেয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অধিক প্রয়োজন। কেননা, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ-অনুসরণের চেয়ে কবর পূজা অনেক ভাল। (যদিও কবর পূজা অন্যায়)।

যে-সব মনীষী নিজ জীবনে খুদী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং জাতিকে খুদীর আহবান জানিয়েছেন ইকবাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তৎকালীন ভারত উপমাহাদেশসহ গোটা মুসলিম দুনিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব দেখে তিনি অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়েন। তদুপরি জীবনের শেষ দিকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুর্বলতার কারণেও তিনি কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েন। (خلق الانسان ضعيفا) (মানুষকে দুর্বল প্রকৃতির সৃষ্টি করা হয়েছে) এ আয়াতের মর্মানুযায়ী খুদী দর্শনের অকৃত্রিম শিক্ষক প্রবক্তা আল্লামা ইকবালের জীবনেও কোন কোন সময় নৈরাশ্য ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সময়ে মৃত্যু চিন্তাও ইকবালকে ভাবিয়ে তুলেছে। মৃত্যু সততই সত্য, চিরন্ত ও অবধারিত। যারাই এ নশ্বর জগতে আসে আবার তারা বিদায় নিয়ে চলেও যায়। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণিকের জন্য পরকালের কার্যক্ষেত্র হলেও এর ধ্বংস (فناء) অনিবার্য। ইকবাল বলছেন যে, আমরা মানুষ, পরকালের অনন্ত-অসীম সুখ ও শান্তিময় জীবনের জন্য কি সহায় -সম্বল নিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে হিসাব কেউ করছি না। বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহর দরবারে কৃতকর্মের জন্য কি জওয়াব দেব সে ভাবনা আমাদের নেই। মানুষ এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বসে এর রূপ-রস-গন্ধে আনন্দ-উল্লাস করে; আর পরকালীন জীবনকে একেবারে ভুলে যায়। বুলবুল পাখী প্রতিনিয়ত সকাল বেলার ফুটনোন্মুখ সুগন্ধময় সুন্দর ফুলের মাথায় বসে মনের আনন্দে কত না গান গায়, কিন্তু সে কি চিন্তা করেছে যে, বিকেল বেলা ঐ ফুলের সৌন্দর্য, রূপ-রস নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ ফুলে বসে তার আর গান গেয়ে আনন্দ করার সুযোগ থাকবে না।

ইকবাল বলেন, পার্থিব জীবন ও তার ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এক চিরন্তন সত্য। এতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর প্রদত্ত জীবন দর্শনকে বাদ দিয়ে এ দুনিয়াপ্রীতি সম্পূর্ণই বৃথা। মানুষের মৃত্যুতে মানুষ ক্রন্দন করে, মর্সিয়া গায়। এতে ধৈর্য ধরা, সবর করা কঠিন বিষয়। তবে এ ক্রন্দন আর ধৈর্যহারা হওয়া এবং

মৃত্যুকে অস্বীকার করা এক নয়। সা'দী বলেনঃ "কোন ব্যক্তি যদি তার বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে ক্রন্দন না করে সবর করে, তবে মনে করতে হবে যে, তার অন্তর নেই। তার অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত"। অর্থাৎ বন্ধুত্ব আর বন্ধুর মৃত্যুতে সবর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অন্য কথায়, আশেক তার মাশুকের বিরহে সবর করতেই পারে না। অবশ্য, যারা দুনিয়া ও মানবপ্রীতিকেই চূড়ান্ত মনে করে পরকালকে ভুলে যায়, বন্ধুর মৃত্যুতে তার ক্রন্দন বৃথাই বটে। মাটি থেকেই মানুষের জন্ম, আর এ মাটিতেই তার দাফন হবে। এ বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং কাল-কিয়ামতে তাকে পুনর্জীবন দান করা হবে, তাকে প্রতিটি কর্মের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে হবে; এ অনুভূতি না থাকলে, কাজে-কর্মে তার প্রতিফলন না ঘটলে মানুষ পশুর চেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। মানুষের এরকম স্বকীয় চিন্তাধারা একমাত্র স্বাধীন জাতিসমূহের পক্ষেই সম্ভব। পরাধীন জাতির মধ্যে এ সূক্ষ্ম ও চিরন্তন চিন্তার বিকাশ ঘটতেই পারে না। কাজেই হে মুসলিম মিল্লাত! সাবধান।

এ পৃথিবী এবং মানুষের বাহ্যিক রূপ বা আকার ধ্বংস হবে সত্য, তবে মানুষের মনুষ্যত্ব বা আত্মা কোন দিন ধ্বংস হতে পারে না। এ বাহ্যিক ধ্বংসের মধ্যেই মানুষকে তার জীবনের মহাসত্যটিকে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, মানুষ বলতে তার (روح) বা আত্মাকেই বুঝায়। আর রূহ বা আত্মা চির জীবন্ত। এর মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। এ রূহই মানুষকে মানব মর্যাদায় ধরে রেখেছে। এটাকে বাদ দেয়া হলে মানুষের অস্তিত্বই লোপ পাবে। ইকবাল বলেন, মানুষের খুদী এবং রূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। পার্থিব মৃত্যুর পর মানুষকে আরেকটা জীবন দান করা হবে। কারণ, তার রূহের মৃত্যু হয়নি। আর যেহেতু রূহের মৃত্যু নেই, সেহেতু খুদীর মৃত্যু হতে পারে না। সুতরাং যার খুদী জাগ্রত ও সক্রিয়, সে নিজকে এক জীবন্ত সত্তা হিসেবেই দেখতে পাবে। মৃত্যুকে সে ভয় করবে না; বরং অনন্ত-অসীম জীবন লাভের জন্য একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মৃত্যুকেই সানন্দে আলিঙ্গন করবে। মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ ইহজগত হতে পরজগতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ খুদী দর্শনের দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবে এবং দেখবে যে, জগতে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী নয়। জীবন-মৃত্যু সবই তার জন্য। (من عرف نفسه فقد عرف ربه) অর্থাৎ, খুদী দর্শন ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, হে মুসলিম মিল্লাত! তোমার জীবন্ত খুদীকে আরো উন্নত কর।

বস্তুজগতের সবই মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতেরই নির্দশন। প্রতিটি সৃষ্টিতে আল্লাহ বিরাজমান-(ان الحكم الا لله) এখানে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো শাসন চলতে পারেনা। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া যখন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, তা হলে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে কেন? ইকবাল বলেন, এ প্রশ্নের জওয়াব সহজ। তবে বিস্ময়কর বিষয় হলো, ভাল কাজের পুরস্কার কেন নেব? এ প্রশ্ন কেউ করে না। মন্দ কাজের শাস্তি কেন পাব? সেটাই

সবার প্রশ্ন। ভাল, মন্দ, শাস্তি ও পুরস্কার সবই আল্লাহর দান। এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা। আর এটাই হচ্ছে খুদী দর্শনের মর্মকথা। কাজেই জীবন্ত খুদীর অধিকারী মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উভয়কেই যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করে থাকেন। ইশকে ইলাহীর কারনে স্বীয় খুদী মজবুত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট এই বলে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করে যে, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করে আর অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর হুকুমই তো পালন করা হচ্ছে। আর এ জন্য তার কোন ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তা বা হয়রানি ভোগ করতে হয় না; বরং খুদী দর্শনের বদৌলতে বস্তুজগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আল্লাহ তা'আলার এক রহস্যময় খেলা মনে করে পরকালীন অসীম সুখ ও শান্তিময় জীবনের আশায় নিজকে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করে।

মানুষ যদি রাসূলে করীমে (সাঃ)-এর নেতৃত্বে মহান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হয়। তবেই তার খুদী মজবুত হবে। ফলে সে বস্তুজগতের এ মৃত্যুকে তার জীবনের শেষ অধ্যায় মনে করবে না; বরং মৃত্যুকে এক অনিশ্চিত স্থায়ী জীবনের একটি স্তর মনে করবে মাত্র। অন্য কথায়, মৃত্যুকে ভয় না করে বরং পরকালীন স্থায়ী জীবনে পৌঁছবার একটা মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ তথা কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধকে সমাজ তথা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে যাবে। এরই নাম হচ্ছে *"সত্যের সংগ্রাম এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।"* আর এ জিহাদ ও সংগ্রাম ইশকে ইলাহী ও ইশকে রাসূলের উপরই নির্ভর করে। মুসলিম মিল্লাতের পথ আসলে ইশকের পথ; আর ইশকের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। এতে মুসলিম মিল্লাত ভয় পায় না। ইশকে ইলাহী মানুষের খুদীকে জীবন্ত করে তোলে। ফলে সে মৃত্যুকে ভয় করে না। বরং জীবন -মৃত্যুকে মানুষের নিত্যসহচর মনে করে তাকে আল্লাহর আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নেয়। (خلق الموت والحيات ليبلوكم ايكم احسن عملا) "জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি এ জন্য, যেন আল্লাহ ভাল লোকদের পরীক্ষা করে নিতে পারেন।" তাই ইকবাল বলেন, বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে তাকে যেমন *Certificate* দেয়া হয় না, অনুরূপ যে ব্যক্তি ইশকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তার খুদীও মজবুত হয় না। ফলে, তার ঈমানও মজবুত হয় না। হে মুসলিম মিল্লাত! ইশকে ইলাহী ও ইশকে রাসূলের মাধ্যমে খুদীকে জীবন্ত এবং মজবুত কর, দেখবে তোমরা সহজেই পার্থিব উন্নতি লাভে সক্ষম হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্রজাতি -তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই তোমাদের অনুগত হবে। (كنتم خير امة) এ আয়াতের মর্মানুযায়ী তোমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে। পরকালে মুক্তিলাভ করে অসীম সুখ ও শান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে ইকবাল সম্রাট আলমগীরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, তাঁর আত্মাজাগ্রত ছিল আর খুদী জীবন্ত ছিল, ফলে সমগ্র ভারত তাঁর অনুগত ছিল। পৃথিবীর বহু জাতি ও দেশ তাঁর সাথে চুক্তি ও বন্ধুত্ব করাকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করতো। অন্যদিকে তাঁরই নাতি মুহাম্মদ শাহ-এর আত্মা ও খুদী উভয়ই মৃত ছিল বলে নাদের শাহ তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হন। আর এটাই স্বাভাবিক যে, শক্তিশালী জাতিসমূহ দুর্বলকে দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রাখতে চায়।

তাই তো প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা মুসলিম মিল্লাতের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান ছিল। (যার ইতি আজও হয়নি।) ঝড়ো হাওয়ার কারণে ফুলের সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হয়, তেমনি খুদী না থাকার কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশও বিঘ্নিত হয়। আল্লামা ইকবাল ইশকে ইলাহী ও ইশকে রাসূলের মাধ্যমে খুদী ও ঈমানকে মজবুত করার জন্য মুসলিম মিল্লাতকে পথনির্দেশ করে বলেন, তবেই সমগ্র জগৎ তোমাদের অনুগত হবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল, সুখ, শান্তি নিশ্চিত হবে। ইকবাল এই বলে মুসলিম মিল্লাতকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। ঈমানী দুর্বলতার কারণে যদি খুদী মজবুত হয়নি বলে মনে কর তবুও নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। (لاتقنطوا من رحمة الله) আল্লাহর রহমতের আশা ছেড়ো না। খুদীর দুর্বলতার অনুভূতি যেহেতু হয়েছে, কাজেই এখন থেকে খুদীকে মজবুত করার কাজ আরম্ভ করে দাও। একথা মনে করো না যে, আল্লাহর রহমত ও ফয়েজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে; আর ভবিষ্যতে নূরুদ্দীন জংগী এবং সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মতো ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করবেনা। স্বীয় অজ্ঞানতা, অলসতা ও দুর্বলতার কারণে যদিও খুদী দর্শনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়নি, তাতে মন-মেজাজ খারাপ করার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর রহমত তো প্রতিনিয়তই মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় দুনিয়াতে আসছেই। তবে, তা লাভ করার পথে অগ্রসর হও। আর এ পথ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত একমাত্র সত্য ও নির্ভুল পথ।

সর্বশেষে ইকবাল মুমিনের এক অস্বাভাবিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় মুমিন দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং পরাজিত হন। ফলে, তাদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় দুর্বলতা দেখা দেয়। অন্যান্যদের মত মুমিনগণও মনে করতে থাকেন যে, সত্য ও ন্যায়ের পথের পথিক মুমিন পরাজিত। অন্য কথায়, অন্যায় ও অসত্যের পথিকের বিজয় হয়েছে। মুমিনের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ঈমান ও আমল বৃথা গিয়েছে; আর এ জন্য তাকে পুরস্কৃত (ইহকাল ও পরকালে) করা হবে না। যেমন-কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। এ ঘটনায় ইমাম হোসাইন তাঁর ৭০ জন সঙ্গীসহ শাহাদাতবরণ করলেন, যাঁরা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। অন্যদিকে, ইয়াযীদ ও তার দল জয়লাভ করলো, যারা ছিল জালেম। সুতরাং এ ঘটনাসহ আরো এমন সব ঘটনার আলোকে বলা যায়, ঈমান পরাজিত। ইকবাল বলেন, এটা মুমিনের দুর্বল চিন্তা ও বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত মুমিনের জীবনের লক্ষ্যবস্তু দুনিয়াও নয়; আর বস্তুগত দুনিয়ার সফলতাও নয়; বরং তার লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এ পথে যদি বস্তুগত উন্নতি আর পার্থিব সফলতা এসে যায়, তবে এটা তার অতিরিক্ত। অবশ্য, পার্থিব সফলতা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমন--শত্রুর মোকাবিলায় সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী জয়লাভ করলেন; আর টিপু সুলতান শাহাদাতবরণ করলেন। আল্লাহর নিকট উভয়ের সমান মর্যাদা রয়েছে। কারণ, রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা লাভ করা বা দেশ জয় করে সুনাম অর্জন করা এঁদের কারো উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এঁদের উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে মানব কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। বস্তুত এ দুটো

বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কাজেই বাহ্যিক জয়-পরাজয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেয়া মুমিনের উচিত নয়।

ইকবাল বলেন, খোদা দর্শন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই মুমিনের চূড়ান্ত ও চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত আর এ জন্য তাকে দুনিয়া থেকে আসমানে আর আসমান থেকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। একজন মুমিন আল্লাহর চেয়ে অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাছাড়া বস্তুজগতের কোন কিছুই আল্লাহর চেয়ে উত্তম ও মহান নয়। কাজেই সচেতন মুমিনের উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালের মুক্তির উদ্দেশে একমাত্র তাঁরই দেয়া সত্য পথ তথা কুরআনের পথে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা। এ জগত মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তবে ক্ষণস্থায়ী আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান একদিন হবেই। কাজেই মুমিনের উদ্দেশ্য এ ক্ষণস্থায়ী জীবন হতে পারে না। বরং খোদা দর্শন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে, আর এ জন্য তাকে পরকালেও বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, আখেরাত বা পরকাল ছাড়া খোদা-দর্শন সম্ভব নয়। তবে এ জগতে মুমিন খোদা দর্শন লাভ করতে পারে, যদি সে তার খুদীকে উন্নত করতে পারে। আর এ জন্য তাকে মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অন্য কথায়, তার রূহানী তথা আত্মিক শক্তির উন্নতি না হলে খুদীকে মজবুত করা সম্ভব নয়। মুমিনের খুদী দর্শন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইকবাল অনেক সময় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, সেই মুমিনের খুদী জাগ্রত নয়, যে দুনিয়া ও তার বস্তুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না। ফলে অনেকেই ইকবালকে ভুল বুঝেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলাম ও ইকবাল সম্পর্কে আমাদের অনেকের স্বল্প জ্ঞান এবং ভুল ধারণার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম যেমন দুনিয়াকে ছোট করে দেখেনি, তেমনি ইকবালও দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার জীবনকে অবহেলার চোখে দেখার চেষ্টা করেননি। ইকবাল বিশ্বাস করতেন "রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতান ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতান" কুরআনের এ আয়াতে পরকালের মঙ্গলের তুলনায় দুনিয়ার মঙ্গলের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। এ জন্যেই বলা হয় যে, পেটে ক্ষুধা রেখে ইবাদত করলে সে ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয় না। আর যে ব্যক্তি খাওয়ার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, তার ইবাদত পূর্ণ হতে পারে না। কাজেই, প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে 'পেট' তার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। যদি তা-ই হয়--তা হলে মানুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যে আর পার্থক্য থাকবে না। সমাজতন্ত্রের ধারকও বাহক মার্কস ও লেনিন মানুষকে বস্তুবাদ শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পেটের পূজারী বলেছেন এবং পেটের সমাধানই মানুষের চরম উদ্দেশ্য বলে জগতময় আলোড়নও সৃষ্টি করেছেন। ইকবাল বলেন, মানুষের শান্তি প্রকৃতপক্ষে পেটে নয়; বরং শান্তি হচ্ছে অন্তরে। কাজেই সৃষ্টির সেরা হিসেবে পেটের চেয়ে মানসিক শান্তি অর্জনই মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে। অবশ্য, পেটের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার জন্য চেষ্টা করাও ঈমানী দায়িত্ব বটে। তাই খুদী দর্শনের মাধ্যমে মুমিনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শুধু পেটের শান্তি না অন্তরের শান্তিই তার কাম্য।

আল্লামা ইকবাল স্মরণে

মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি ডক্টর আল্লামা ইকবাল বাংলাদেশের বর্তমান জেনারেশনের কাছে প্রায় অপরিচিতই। এমনকি, ইংরেজী ভাষার কবি শেলী, কীটস, বায়রন, ওয়ার্ডস ওয়ার্থরা যাদের কাছে পরিচিত, তাদের অনেকের কাছেও যেন উর্দু-ফারসী ভাষার মহাকবি ইকবাল অপরিচিত। অথচ জানা কথা যে, ইকবাল কোন প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবি ছিলেন না। তিনি এই শতাব্দীরই প্রথম দিকের একজন নামকরা কবি। তাছাড়া তিনি শুধুমাত্র একজন ভারতীয় কবিই ছিলেন না-তিনি ছিলেন একাধারে পন্ডিত ব্যক্তি এবং আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক দার্শনিকও বটে। জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে সর্বোচ্চ পি-এইচ-ডি ডিগ্রী *(Persian Metaphysics)* এবং লন্ডনের এক ইন্‌স্ অব কোর্ট থেকে ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল' লাভ তাঁর সর্বোচ্চ মেধারই লক্ষণ। তাঁর সেই মেধারই আন্তর্জাতিক বর্তমানকালের অন্যতম স্বীকৃতি হচ্ছে এই যে, তাঁরই নামে এবং তাঁরই দর্শন চর্চার এক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পৃথিবীর অন্যতম পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ৭০০ বছরের পুরাতন এবং বস্তুত খৃষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ মানের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়; বরং ওটি জ্ঞান-গবেষণার তীর্থক্ষেত্রও বটে। আর এখানে বিশ্ববিদ্যালয়টির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে, ইসলামী দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসাবে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *Institute for Iqbal Staudies* . কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন পড়া-শুনা এবং গবেষণা করেছিলেন। তাই, তারা তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হয়েছে। সেখানে যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন, সে বাড়ীর বাইরের দেয়ালে মহাকবি আল্লামা ইকবালের নামে চিরস্থায়ীভাবে ফলক খোদাই করে রাখা হয়েছে। মোট কথা, ইকবালের স্বীকৃতি আছে জার্মানীতে ও ইংল্যান্ডে। তেমনি আছে বর্তমান ভারতেও। আর পাকিস্তানের তো জাতীয় কবিই তিনি। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টাদের তিনিও ছিলেন একজন। এই প্রশ্নে বলা যায়, জিন্নাহ পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না। তিনি বরং ছিলেন পাকিস্তান কায়েম করার এক নম্বর সেনা নায়ক বা সেনাপ্রধান। ইকবালের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন জিন্নাহ বা কায়েদে আজম। দু'জনই ছিলেন একই সময়কালের ব্যক্তিত্ব। দু'জনেরই পারিবারিক *background* একই ধরনের ইসলামী মূল্যবোধের গভীরতায় পরিপূর্ণ। দু'জনেরই লেখা-পড়া শুরু হয়েছিল মাদ্রাসায়। দু'জনই দেশের লেখাপড়া শেষে বিদেশে- ইউরোপ-ইংল্যান্ডে লেখা-পড়া করেছিলেন। দু'জনই ছিলেন প্রথম জীবনে কঠোর ভারতীয় *nationalist,* এবং শেষ জীবনে হয়েছিলেন আপোষহীন মুসলিম *nationalist* । এতদসত্ত্বেও পার্থক্য আছে অন্তত একটি বিষয়ে। সেটিও ইকবালকে সম্ভবত কায়েদে আজমের চেয়ে উঁচুতে স্থাপন করে। সেটি

হচ্ছে এই যে, জিন্নাহ সাহেব ব্যক্তিজীবনে ইকবালের মত *devoted* মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে থেকে ব্যা রিস্টারী পড়া শেষে ভারতে ফেরার পরও প্রায় চার দশককাল সময়ব্যাপী ভারতীয় *nationalist* ছিলেন।কংগ্রেসেরনিবেদিতপ্রাণ কর্মীও ছিলেন। কিন্তু ইকবাল ১৯০৯ সালে দেশে ফেরার আগেই একজন পরিবর্তিত মানুষ হয়েছিলেন। নিজের ভারতীয় *nationalist* মন-মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর পুরাতন জাতীয়তার দর্শন পরিত্যাগ করে হয়েছিলেন মুসলিম *nationalist*। জিন্নাহ সাহেবের এই পরিবর্তন হতে প্রায় ৪০ বছর সময় লেগেছিল। শুধু তা-ই নয়; ইকবালই জিন্নাহকে অনেক চেষ্টার পর ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী এক নেতা বানিয়েছিলেন বলেই ঐতিহাসিকরা সঠিক তথ্য দিয়ে থাকেন। এখানে তা হলে প্রশ্ন উঠে, ইকবাল মুসলিম জাতীয়তাবাদী দর্শনে কনভার্ট হতে জিন্নাহর তুলনায় অনেক কম সময় নিয়েছিলেন কেন? ইউরোপে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই ইকবাল *(Pan-Islamist)* এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়েছিলেন কেন? অথচ, দেশে থাকা অবস্থায় তিনি ছিলেন সেক্যুলার-ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট।

জিন্নাহ লন্ডনের লিংকসন্ ইন-এ ব্যারিস্টারী পড়েন অতি অল্প বয়সে। যখন তিনি ব্যারিস্টারী পাস করে সেখানে প্রথম প্রাকটিস শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০/২১ বছর। মনে করা যায় যে, জিন্নাহ শুধুমাত্র *'এন্ট্রান্স'* পাস করে ব্যারিস্টারী পড়া শুরু করেন এবং তিন বছরের কোর্স তিনি দুই বছরেই কৃতিত্বের সাথে শেষ করেছিলেন। অন্যদিকে, ইকবাল পি·এইচ-ডি করা শুরু করেন প্রায় ৩৩ বছর বয়সে এবং তা তিন বছরে শেষ করে তিনি যখন জার্মানী থেকে লন্ডন যান এবং ব্যারিস্টারী পড়া শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩৬ বছর। এর আগে তিনি লাহোরে এক কলেজে শিক্ষকতাও করেছিলেন ১৯০৫ সালে জার্মানীতে যাবার আগে। ফলে, অধিকতর অভিজ্ঞ ইকবাল ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডের সমাজকে বেশী গভীরভাবে দেখতে এবং বুঝতে পেরেছিলেন। আর এই দেখা এবং উপলব্ধির পর পরই ইকবালের পক্ষে ভারতীয় মুসলিম ন্যাশনালিস্ট হওয়া অতি সহজে সম্ভব হয়েছিল। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এমন কি দেখেছিলেন-বুঝেছিলেন ইকবাল। এই শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের কি চেহারা দেখেছিলেন ইকবাল, যা কি-না তাঁকে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট মূল্যবোধ থেকে মুসলমান ন্যাশনালিস্ট করেছিল, প্যান ইসলামিস্ট করেছিল? গির্জাবহুল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কি ইকবালের মুসলিম মানসে কোন গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার আসল চেহারা বুঝতে ইকবালের অসুবিধা হয়নি। কেননা, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রখর মেধা দিয়ে ঐ ভূখন্ডের রাজনৈতিক অবস্থাকে অল্প সময়েই সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সে-সব দেশের

বাহ্যিক '*সেক্যুলার*' রূপের আসল আত্মা ছিল তাদের খৃষ্টান ধর্ম। খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তিতে তাদের সবকিছু গড়ে তোলার পরই কেবল তারা রাজনীতিকে আপাত দৃশ্যতঃ একটা '*সেক্যুলার*' রূপ দিয়েছে। জানা কথা যে, ইংল্যান্ডের ক্রাউন বা রাজা–রাণী এখন পর্যন্ত দেশের সার্বভৌম মালিকানার সাথে *defender of faith-* ও বটে। আর এই *faith* হচ্ছে খৃষ্টান ধর্ম। অন্য আর কোন ধর্ম নয়। ইউরোপের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো '*সেক্যুলার*' জ্ঞান–বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় সত্য, কিন্তু সে–সব শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে খৃষ্টান ধর্ম। অন্য কোন ধর্ম নয়। কেমব্রিজ–অক্সফোর্ডের মত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরী করা হয়েছিল খৃষ্টান পাদ্রী তৈরীর জন্য। সেই ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে '*সেক্যুলার*' শিক্ষার নামে যা বোঝাতে চাইতো এবং আমরা অনেকে যা বুঝতাম, এখনো বুঝি তা হলো আমাদের নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং ধ্বংস করা। সৈয়দ আহমদ খানের মত ইকবাল আরো বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা যদি ভবিষ্যতে ব্রিটিশ '*সেক্যুলার*' শিক্ষা লাভ করার পর নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তা হলে তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং নিশ্চিহ্ন হবার প্রক্রিয়া হয়ত তাদের অজ্ঞাতেই কাজ করবে। ইউরোপীয় স্পেনে বা মুসলিম আন্দালুসিয়ায় খৃষ্টানরা কী নির্মমভাবে মুসলমানদের হত্যা এবং মুসলমানদের প্রায় ৫০০ বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেছিল তা ইকবালের চেয়ে বেশী ভাল করে কে–ই বা জানতেন। ইকবাল খুব ভাল করেই জানতেন যে, ব্রিটিশ শাসন–শোষণের যাঁতাকলে ভারতীয় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী নাস্তানাবুদ হয়েছিল। সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ, নবাব সলীমুল্লাহ প্রমুখের মত ইকবাল বুঝেছিলেন যে, মুসলমানরা দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং কুসংস্কারে তলিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ভারত থেকে ব্রিটিশরা রাজত্ব ছেড়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেলে মুসলমানরা হিন্দুদের মোকাবেলায় অনুন্নত সংখ্যালঘু হিসাবে আরো দুর্গতির শিকার হতে পারে। ফলে, অনিবার্যভাবে মুসলমানরা নিজেদের ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে স্পেনের মুসলমানদের মত ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়তে পারে। ইকবালের এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ১৯৩০ সালের আল্লাহাবাদ (ইলাহাবাদ) মুসলিম লীগ সেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে তাঁর সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করলেন। একই সময়ে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ভারতের আর এক মুসলমান ছাত্র চৌধুরী রহমত আলীও ইকবালের মুসলিম রাষ্ট্রীয় দর্শনের সপক্ষে কাজ শুরু করেন। ভারতীয় মুসলিম মিল্লাত আন্দোলনের তিনি গোড়া পত্তন করেন কেমব্রিজেই। পাকিস্তান নামেরও তিনিই প্রণেতা। তাঁর প্রোগ্রাম অনুযায়ী বাংলা ও পূর্ণ আসাম অঞ্চল মিলে যে মুসলমান স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, তার নাম হবে 'বাংগিস্তান' এবং বঙ্গোপসাগরের নাম দিয়েছিলেন *Sea of Bang-i-Istan.*

ওসমানিস্তান নামে তিনি হায়দারাবাদকেও একটি মুসলিম রাষ্ট্র করতে চেয়েছিলেন। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের '*উত্তর-পশ্চিম*' বা '*উত্তর-পূর্বাঞ্চলের*' কোনটিরই কোন নাম উল্লেখ নেই। থাকার কথাও ছিল না। লাহোর প্রস্তাব পাস হবার পরে যখন ব্রিটিশ এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দু নেতারা '*পাকিস্তান*' নামকে তাচ্ছিল্য ভরে গালাগালি এবং টিটকারী করা শুরু করলো, তখনই এই নামে মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হলো এবং তখনই পশ্চিম অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব অঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেল। রহমত আলীর '*পূর্বাঞ্চলের*'জন্য প্রস্তাবিত '*বাংগিস্তান*' *(বঙ্গ+স্তান)* নাম বাদ পড়লো। অবশ্য, এইসব ঘটলো ইকবালের ইন্তেকালের পর। ৬৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয় ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল এবং লাহোর প্রস্তাব পাস হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ ২৩শে মার্চ শুরু হওয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে। অবশ্য, ইকবাল এর আগেই কয়েক বছরের অব্যাহত সাধনা এবং বুঝা-পড়া করে জিন্নাহকে ভারতে আলাদা মুসলমান দেশ কায়েম করার জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয় বুঝিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন। জিন্নাহ সে প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়েছিলেনমাত্র।

কেউ কেউ বলতে চান যে, ইকবাল বাংলার মুসলমানদের বিষয় চিন্তা করেননি। আসলে এই ধরনের মন্তব্য ভিত্তিহীন মাত্র। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে বসে চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩০ সাল থেকে যখন ইকবালের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণীত হয়ে বাংলা-আসামকে 'বাংগিস্তান' নামে মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করতে পারেন, তখন ইকবাল এই বাংলা অঞ্চলের নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য চিন্তা করেননি তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। বাংলার মুসলমানদের প্রসঙ্গে তিনি জিন্নাহর কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন ঃ

Why should not the Muslims of North-west India and Bengal be considered as nations entitled to self-determination just as other nations in India and outside India are.? (দেখুন, ডঃ ওয়াহিদুজ্জামানের *Towards Pakistan,* পৃষ্ঠা ১৪)।

বাংলার মুসলমানদের *Self-determination* বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে স্বপ্ন ইকবাল ১৯৩০-এর শুরুতে দেখেছিলেন, তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হয়েছে। এই অঞ্চলের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হবে কি-না সেটা ভাবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে, ইকবাল শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতই রোমন্থন করেননি। তিনি মুসলিম মিল্লাতের সংহতি কামনা করে যে কালজয়ী আহবান রেখে গেছেন তা-ই বা ঢাকি কোন আদলে?

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজেদের স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রে বাস করতে পারলেই যে তারা সর্বতোভাবে স্বাধীন হবে–এমনটিও তাঁর শেষ কথা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের স্বাধীন–সার্বভৌম দেশে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারবে এবং এই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করা এবং তা চিরদিনের জন্য সযত্নে রক্ষা করা এক জরুরী প্রয়োজন হবে। পশ্চিমা গণতন্ত্রের অনেক ভাল দিক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু খারাপ যে দিকগুলো আছে এবং যার কুফলে সংখ্যালঘুরা সাংস্কৃতিকভাবে যে নিপীড়িত হতে পারে তা ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন ভালভাবেই। সেই গণতন্ত্র যদি বৃটিশ ছেড়ে যাওয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে মুসলমান সংখ্যালঘুরা চিরস্থায়ীভাবে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শোষণের শিকারে পরিণত হবেই। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে উত্তর ভারতে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ফিরিস্তী বর্তমানে সারা বিশ্বেরই জানা। বর্তমানে সেখানে শুধু মুসলমানরাই নয়; বরং নিম্নবর্ণের সকল শ্রেণী ও উপ–জাতির মানুষও বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিপীড়িত এবং শোষিত হচ্ছে। কাশ্মীর, খালিস্তান, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে ১৯৪৭–এর পর থেকেই যে–সব চরম শোষণ ও নিপীড়ন চলছে তা ইকবাল ১৯৩০–এর শুরুতেই দিব্য চোখে দেখেছিলেন। আর তাই তিনি মুসলমানদের জন্য স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের গভীর প্রয়োজনের কথা সরাসরিই বলেছিলেন। ইউরোপীয় সমাজ–সভ্যতার সাথে আমরা কেউ কেউ পরিচিত। এর সুযোগ জীবনে পেয়েছি। আমার জীবনেরও প্রায় ৭টি বছর কেটেছে শুধুমাত্র লন্ডন শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ইংল্যান্ড–স্কটল্যান্ড ছাড়াও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের–বিশেষ করে ফ্রান্সের বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছিল। এসব শিক্ষায়তনের প্রায় প্রতিটিতেই আমার একটা কমন উপলব্ধি হয়েছে। এই উপলব্ধি শুধু দেখার বা শোনার নয়। বইপত্রে পড়াশুনা করে বুঝবারও ছিল এবং তা হচ্ছে এই, যে ইউরোপীয়রা এবং ব্রিটিশরা তাদের শিক্ষা কারিকুলামের মধ্য দিয়ে তৈরী করে খৃষ্টান ভদ্র লোক। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার্চ চ্যানেল বা গির্জার ছড়াছড়ি দেখলে আমাদের মত দেশের ছেলেমেয়েরা অবাক না হয়ে পারবে না। প্রতিটি কন্‌স্টিটিউয়েন্ট কলেজের সাথে সেখানে আছে এক একটি বিরাটাকার চ্যানেল। অতি মনোরম এসব চ্যানেলের নির্মাণশৈলী। স্টেইন্টেড গ্লাসে তৈরী বিরাট বিরাট জানালা। শত শত বছরেও সেগুলো এতটুকু যেন পুরনো হয়নি। আগেই বলেছি যে, এগুলো প্রাথমিকভাবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খৃষ্টান ধর্মের পাদ্রী তৈরী করার জন্য। সন্দেহ নেই, বর্তমানে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাদ্রী ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ের গ্রাজুয়েট তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সেখানকার সামগ্রিক সাধারণ পরিবেশ খৃষ্টান মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যান্ডের এমনি এক ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজে পড়াশুনা–গবেষণা করতে এসে

ইকবালের বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, ব্রিটিশসহ ইউরোপীয় সমাজ ও শিক্ষা- ব্যবস্থার মূল ভিত খৃষ্ট ধর্ম ছাড়া অন্য আর কোথাও ছিল না। অথচ তারাই কি–না ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা শেখাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের এই চালাকির মাঝে মুসলমানদের ধ্বংসই দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা পরিত্যাগ করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরে কনভার্ট হবার পেছনের কারণ হিসাবে উপরোক্ত উপলব্ধিও দায়ী ছিল। সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় আন্দোলনও তাঁর অনুভূতিতে অনেক খোরাক জুগিয়েছিল বলে যুক্তিযুক্তভাবে মনে করা যায়। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও পাকিস্তানের ভিত্তি রচনায় আলীগড় আন্দোলনের অবদান স্বীকার করেছিলেন এবং এই কারণেই তিনি তাঁর সম্পত্তির এক বিরাট অংশ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করে গেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইকবাল যখন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন তখন সারা বিশ্বের মুসলমানরা পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। হতাশায় দিশেহারা ছিল মুসলিম উম্মাহ। এই উম্মাহকে আযাদীর স্বপ্ন দেখানো এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। ঈমানের বলে বলীয়ান হবার ফলেই কেবল তিনি হতাশ ও অধঃপতিত মুসলমানদেরকে আযাদীর আশার আলো দেখাতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান কায়েম তাই ছিল সারা জগতের মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক বিস্ময়কর আশার আলো। আর এই আলো সর্বপ্রথম যারা দেখছিলেন তার মধ্যে ইকবালই ছিলেন অগ্রণী। ইকবাল তাই শুধু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যই এক মহান নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা জাহানের মুসলিম উম্মাহরও আযাদীর স্বপ্নদ্রষ্টা এবং দার্শনিক মর্দে মোমিন।

ইকবালের ইনসান-ই-কামিল

ফাহমিদ-উর-রহমান

ইকবাল দর্শনের যে উন্মুখর চেতনা তার সম্পূর্ণ অবয়ব তাঁরই পরিকল্পিত ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক দুর্জয় মহাসামুদ্রিক বলিষ্ঠতাকে লালন করে ইকবাল তাঁর অভূতপূর্ব জীবন দর্শনের চিত্রাবলী মানবতার সামনে হাজির করেছেন। সংশয়, সংক্ষুব্ধ এবং নৈরাজ্য কবলিত পৃথিবীতে ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে এক কল্যাণ সূর্যের স্পন্দন। ইকবালের পরিপূর্ণ মানবের ধারণার উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। কেননা, ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষের মধ্যে রয়েছে অপরিসীম সৃষ্টিশীলতা, অগ্রসরমান জীবন চেতনা এবং সীমাহীন কল্যাণ ভাবনা। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তারই মধ্যে রূপ লাভ করেছে বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতার লীলা পাথর। আল্লাহ তাই তাকে মনোনীত করেছেন পৃথিবীর খলীফা হিসেবে। মানুষের এই খেলাফতপ্রাপ্তির মধ্যে যে মহান দায়িত্ব ও অভূতপূর্ব সম্মান নির্ধারিত হয়েছে, ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে তারই সমন্বয়। তাঁর এক কবিতায় তিনি বলেছেনঃ

মুমিনের রহস্য হচ্ছে শোন

যদিও তাকে মনে হয় নিছক কোরআনের হেফজকারী

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-ই হচ্ছে জীবন্ত কোরআন। (অনুবাদঃ লেখক)

পরিপূর্ণ মানবের ধারণা মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তাজগতে নবোদিত চন্দ্রের কিরণচ্ছটার মতো সর্বদা জ্বল-জ্বল করেছে। এদের মধ্যে আবদুল করীম আল-জিল্লী এবং মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর অভূতপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক ধারণাসমূহ মুসলিম দর্শনকে গৌরবোজ্জ্বল স্থানে উন্নীত করেছে। জিল্লী ও আরাবী উভয়ই ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী। জিল্লী তাঁর গ্রন্থ 'আল-ইনসান আল-কামিল ফী মা আরেফাতিল আওয়াখির ওয়াল আওয়ায়েল'- এ এই ধারণা বিবৃত করেছেন যে, 'মানুষ হচ্ছে এক নিজস্ব সত্তা এবং প্রকৃতিগতভাবে সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও বিশ্বজগতের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। সে হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা ও পার্থিবজগতের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র বন্ধন।' ইউসুফ হুসায়েন খান জিল্লীর এ ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন এমনিভাবেঃ

Man is an entity by himself and is a manifestation of both God and universe. Man is the main objective behind the creation of the entire universe, because no other creation has the requisite qualities to mirror the truly divine characteristics. The Holy Prophet is the supreme example of the perfect man and anybody treading the path of life in the light of his character is sure to achieve the highest ideal which life is capable of Destowing upon man. ('Ruh-i-Iqbal' Yousuf Hussain Khan):

একইভাবে মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীও বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মধ্যে স্রষ্টার অনুভূতিই তাকে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তরিত করতে পারে। সমভাবে পরিপূর্ণ মানবের মধ্যে খোদা তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করেন। এ· ই· আফিফী ইবনুল আরাবীর দর্শনের নিম্নবর্ণিত রূপ পরিচয় দিয়েছেনঃ

Ibn-i-Arabi's Pantheism is not a materialistic view of reality. The external world of sensible objects is but a fleeting shadow of the Real (al-Haqq), God. It is a form of a cosmism which denies that the Phenomenal has being or meaning apart from and independently of God. It is not that cold-blooded pantheism in which the name of God is mentioned for sheer courtesy; or at the most, for logical necessity or consistency. On the contrary, it is the sort of pantheism in which God swallows up everything and the so called other than God is reduced to nothing. God alone is the all-embracing and eternal reality. (A. E. Affifi in A History of Muslim Philosophy Vol-1 edited by M. M. Sharif)

ইবনুল আরাবী রাসূল (সঃ)–কে পরিপূর্ণ মানব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু,তাঁর ধারণায় রাসূল (সঃ) জাগ্রত হয়েছেন এমনিভাবেঃ

The entity Mohammad combining in itself both the spirit of Mohammad and Mohammad the man, is for Ibn Arabi the link between the eternal and the temporal, the real and the phenomenal. While Mohammad the man was born, was active and died in time, the

spirit of Mohammad exists in all eternity. (Rom Londan : The Philosophy of Ibn Arabi)

ইকবাল সূফীবাদের এই গুরু তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন, কিন্তু মানব জীবনের জন্য এটিকে কোন কার্যকরী উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেননি। রাসূল (সঃ) কে তিনি মূর্ত করেছেন এক শক্তিমান, সৎকর্মশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর কল্পিত পরিপূর্ণ মানব হচ্ছে এক মুমিন, যে তার আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রক এবং পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌছানোর চেষ্টায় অবিরত মগ্ন। ইকবালের মুমিন কোন আধ্যাত্মিক চরিত্র নয়। তিনি তাঁকে খোদায়ী চেতনা ও বৈশিষ্ট্যে নিমজ্জমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি মনে করেন, প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব এই ধারণা পোষণ করেন যে, আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নতির দুয়ার উন্মোচিত হয় কেবলমাত্র খোদায়ী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। এই ধারণার সমর্থন মেলে কোরআনুল হাকীমে, যেখানে রাসূল (সঃ)–কে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর বান্দা হিসেবে। ইকবাল তাই বলেনঃ

তোমার অস্তিত্বকে তুমি বিকিয়ে দিয়ো না
খোদার মহিমার কাছে (অনুবাদ ঃ লেখক)

উপরোক্ত কবিতার অর্থ হলো পরিপূর্ণ মানব খোদায়ী জাতকে অর্জন করবে, কিন্তু কখনো খোদার মধ্যে নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেবে না। ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার সাথে ইকবালের এখানেই পার্থক্য। আর এক কবিতায় তিনি মুমিনের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছেন। প্রকাশের ভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী যেন কোন নিপুণ চিত্রকর তার তুলির আঁচড়ে টেনে আনছেন অমলিন সৌন্দর্যের বিভাঃ

মোমেনের হস্ত;
সে তো আল্লারই হস্ত;
আধিপত্যশীল, সম্পদশালী, সৃষ্টিধর্মী,
সাফল্য আনয়নকারী,
মৃত্তিকা থেকে জাত,
তবু সে জ্যোতির্ময় প্রকৃতিতে,
সৃষ্টি সে স্রষ্টার গুণে সমৃদ্ধ।
উদাসীন তার অন্তর

আল্লামা ইকবাল

উভয় বিশ্বের সম্পদে
আকাঙ্ক্ষা তার অতি অল্প,
কিন্তু উদ্দেশ্য তার বিরাট,
পথ তার মহিমাময়,
আর দৃষ্টি মুগ্ধকর;
বাক্যে সে মৃদু আর উষ্ণ অনুসন্ধানে,
অন্তর ও মন তার
যেমন বিশুদ্ধ সংগ্রামে
তেমনই শান্তিতে (অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবাল দর্শন পাঠে আমাদের মধ্যে ইনসান-ই-কামিলের একটি ধারণা চিত্ররূপময় হয়ে ওঠে, পাশাপাশি ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে কি কি গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন তারও একটি ধারণা আমাদের মনের মুকুরে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রথমতঃ মুমিনের জীবনকে তিনি বিবেচনা করেছেন গতিশীল ও কর্মপ্রবণতার আলোকোজ্জ্বল এক রশ্মি হিসেবে। কর্মবিমুখ, নিশ্চল এবং সংগ্রামবিহীন জীবন তার কাছে অর্থহীন। এই কর্মশীলতার প্রকৃতি হবে সৃষ্টিধর্মী ও মৌলিক। কারণ, মানুষের সৃষ্টিশীল চেতনাই তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং অসমৃদ্ধ বিশ্বকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। প্রকৃত মুমিন তার জিন্দেগী নির্বাহ করে পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রেখে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে দেয় নবতর গতিশীল রূপ। *'আসরার-ই-খুদী'* কাব্যে কবি হযরত আলী (রাঃ)-এর নামসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ইনসান-ই-কামিলের সক্রিয় গুণরাজির একটি রেখাচিত্র অংকন করেছেনঃ

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হোতে পারে বু-তোরাব,
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয়
পশ্চিম গগন থেকে,
আত্মজ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম করে যান আল্লার হস্তের,
আর আল্লার হস্ত হয়েই
শাসন চালিয়ে যান সকলের উপর।

ইকবালেরইনসান-ই-কামিল

যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
কমনীয় তুমি গোলাপের মতো।
কঠিন হয়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেন তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর ভিত্তি,
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
যদি তুমি নির্মাণ না কর প্রাচীর অথবা দ্বার
অপর কেহ নির্মাণ করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।
জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নতুন জগৎ
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়,
হয়ে উঠ ইবরাহীমের মতো।
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা-
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে-
সে শুধু নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর ক্ষেত্রের মধ্যে
সবল চরিত্র মানব-
যে প্রভু তার আপনার
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।
যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গেরসাথে।
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একটা নবীন বিশ্ব-

যা' চলবে তার খুশীতে,
যে বেঁচে থাকতে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষেরমতো।
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ
জীবনের কাছে একটি মাত্র নিয়ম।
জীবনশক্তির প্রকাশ,–
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাঙক্ষা।
জীবন বীজ আর ক্ষমতা তার ফসল,
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয় সত্য–মিথ্যার রহস্য।
ওগো অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত বিশ্বাসে,
বিশ্বাস কর নিজেদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা বলে। (অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

দ্বিতীয়তঃ মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশে স্বীয় মেধা ও মননকে ব্যবহার করা। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ছাড়া প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার কাছে সে পরিণত হবে করুণার পাত্রে। বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে সাহস যোগায় ঠিক, কিন্তু মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে একে নিয়োজিত করা যাবে তখন যখন তা নিয়ন্ত্রিত হবে প্রেম দ্বারা। ইকবালের ধারণায় উজ্জীবিত এই প্রেম কোন মানসিক আবেগ নয়। এ হলো এক সক্রিয় শক্তি, যা মানবীয় প্রচেষ্টাকে অধিকতর গতিবান করে তোলে; মানব ব্যক্তিত্বকে উন্নীত করে সীমাহীন মর্যাদার আসনে। এ অবস্থায় মুমিন যুক্ত হয় খোদার সাথে একই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায়। প্রকৃত মুমিন জীবনধারণ করে আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর ইচ্ছাকে বুলন্দ করবার জন্য নিজে জীবনবাজি রাখে এবং এমনিভাবে নিজেকে তৈরী করে আল্লাহর খলীফা হিসেবে। পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মুমিনকে তাই নানা ধরনের জিহাদে শামিল হতে হয়। এই জেহাদ স্বীয় প্রবৃত্তির দিক থেকেও হতে পারে কিংবা বহির্জগতের নানা ধরনের অন্যায়–অবিচার ও বেঈমানীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার মত প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। এই ধরনের জিহাদ স্বাভাবিকভাবে মুমিনকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধশালী। অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী। এর ফলে বর্ধিত হয় তার অন্তর্সম্পদ। যা কি–না তাকে সকল দুর্নীতি ও অকল্যাণকে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সকল সামাজিক দুর্দৈবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার শক্তি যোগায়। এমনিভাবে মুমিন তার সকল আস্থা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে এবং নিজে স্রষ্টার সৃষ্টিশীল জীবন বিন্যাসের একটি অংশে পরিণত হয়ঃ

ইকবালের ইনসান-ই-কামিল

'বান্দায়ে হক' নির্ভরশীল হয় না
অবস্থার কাছে;
জীবন নয় ঘন্টা দোলকের আবর্তন।
মুসলিম যদি তুমি,
শিক্ষা কর আত্মনির্ভরতা
হও তুমি অবিমিশ্র আশীর্বাদ
বিশ্বের সকল জাতির কাছে,
সন্ধান করো না তোমার জীবিকা
নীচমনার হাত থেকে।
ইউসুফের মতো তুমি;
সুলভ করো না আপনাকে।
হেলায় উপেক্ষা কর তুমি
কায়কাউসের সাম্রাজ্য,
কোরবান করো তোমার শির,
তবু কোরবান করো না তোমার সম্মান।
সেই মানুষই তুলনাহীন–
যে জানতে শেখে তার আপনাকে,
সেই কওমই সত্যিকার কওম
যে আপোষ করে না অপরের সাথে।
শিক্ষা করে মোস্তফার বাণীর তাৎপর্য
বর্জন করো সকল আরাধ্য–
এক আল্লাহ ছাড়া। (অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের মতে, এই আদর্শ মানব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় তিনটি গুণ আয়ত্ত করা; সাহস, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ফক'র।

সাহস হলো পরিপূর্ণ মানবের জীবন চর্চার আবশ্যকীয় উপাদান। উপরন্তু ভীতি তার কাছে মানব জীবনের পরিশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা আনয়নের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবন্ধক। প্রেম যেমন আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও সাহসী করে, ভীতি তেমনি আত্মাকে করে অবদমিত। এই আত্মা তখন

মানব চরিত্রের কলংক হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহর ভীতি ব্যতীত অপর সব রকমের ভীতি যাবতীয় খারাবীর জন্ম দেয়। ইকবাল মনে করেন, একমাত্র তাওহীদই পারে মানুষকে ভীতিমুক্ত জীবননির্বাহে উৎসাহ যোগাতে। তাওহীদের অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা ব্যতীত বিশ্ব জগতের যাবতীয় শক্তিকে নির্ভয়ে উপেক্ষা করা, যা মানুষের স্বাধীন গমনাগমনে কিংবা কল্যাণযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভীতি থেকেই জন্ম নেয় সব রকমের অন্যায় ভাবনা, যা মানবীয় সংহতিকে দুর্বল করে; জীবনের সকল সৌন্দর্য হরণ করে। সুতরাং তাওহীদ হচ্ছে এক সুদৃঢ় বর্ম, যা মুমিনকে সকল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগায়ঃ

প্রেম দগ্ধ করে দিক সকল ভীতি
ভয় কর কেবল আল্লাহকে
আর বেঁচে থাক সিংহের মতো;
আল্লার ভীতি ঈমানের প্রারম্ভ
আর অপরের ভীতি হচ্ছে
অবগুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা;
মুক্ত কর নিজকে
অপরের ভীতি থেকে
তুমি এক ঘুমন্ত শক্তি;
জাগ্রত করে তোল আপনাকে। (অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

অন্যত্র ইকবাল বলেছেনঃ

ওগো যারা আছ বন্দী
ভীতির জিন্দানখানায়
শিখে নেও মহানবীর নির্দেশঃ
'ভীত হয়ো না'
যদি তুমি ঈমান রাখ আল্লাহতে
মুক্ত কর আপনাকে সকল ভীতি থেকে
আর লাভ–ক্ষতির সকল আশংকা থেকে;
গায়রুল্লাহর ভীতি
পশ্চাৎমুখী করে কর্মকে
সেই তো দস্যু–

ইকবালের ইনসান-ই-কামিল

রাহজানি করে জীবনের কাফেলাকে;
যখন তার বীজ রোপিত হয়
তোমার ক্ষেত্রে,
জীবন হয় পশ্চাৎমুখী আত্মবিকাশ থেকে;
যে কেহ উপলব্ধি করেছে মুস্তাফার শিক্ষা
দেখেছে পৌত্তলিকতা বিরাজমান
ভীতির বুকে। (অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের পরিকল্পিত পরিপূর্ণ মানবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। কারণ, ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্বারোপকারী চিন্তাধারার বিকাশের জন্য চাই সুস্থ, সুন্দর সামাজিক পরিবেশ। কারণ, অনেকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হলে যদি পরমতসহিষ্ণুতা না থাকে তা হলে এক অনিবার্য সংঘর্ষের পথে সবাই এগিয়ে যাবে এবং আত্মবিকাশের ধারণা পরিণত হবে নিছক প্রহেলিকায়। ইকবাল বলেন, কর্মপ্রবণ আত্মার নীতি হচ্ছে নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ।

ইকবালের এই সহিষ্ণুতা শক্তিতে; দুর্বলতার মৃত্তিকায় এর জাগরণ ঘটেনি। বলিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তির সহিষ্ণুতা এমন সে তার বিশ্বাসবোধ থেকেই উপলব্ধি করে অপরেরও বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কার্যকর করার ধারণা একটি ন্যায়সংগত অধিকার। ইকবাল মনে করেন, মুমিন পোষিত এ সহিষ্ণুতার ধারণা একান্তই ধর্মীয়। কোন প্রত্যয়বিহীন মূল্যবোধ থেকে এর জন্ম লাভ সম্ভব নয়ঃ

ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন আকাঙক্ষা
পূর্ণতা লাভের জন্য;
আরম্ভ তার ভক্তিতে
আর সমাপ্তি প্রেমে।
কঠোর বাক্য উচ্চারণ পাপ,
কারণ কাফের ও মোমেন
উভয়ই হচ্ছে খালকে খোদা।
আদমিয়াত কি?

আল্লামা ইকবাল

মানবের প্রতি শ্রদ্ধা
শিক্ষা করো উপলব্ধি করতে
মানবেরমর্যাদা
প্রেমিক মানুষ শিখে নেয় আল্লাহর পথ;
সম উদার সে
মোমেন ও কাফেরের কাছে;
গ্রহণ করো কুফর ও দীনকে
সমভাবে তোমার অন্তরে
যদি অন্তরই দূরে সরে যায় অন্তর থেকে,
অভিশাপে পূর্ণ হয় মানব অন্তর
অন্তর নিঃসন্দেহে কারাবন্দী
জল ও কর্দমের কয়েদখানায়
কিন্তু সমগ্র বিশ্বজগতে রয়েছে
অন্তরের আধিপত্য। (অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবাল মুমিনের তৃতীয় গুণ হিসেবে ফক্‌রের উল্লেখ করেছেন। ফক্র হচ্ছে সেই গুণ যা মুমিনকে জড় বিশ্ব জয় করতে উৎসাহ যোগাবে, কিন্তু নিজে পরিণত হবে না জড় বিশ্বের দাসে।

এখন আমরা ইকবালের বিবেচিত ও পরিকল্পিত ইনসান-ই-কামিলের একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি নির্মাণ করতে পারি। ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে সেই মহাশক্তিবান. মানব যে সমস্ত শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহর রাজ্যের প্রতিনিধিতে পরিণত হবে। পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রক্ষা করে সে তার ব্যক্তিত্বকে প্রচন্ড গতিবান করে তুলবে এবং জড় বিশ্ব তার আয়ত্তাধীন হবে। এ অবস্থায় একজন বিজয়ীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েও তার চারিত্রিক স্খলন ঘটবে না কিংবা কোন প্রলোভন তার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না। কেননা, তার নৈতিকতা স্বপ্নাতীত উচ্চতায় পৌঁছেছে।

তার মর্যাদাই তাকে আল্লাহর ক্রম সম্প্রসারিত জীবন চেতনার দিকে নিয়ে যাবে। সে তখন শুধু সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না; অন্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যে-কোন আত্মত্যাগ স্বীকারেরও অঙ্গীকার করবে। যে-সব কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মানবতার বিপর্যয়কে প্রকট করে তোলে তার বিরুদ্ধেও ইনসান-ই-কামিল হবে সোচ্চার।

ইকবালেরইনসান-ই-কামিল

ইকবালের কাছে এই পরিপূর্ণ মানব এমন একজন মুমিন যার সাথে একজন কাফেরের পার্থক্য শুধু ধর্মীয় পার্থক্যই নয়; জীবনের উপর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও; তা হল সে তার সমগ্র শক্তির বিকাশে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে কি–না; যদি করে তবে তা ঐশী ইচ্ছার পূর্ণতা সাধনে কতখানি খরচ করেছেঃ

মুসলিম যদি হয় কাফের;
তার না হয় শাহী, না হয় ফকিরী;
যদি সে হয় সত্যিকার মোমেন,
ফকীর হয়েও সে করে যায় শাহী কর্তব্য,
সৈনিক যদি হয় কাফের
ভরসা করে সে শমশেরের উপর;
আর সে যদি হয় মোমেন
সে লড়াই করে যায় তেগ ব্যতীত।
মুসলিম যদি হয় ঈমান বর্জিত,
সে তখন তকদীরের দাস;
যখন সে মোমেন
সে পরিণত হয় তকদীরে ইলাহীতে।
(অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

কবি তাঁর *'জরবে কলীমে'* কাফের ও মুমিনের পার্থক্যকে আশ্চর্য সুন্দর দীপ্তিতে রঙিন করে তুলেছেনঃ

কাফেরের পরিচয়ঃ সে হারিয়ে ফেলে
আপনাকে বিশ্বের বুকে,
আর বিশ্বজগৎ যায় হারিয়ে
মোমেনের মাঝে। (অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এমনিভাবে কবি তাঁর জাভিদনামায়ও 'নেদায়ে জামাল'–মানবতার প্রতি সত্য ও সুন্দরের পথে আল্লাহর আহবানকে মধুর করে তুলেছেন – যেখানে জীবনের মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি তা যেমন তাকে হৃদয়ংগম করতে হয়, তেমনি তাকে নিয়োজিত হতে হয় মানবতার সেবায়ঃ

অতিক্রম করে যাও প্রাচ্যের সীমানা,

আল্লামা ইকবাল

প্রতিরোধ করো পাশ্চাত্যের যাদু,
এইসব প্রাচীন ও নবীন
রাখে না একটি শস্য কণারও মূল্য
যে রত্ন বিনিময় করেছো তুমি
অন্ধকারের মানুষদের সাথে,
এত দামী–যা আমানত রাখা যায় না
জিবরাইলেরকাছেও।
জীবন আত্মপ্রত্যয়শীল
আর সে সৃষ্টি করে তার আপন মজলিস;
ওগো কাফেলার সংগী
চলো সবার সাথে,
স্বাধীন থাক সকলের থেকে
দীপ্ততর তুমি
দীপ্তিমান চন্দ্র অপেক্ষা;
থাক জীবন্ত হয়ে,
যেনো প্রতি পরমাণু লাভ করে তোমার দীপ্তি।
(অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এমনি যে কবি আজীবন মানবতার কল্যাণকামিতার গান গেয়েছেন, নৈরাশ্যের গহীন অন্ধকারেও মানবতার জন্য আশার দেয়ালি জ্বেলেছেন, ইনসান–ই–কামিল––পরিপূর্ণ মানবের স্বপ্ন সংগীতও হলো তাঁর মানবতারই আনন্দ কুসুম।

ইকবাল ও সমকালীন ইসলামী জাগরণ

সৈয়দ তোসারফ আলী

১৯৮৯ সালের গোড়ার দিকে সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিয়ে মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে, সলমন রুশদি হঠাৎ করে উপন্যাসের আধারে ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্য রাখতে উৎসাহী হলেন কেন? কেনইবা ভাইকিং সংস্থা (পেঙ্গুইন গোষ্ঠি) এজন্য রুশদিকে অগ্রিম রয়্যালটি বাবদ সাড়ে আট লাখ পাউন্ড দিতে গেলো? কেনইবা পাশ্চাত্য জোটবদ্ধভাবে তার এই ইসলাম বিদ্বেষী বইটি প্রচারের ব্যাপারে এতো উৎসাহ দেখালো? এসব প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হয়েছে। হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয় সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দিকে। আমরা দেখতে পাই বেশ আগে থেকেই গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে একটা ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিলো। গোটা আশির দশক ধরে ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ পাশ্চাত্যকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। ক্ষেত্রবিশেষে ভীত-সন্ত্রস্তও করে। এ প্রসঙ্গে দি ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া লিখেছিলোঃ 'The present upsuge of Islam has shaken the whole world. The international press is full of its echoes and the political implications of the resurgence are being closely studied by the Countries of the west. All over the Muslim world events are taking place with such rapidity that the rise of the crescent is being watched nervously in many of the Centres of Power.'

বাংলায় ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় ঃ ''ইসলামের বর্তমান পুনর্জাগরণ গোটা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমের দেশগুলো ঘনিষ্ঠভাবে এই পুনর্জাগরণের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে পর্যবেক্ষণ করছে। গোটা মুসলিম জাহান জুড়ে ঘটনাবলি এতো দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে যে, নওহেলালের উদয়কে বৃহৎ শক্তিবর্গের অনেকেই শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে।''

১৯৪৮ সালে কিংবা ১৯৬৭ সালে আরব সেনাবাহিনীর ওপর ইসরাইলের বিজয় লাভের পর মুসলিম বিশ্বের ওপর যে নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছিলো সে ছায়া যে দ্রুত অপসৃয়মান সেটা পাশ্চাত্য ভালো করেই জানে। পাশ্চাত্য এটাও জানে যে, ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সময়ে মুসলিম দেশসমূহ পরস্পরের কাছাকাছি আসে। নিজেদের সামরিক শক্তির প্রতি আস্থা ফিরে পায়। মুসলিম বিশ্বের হাতে আসে তেল সম্পদ। যার ওপর পাশ্চাত্য নির্ভরশীল। এই তেল সম্পদ মুসলিম বিশ্বের আত্মবিশ্বাসকে প্রজ্বলিত করে। পাশ্চাত্যের পক্ষেও

মুসলিম বিশ্বকে আগের মতো অবহেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহুদী বাহিনীর ইউরোপীয় অধিনায়ক আরব–ইসরাইল যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিন অধিকার করে তা ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করার সময় ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ থেকে সমস্ত ক্রুসেডের অবসান হলো'। সেই ফিলিস্তিন আজ দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে। যে সব মুসলিম প্রধান দেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠেছিলো সেগুলো আবার একে একে ইসলামী সংস্কৃতির ঘাঁটি হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবে নাস্তিকতাকে উৎসাহ যুগিয়ে, একচেটিয়াভাবে মার্কসবাদী–লেনিনবাদী প্রচার–প্রপাগান্ডা চালিয়েও ৫টি রিপাবলিকের ৫ কোটি মুসলমানকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে ফেরানো সম্ভব হয়নি। সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলিম প্রধান ৫টি রিপাবলিকের জনগোষ্ঠি তাদের নিজস্ব ভাষা শিখছে এবং ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনযাপন করছে। একমাত্র উজবেকিস্তানেই ৫০টি মসজিদে বিপুলসংখ্যক মুসলমান নিয়মিত নামাজ আদায় করছে। সমরখন্দ ও বোখারায় মুসলমানদের প্রধান প্রধান ছুটির দিন মুসলিম সম্প্রদায় উদযাপন করছে বিপুল উৎসাহে। সোভিয়েত সীমান্ত সন্নিহিত গণচীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের প্রায় তিন কোটি মুসলমানকে ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় আল্লাহ–রাসূলের নাম ভোলাবারও চেষ্টা কম করা হয়নি। কিন্তু সে জবরদস্তি নিস্ফল প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চীনা কর্তৃপক্ষও বাধ্য হয়েছেন মসজিদের দরজা খুলে দিতে। সেখানে মুয়াজ্জিন বর্তমানে আজান দিচ্ছে এবং মুসল্লিরা নামাজ পড়ছে।

আফগান মুসলমানদের ইসলাম প্রীতির পরিচয় ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে পেয়েছিলেন বাদশাহ আমানুল্লাহ। সমকালে পেয়েছেন সোভিয়েত বাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন, বারবাক কারমাল, নজিবুল্লাহ প্রমুখ। ইসলাম আর কোরআনের দোহাই পেড়ে স্বাধীনচেতা আফগান মুজাহিদদের বিভ্রান্ত করা কোনোভাবে সম্ভব হয়নি। আফগান মুজাহিদদের সংগ্রাম সমকালীন ইসলামী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনও বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বর্জন করে ইসলামী চরিত্র সংহত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামকে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার তরুণ সম্প্রদায়ও আজ ইসলামী ঐতিহ্য অনুসরণে বিপুল আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফিলিপাইনের কয়েক লাখ মরো মুসলিম দীর্ঘকাল যাবৎ স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করছে। ইসলামের এই নব জাগরণকে পাশ্চাত্য যে খুব সুনজরে দেখবে এমনটি আশা করা যায় না। তাই, সলমন রুশদিকে সাড়ে আট লাখ পাউন্ড অগ্রিম রয়্যালটি দিয়ে লিখিয়েছে তথাকথিত উপন্যাস স্যাটানিক ভার্সেস। ইসলাম বিদ্বেষী এই উপন্যাসটিকে

শুধু মুসলমানরা নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা এমনকি ধর্মে অবিশ্বাসীরা পর্যন্ত তীব্র সমালোচনা করছেন। ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক খুশবন্ত সিং এবং মার্কসবাদী লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমালোচনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। খুশবন্ত সিং বইটির নিন্দা করেন এবং তিনি পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া প্রকাশনা–সংস্থার সম্পাদকীয় বোর্ডে থাকার সুবাদে বইটি বের করতে নিষেধ করেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'রুশদির' 'শয়তানের কাব্য' একটি অভিসন্ধি প্রণোদিত অসৎ রাজনৈতিক প্ররোচনারই বিকলাঙ্গ জাতক'। তিনি বইটিকে 'পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ' মনে করেন।

দুই

মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী ধরে একটা অপমান, অবিশ্বাস এবং নিরাপত্তাহীনতা হৃদয়ে লালন করে এসেছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা করার জন্য পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। আরব ভূমিতে অভ্যুদয়ের পর এক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া এবং আফ্রিকার বৃহদাংশ ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। ইউরোপের স্পেন, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। ফ্রান্সের টুরস যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় না ঘটলে 'ইউরোপের ধর্ম হতো ইসলামে' মন্তব্য করেছেন পন্ডিত জওহেরলাল নেহেরু তার বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ গ্রন্থে। যাহোক, খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের অনেক ক্ষেত্রে সংঘাতে যেতে হয়েছে–এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পশ্চিম এশিয়া থেকে খৃষ্টান ধর্ম যোদ্ধাদের হটিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসন ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ইতিহাস আরও বলে, এই ষোড়শ শতকে অটোম্যান শাসনামলে ইসলাম শক্তিমত্তায় ও গৌরবের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

ক্রুসেডের যুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী গাজী সালাহউদ্দিনের হাতে পরাজয়বরণ করার পর থেকে পাশ্চাত্যের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। একদিকে পরাজয়ের গ্লানি, অন্যদিকে কর্তৃত্ব প্রসারের পথে বাধা–এই দুই কারণে পাশ্চাত্য ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। তাই, পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পরবর্তীকালে ইসলামকে, ইসলামের নবীকে এবং সার্বিকভাবে মুসলমানদের কদর্যতম রঙে রঞ্জিত করার চেষ্টা করে। ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করা আর মুসলমানদের বর্বর আখ্যা দেয়া তাদের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, ব্যতিক্রম হিসেবে অনেক ইউরোপীয় মনীষী ইসলামের প্রশংসাও করেছেন।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইসলামের প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে। এই সুযোগে খৃষ্টান–শক্তি মুসলিম বিশ্বে ঢুকে পড়ে এবং ঢুকেই মুসলিম সাম্রাজ্যের শান্তি, অর্থনীতি এবং ঐতিহ্যের মহত্ত বিনাশ করতে তৎপর হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী

খেলাফতের পরাজয়ের পর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুসলিম সাম্রাজ্যকে খন্ড-বিখন্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। বস্তুত, মুসলমানদের জীবনে এক মহাদুর্দিন নেমে আসে।

এই সময়টাতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুসলিম বিশ্বের সামনে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে হাজির হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থিত করে কমিউনিজম। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিক্যপুষ্ট কমিউনিজম কোনোটাই মুসলমানের পক্ষে গলধঃকরণ করা সম্ভব না হলেও এসব মতাদর্শের প্রচুর প্রভাব পড়ে মুসলিম মানসে। মুসলিম প্রধান কোন কোন দেশ জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে আবার কোন কোন দেশ সমাজবাদের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস পান। এ প্রসংগে ইরান, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ইরানের শাহ এবং তার পিতা দু'জনে ইরানকে পাশ্চাত্যের ধাঁচে আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। আর এ কাজ করতে গিয়ে তাদের চিরায়ত জীবনধারা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ইসলামী ঐতিহ্য থেকে ইরানকে দূরে সরিয়ে আনেন। নারী মুক্তির নামে ১৯৩৫ সালে রেজা শাহ ইরানের মহিলাদের বোরকা পরা নিষিদ্ধ করে দেন আইন করে। এর বিরুদ্ধে বাধা এসেছিলো, তীব্র বাধা কিন্তু শাহ নির্মমভাবে সে প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছিলেন। রাস্তায় সৈনিকদের নামিয়ে মহিলাদের বোরকা ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। বোরকা পরা মহিলাদের রাস্তায় বেরুনো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিলো। এমনকি দোকানদারদের বাধ্য করা হয়েছিলো বোরকা পরিহিত মহিলাদের বয়কট করতে। অবশ্য, আজ বোরকা বা কালো চাদর ইরানের মহিলারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। শাহবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে হাজার হাজার ইরানী মহিলাদের বোরকা পরে অংশ নিতে দেখা যায়।

এই শতকের বিশের দশকে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের আদলে গড়ার জন্য অনেক কিছুই করেন। জার্মান, ইতালিয়ান এবং সুইজারল্যান্ডের আইন দিয়ে ইসলামী শরিয়তী আইনকে হটিয়ে দেন। মসজিদকে রাজনীতি থেকে পৃথক করাটা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেন। ফেজটুপি পরিধান নিষিদ্ধ করেন। পাশ্চাত্যের পোশাক চালু করেন। এমনকি পবিত্র হজব্রত পালনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ পর্যন্ত করেন। এভাবে কামাল আতাতুর্ক পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুকরণে আধুনিক তুরস্ক গড়ে তোলার প্র য়াস পান। কিন্তু তুরস্কের তৌহিদী জনতার হৃদয়-মন থেকে ইসলামের আসন টলানো যে সম্ভব হয়নি সেটা আজকের তুরস্ক সম্পর্কে যারা খবর রাখেন তারাই স্বীকার করবেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই তুরস্ক আবার ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করেছে।

মিশরের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। আরব বিশ্বে জনবহুল দেশ হিসেবে মিশরের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটি তার সমস্যার সমাধানে কখনও প্রাচ্যের দিকে, কখনও প্রতীচ্যের দিকে কখনও বা আরব জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু আজ মিশর আবার ইসলামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে উন্মুখ। সেখানকার ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ইসলামী ভাবধারার প্রচন্ড প্রভাবের কথা তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অজানা থাকার কথা নয়।

আজ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে তথা মরক্কো থেকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপাইন পর্যন্ত ইসলামী জাগরণের ঢেউ বিস্তৃত। যাকে পাশ্চাত্য ঝড় হিশেবে দেখছে। পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রে যা বিভিন্ন সময়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ `Militant Islam is on the March' (জঙ্গী ইসলাম এগিয়ে চলেছে), `Solders of Allah Advance' (আল্লাহর সৈনিকেরা এগিয়ে চলেছে), Back to medievalism' ('মধ্যযুগীয়তায় প্রত্যাবর্তন'), Muslim World Rekindles its Militancy (মুসলিম বিশ্বে জঙ্গীরূপের পুনরুত্থান)। মুসলিম বিশ্বের এই অভূতপূর্ব জাগরণ দেখে পাশ্চাত্য উদ্বিগ্ন, বিচলিত। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই ইসলামী জাগরণকে `Religious revivalism' ধর্মীয় পুনর্জাগরণ বলছে। তারা যা বলতে চেয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলোঃ 'Muslims are trying to opt out of History... They will only cripple themselves'. `They do not seem to be fully conscious of the challenges and requirements of Modern times'. `Their answer to every crisis is to withdraw into the past.' অর্থাৎ 'মুসলিমরা ইতিহাসের বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে।. . . এতে তারা নিজেদেরই পঙ্গু করবে মাত্র। মনে হচ্ছে তারা আধুনিক সময়ের চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। তারা প্রতিটি সংকটের উত্তর খুঁজছে অতীতের ভেতর।'

পাশ্চাত্যের এই প্রচারণা আধুনিক ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সত্য নয়। ইসলাম কোনোমতেই ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত এক ধারালো হাতিয়ার নয়, বিংশ শতাব্দীতে যা মরিচা ধরে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ইসলামকে একটি নীতি সর্বস্ব ধর্ম ভাবলে মস্ত ভুল হবে। সমকালীন সামাজিক মানবিক রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম অক্ষম এমন ধারণা করলে সে ধারণা হবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতারই নামান্তর। ইসলাম যে একটা গতিশীল ধর্ম, যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো শক্তি যে ইসলামের রয়েছে, সেটা এই শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী, শেখ আবদুর রহমান কাওয়াকেবী, ডক্টর

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল প্রমুখ মনীষী বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে গেছেন। এইসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিম মনীষীদের কাছে আজকের ইসলামী আন্দোলন নানাভাবে ঋণী।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল ভালো করেই জানেন যে, সাম্প্রতিককালে মুসলিম তরুণরাই ইসলামী আন্দোলনে দুর্বার গতি সঞ্চার করেছে। সর্বত্রই যে ইসলামী আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে, চিন্তা-ভাবনায় কিংবা আচার-আচরণে ক্ষেত্রবিশেষে যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে না সেটা আমাদের বক্তব্য নয়। মুসলিম প্রধান দেশের প্রবীণদের রক্ষণশীল অংশ এবং কোনো কোনো মুসলিম দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের সংগে ইসলামপন্থী তরুণদের বিরোধ সৃষ্টি হতেও দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তরুণদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা অবলম্বনের অভিযোগও উঠছে। এ প্রসংগে ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভী (Yusuf al- Qaradawi) কি বলেছেন দেখুনঃ 'We demand everything of our youth, but we do not follow what we preach, as if we are naturally entitled to all the rights while the young must be burdened with all the duties. Yet we always emphasize that there are duties as well as rights for all, what we actually need is the unflincling courage to admit that our youth have been forced to resort to what we call 'religious extremism' through our own misdeeds. We claim to be Muslims, yet we do not follow the teachings of Islam. We recite Quran, but we do not apply its ahkam. We claim to love prophet Muhammad (saas), but we fail to follow his sunnah. We declare in our constitutions that Islam is the official religion, but we never give Islam its due place in legislation or orientation. Our own hypocrisy and self contradictions have alienated the young who sought to understand Islam without assistance or guidence from us. They have found parents discouraging, ulama indifferent, rulers hostile, and counselors cynical. Therefore, in order to rectify this situation, we need to begin by reforming ourselves and our societies according to Allah's decree before we can ask our youth to be calm, to show wisdom and temperance. (ISLAMIC AWAKENING BETWEEN REJECTION AND EXTREMISM, P-X Introduction).

ইউসুফ আল কারযাভীর এ বক্তব্যের বাংলা রূপান্তর করলে দাঁড়ায়ঃ "তরুণদের কাছে আমাদের দাবিটা সর্বাঙ্গীন, কিন্তু আমরা যা বলি তা আমরা নিজেরাই করি না, যেন যাবতীয় অধিকার কেবল আমাদেরই জন্য এবং যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করা শুধু তরুণদেরই দায়িত্ব। অথচ সবসময়ই জোর দিয়ে বলে আসছি যে, সকলের যেমন অধিকার আছে, তেমনি কর্তব্যও আছে। আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন তা হলো এই

সত্যকে স্বীকার করার অনমনীয় সাহস যে আমাদের নিজেদের ভুলের কারণেই আমাদের যুবসমাজ 'ধর্মীয় চরমপন্থা' গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আমরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করি, অথচ ইসলামের শিক্ষা আমরা অনুসরণ করি না। আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি, কিন্তু তার আহকাম আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করি না। আমরা মহানবী মোহাম্মদ (দঃ)কে ভালোবাসি বলে দাবি করি, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ আমরা অনুসরণ করি না। আমাদের সংবিধানে আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করি, অথচ কখনোই আইনকানুনে বা অভিমুখীনতার ক্ষেত্রে ইসলামকে উপযুক্ত স্থান দেই না। আমাদের নিজেদের কপটতা ও স্ববিরোধিতা তরুণদের বিছিন্ন করে রেখেছে যারা আমাদের সহায়তা বা দিকনির্দেশনা ছাড়াই ইসলামকে বুঝতে চেয়েছে। তারা দেখেছে অভিভাবক বা পিতৃপুরুষরা নিরুৎসাহী, আলেমসমাজ উদাসীন, শাসকরা বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং পরামর্শদাতারা উন্নাসিক। কাজেই, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে, আমাদের যুবসমাজকে স্থিরচিত্ত হতে এবং বিজ্ঞতা ও সংযমের পরিচয় দেয়ার আহবান জানানোর আগে আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদেরকে ও সমাজকে সংস্কার করার মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হবে।

তিন

আজ মুসলিম বিশ্বে যে জাগরণ এসেছে তাকে বুঝতে হলে আমাদের মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার গভীরে যেতে হবে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলিম প্রধান অনেক দেশই তার অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা এবং জীবন পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু, আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি। পাশ্চাত্যের অনুকরণে অনেক মুসলিম দেশে শিল্পায়ন হয়েছে, সামাজিক মূল্যবোধ ও আর্থিক প্যাটার্নে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু আধুনিকায়নের সুফল একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে মুষ্টিমেয় লোক। অথচ এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে বিপুল বিশাল জনগোষ্ঠির। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির গ্রাম থেকে উৎসাদিত হয়ে ভিড় জমিয়েছে শহরের বস্তিতে। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। ব্যবধান বেড়েছে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে। সবচে' বড় কথা, গভীর কোনো পারিবারিক, সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান করতে পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা তেমন সফল হয়নি। এর প্রতিকার কোথায়? ইসলামী জীবনধারার মধ্যেই এর প্রতিকার খোঁজা হচ্ছে। যেহেতু ইসলাম অতীতে সরল, অনাড়ম্বর, ভ্রাতৃপ্রতিম, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এক ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্ট নজির রেখেছে। তাই, ইসলামী শাসনের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো আজ মুসলিম জনগোষ্ঠিকে বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের উজ্জীবিত করছে। ড্রাগস, পপ মিউজিক আর পর্ণোগ্রাফী-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই মরণ ফাঁদ

মুসলিম তরুণরা আজ বেরিয়ে আসতে উদগ্রীব। এটাও লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসার পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরাই ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছে। তারাই West-toxication বা পাশ্চাত্যাসক্তি বিরোধী আন্দোলনে সংক্রিয় অংশ নিচ্ছে।

এটা সবাই স্বীকার করেন যে, অতীতে ইসলাম মানব সভ্যতার আধুনিকায়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সপ্তম শতকে আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই ইসলাম অগ্রগতির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে। কিন্তু যখনই ইসলাম চিরন্তন বিশ্বাসের সংগে পরিবর্তনশীল জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেনি তখনই ইসলামের অগ্রগতি থেমে গেছে। এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠন গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল কি বলেছেন দেখুনঃ 'The ultimate spritual basis of all life, as conceived by Islam, is eternal and reveals itself in variety and change. A society based on such a conception of reality must reconcile in its life, the categories of permanence and change. It must possess eternal principles to regulate its collective life, for the eternal gives us a foothold in the world of perpetual change. But eternal principles when they are understood to exclude all possibilities of change which, according to the Quran, is one of the greatest `signs' of God, tend to immobilize what is essentially mobile in its nature. The failure of Europe in political and social science illustrates the former principle, the immobility of Islam during the last 500 years illustrates the latter". (The Reconstruction of Religious thought in Islam: Allama Muhammad Iqbal P-147).

"ইসলামের দৃষ্টিতে, সর্বপ্রকার জীবনের পরম বা চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ভিত্তিটি চিরন্তন এবং তা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। বাস্তব সত্তা সম্পর্কে এরূপ বোধের ওপর ভিত্তিশীল যে সমাজ তাকে স্থিতি ও গতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতেই হয়। সামষ্টিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার জন্য সমাজের অবশ্যই শাশ্বত নীতিমালা থাকতে হবে, কেননা নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এই শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় নৈতিক ভিত্তিমূলেই আমরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু এইসব চিরন্তন নীতি সূত্রের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার যাবতীয় সম্ভাবনার সুযোগ রাখতে হবে। কোরআনের মতে, পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে স্রষ্টার মহত্তম একটি নিদর্শন বা গুণ। একে অস্বীকার করার অর্থ, যার প্রকৃতি মূলত গতিশীল তাতে গতিহীনতা আরোপ করা। শাশ্বত নীতিতে দৃঢ়মূল নয় বলেই রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানে ইউরোপ ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে চিরন্তনের সঙ্গে

পরিবর্তনশীলতার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি বলে ইসলাম গত পাঁচ শত বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।”

আজকের দিনে শাশ্বত বিশ্বাসের সংগে পরিবর্তনকে ধারণ করতে হলে ইসলামী আন্দোলনকে সময়ের দাবি পূরণে দক্ষতা দেখাতে হবে যেমন দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন আমাদের চারজন মহান ইমাম ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায়। তাঁদের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক উদারতাই আজকের ইসলামী আন্দোলনকে আধুনিক জীবন সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, মুসলিম সমাজে তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন বহু মনীষী রয়েছেন যাঁরা আধুনিক মানুষকে আশার বাণী শোনাতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য পিপাসা এবং প্রাচ্যের অজ্ঞতা এবং আধ্যাত্মিক দাসত্বের নিগড় থেকে মানবতাকে মুক্ত করার দায়িত্ব আজ মুসলমানদের বিশেষ করে ইসলামী চিন্তাবিদদের। কারণ কোরআন মুসলমানদের প্রতি এই আহবান জানাচ্ছেঃ You have a pivotal role to play in the service of mankind, you must act as a model to others as the Prophet was a model to you". (Chapter 2:153)

অর্থাৎ "মানবজাতির সেবায় তোমাদের পালনীয় নেতৃভূমিকা রয়েছে, তোমাদেরকে অবশ্যই অন্যদের সামনে আদর্শ হিসেবে কাজ করতে হবে, যেমনটি রাসুল ছিলেন তোমাদের কাছে আদর্শ।” (সুরা ২ঃ১৫৩)

সলমান রুশদী ইসলামের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে গিয়ে একদিকে তার নিজের জন্য যেমন বিপদ ডেকে আনেন, তেমনি মানব সমাজে মারাত্মক অশান্তির আগুন জ্বালেন। তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারান। মুসলিম বিশ্বের সংগে পাশ্চাত্যের মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি ও বৈরিতার সৃষ্টি হয়। বস্তুত সলমান রুশদীদের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতি কি হবে তার নির্দেশ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারীর সাজা কোরআনের সুরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতেই আছে, যা সলমান রুশদীদের অজানা থাকার কথা নয়।

(লেখাটি ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ইকবাল স্টাডিজ–এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

ইকবালের হাস্যরস

মতিউর রহমান মল্লিক /আবু নাঈম

আল্লামা ইকবাল ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও উঁচু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তবুও মার্জিত কৌতুকপ্রিয়তা আর উন্নত রসবোধ তাঁর চরিত্রের একটি উজ্জ্বলতর দিকও বটে। গুরু-গম্ভীর আলোচনা-পর্যালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনায়াসে পরিবেশন করতেন সুনির্মল ব্যঙ্গ-রসিকতা, পরিবেশ হয়ে উঠতো উচ্ছল আনন্দ-ভরপুর। ভদ্র এবং রুচিপূর্ণ হাস্য-রসিকতা খুবই পছন্দ করতেন তিনি। নিজেও এ ধরনের হাস্য-রস পরিবেশনের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। একটি কবিতায় ডঃ ইকবাল নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ

সর্বদা এই হৃদয় আমার
মুক্ত বাঁধনহীন
কেউ পারে কি ফুলের কলি হতে
ছিনিয়েনিতে
মুচকি হাসির চিন!

জীবন্ত গ্রন্থ

একবার পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড ডঃ ইকবালকে বললেন ঃ

–আপনার কি এমন কোন মর্যাদাবান জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জানা-শোনা আছে, যাঁকে *'শামসুল উলামা'* (জ্ঞানীদের সূর্য] উপাধি প্রদান করা যায়?

ডঃ ইকবাল সিয়ালকোট কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ মীর হাসানের নাম উল্লেখ করলে গভর্নর সাহেব খানিকটা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ

–তাঁর নাম তো এ-ই প্রথম শুনলাম আপনার কাছে। আচ্ছা, তাঁর কি কোন বই প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তরে ইকবাল বললেন ঃ

– না তাঁর কোন বই অবশ্য এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে, একখানা জীবন্ত গ্রন্থ কিন্তু এখনও বর্তমান রয়েছে তাঁর।

খুব কৌতূহলী হয়ে গভর্নর সাহেব বলে উঠলেন ঃ

–তা হলে সেই গ্রন্থের নামটা কি? সহাস্যে জবাব দিলেন ড· ইকবাল "এই তো আমিই সেই জীবন্ত গ্রন্থ, তিনি আমার সম্মানিত শিক্ষক।" গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড ডঃ ইকবালের এই জ্ঞানদীপ্ত রসিকতায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং খুব তাড়াতাড়িই অধ্যাপক সৈয়দ মীর হাসানকে *'শামসুল উলামা'* উপাধি প্রদান করলেন।

বোজর্গী

উর্দু সাহিত্যের মহান কবি গালিবের মত মহাকবি ডঃ ইকবালেরও ছিল আমের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ। মৌসুম শুরু হতে না হতেই ইকবাল নিজেই বাজারে যেতেন আম কিনতে। শুধু নিজেই খেতেন না, বন্ধুদের বাড়ীতেও পাঠাতেন।

একবার কবি আকবার এলাহাবাদী কবি ইকবালের জন্যে এলাহাবাদ থেকে আম পাঠালেন– ল্যাংড়া জাতের। ডঃ ইকবাল অত্যন্ত খুশী হলেন এবং এলাহাবাদীকে ফেরৎ ডাকেই কবিতা লিখে পাঠালেন ঃ

আকবার আপনার বোজর্গীতে
আহারে,
ল্যাংড়া সে–ও পৌছলো এসে
লাহোরে।

সেকেন্দারিয়া –কলন্দারিয়া

একদিন আল্লামা ইকবাল ঘরের বাইরে বসে আছেন, এমন সময় ইয়া বড় এক পাগড়িওয়ালা– ইয়া বড় এক লাঠিওয়ালা এসে হাজির হল। এসেই ডঃ ইকবালের পা টেপা শুরু করলো। চুপ করে রইলেন তিনি, সুযোগ দিলেন তাঁকে আরো কিছুক্ষণ পা টেপার। তারপর এক সময় বললেনঃ

– কি বাবাজী, কি খবর, কি মনে করে এখানে?

ফকীর বাবাজী জবাবে বললেনঃ

–আমি আমার পীরের কাছে গিয়েছিলাম তো তিনি বললেন, "ডঃ ইকবালকে তোমাদের এলাকার '*কলন্দারিয়া তরীকা'র* খেলাফত দান করা হয়েছে।"

ইকবাল বললেন ঃ

– কিন্তু আমাকে যে *'কলন্দারিয়া তরীকার'* খেলাফত দান করা হয়েছে বাবাজী, সে–ব্যাপারে তো কোন হকুম নামাই এখনও পাইনি।

ফকীর বাবাজী ও ডঃ ইকবালের মধ্যে এ ধরনের মারেফতী আলোচনা চলাকালে হঠাৎ এসে হাজির হলেন চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেব। তিনি এসে সেকেন্দার হায়াত খান সম্পর্কে কিছু বলা শুরু করতেই ডঃ ইকবাল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন ঃ

– চৌধুরী সাহেব, রাখুন আপনার *'সেকেন্দারিয়াতরীকা'*, দেখছেন না এখানে 'কলন্দারিয়া তরীকা'র আলোচনা চলছে এখন।

আল্লাহর কাছে দরখাস্ত

পাঞ্জাবের একজন বিখ্যাত পীর একবার আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন এবং কথায় কথায় এক পর্যায়ে তাঁর আসবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন ঃ

– সরকার তো বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে কিছু জমি বন্টন করছেন, আমারও কিছু জমির খুবই দরকার, এ–ব্যাপারে আপনি যদি একটি দরখাস্ত লিখে দিতেন, বড্ড ভাল হত।

ইকবাল জবাব দিলেন ঃ

– দরখাস্ত লিখতে তো আমার কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু আপনি কি জানেন এই দরখাস্ত কার কাছে পেশ করতে হবে? পীর সাহেব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন।

– ডঃ ইকবালই উত্তর করলেন ঃ একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যার নাম– কোরআন যা কি–না আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর উপর নাযিল করেছেন, ঐ কিতাবেই লেখা আছে, জমির মালিকানা হচ্ছে আল্লাহর। সেই জন্যেই যদি আপনি সত্যি সত্যিই দরখাস্ত লেখাতে চান, তাহলে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লিখে দিতে পারি।

শয়তানের ক্রীতদাস

ডঃ ইকবালের দৃষ্টি শক্তি কমে গেলে নসরুল্লাহ খানই তাঁকে *'সোল এন্ড মিলিটারী গেজেট'* পত্রিকাটি প্রায়ই পড়ে শোনাতেন। ঐ নসরুল্লাহ খানের এক বন্ধু নাস্তিক হয়ে গেলে তাঁকে তিনি ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করাতে এনে বললেন ঃ

– আমার এই বন্ধুটি শয়তানের দলে ভিড়ে গেছে, শয়তানের ক্রীতদাস বনে গেছে। ডঃ সাহেব, আপনি যদি একে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিতেন?

ইকবাল হো হো করে হেসে উঠে বললেন ঃ

– হায়, আল্লাহই যাকে বোঝাননি, বুঝবার ক্ষমতা দেননি, বলো আমি তাকে কী করে বুঝাই!

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

জলন্ধরের এক বিখ্যাত গ্রাম *'দানেশমান্দান'*– এর সরদার ছিলেন খান রিয়াজ উদ্দীন খান। সাহিত্য–সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। আল্লামা ইকবাল এবং খান রিয়াজ উদ্দীন খান পরস্পর পরস্পরের নিকটতম মানুষ ছিলেন। দু'জনেই উন্নত জাতের কবুতর পুষতেন।

কবুতর পশু–পাখীর মধ্যে তার বাচ্চা লালন–পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর।

সেই রিয়াজ উদ্দীন খান সাহেব আল্লামা ইকবালকে মাঝে–মধ্যে জলন্ধর থেকে খুবই উন্নত জাতের কবুতর পাঠাতেন। কিন্তু এমন একজোড়া একবার পাঠালেন, যাদের মধ্যে বাচ্চা লালন–পালনের ঐ সহজাত গুণাবলী একেবারেই ছিল না। সুতরাং আল্লামা ইকবাল তাকে লিখে পাঠালেন ঃ

– আপনার পাঠানো কবুতর দুটো খুবই সুন্দর কিন্তু আফসুস, বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া তাদের গায়েও লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। না হলে, বাচ্চা লালন–পালনের ব্যাপারে ওরা এতটা উদাসীন হয়ে পড়লো কেন?

লাইলি মজনুর সম্বন্ধ

আল্লামা ইকবাল কখনো কখনো মরহুম চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন এবং নিজের খাদেম আলী বখশের সাথেও খুব রসিকতা করতেন। একবার ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন মরহুম মীম, শীন, সাইয়েদ নাজির নিয়াজী; মরহুম চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেবও সাথে। আলী বখ্শ ইকবালের গা টিপে দিচ্ছিল। মহাকবির মেজাজ ছিল খুবই প্রফুল্ল। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, আলী বখ্শ এবং চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেব ছুটিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এ–অবস্থাটা কবি কিছুক্ষণ চুপচাপ উপভোগ করে মুচকি হেসে বলে উঠলেন ঃ

– আ–হা–হা সম্বন্ধটা যেন সুহানী মাহনেওয়াল সম্বন্ধ [লাইলি–মজনু সম্বন্ধ]।

একটাই তো

আল্লামা ইকবাল একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেকিম সাহেব আম খেতে নিষেধ করলেন। কবি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন ঃ

– হায়! মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু আম না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই তো উত্তম।

এ–ব্যাপারে কবি ইকবালের অস্বস্তি সত্যি সত্যিই অধৈর্যে পরিণত হলে, বাধ্য হয়েই হেকিম সাহেব দিনে–রাতে মাত্র একটি আম খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মওলভী আবদুল মজিদ সালেক সাহেব লিখেছেন ঃ

– আমি একদিন আল্লামা ইকবালের অসুস্থতার খবরাখবর নিতে গিয়ে তাঁর বাসায় যাবার পর দেখি – ডঃ সাহেবের সামনে ইয়া বড় এক বোম্বাই আম, ওজনে এক সেরের কম তো হবেই না। কাটবার জন্যে ছুরি কেবল উঠিয়েছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

– আপনি আবারও আম খাওয়ার বদ–অভ্যাসটা শুরু করলেন?

ইকবাল জবাবে বলে উঠলেন ঃ

– হেকিম সাহেব তো সেই কবে থেকে একটি মাত্র আম খাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন, জানা নেই বুঝি? আর এই যেটা দেখা যাচ্ছে– এটাতো একটাই। একটাই তো।

এবার আমার পালা

ইকবালের বাসার নাম '*জাভেদমঞ্জিল*'। সবেমাত্র অন্যত্র পরিবর্তিত হয়েছে, এ সময়ে এক পীর আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন। দুপুর বেলা –প্রচন্ড গরম পড়েছে। ঘামে জাবজুব এক লোক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পীরের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। লোকটি ঐ পীরেরই অন্ধ ভক্ত মুরীদ, ইনিয়ে–বিনিয়ে বলতে শুরু করলো ঃ

–এখানে তাশরীফ রাখার সাথে–সাথেই আমি খবর পেয়ে গেছি, তাই সোবহে সাদেক হতে না হতেই '*হাগলপুরা*' থেকে রওয়ানা হয়েছি হুজুরের কদমবুছির এরাদায়। এক জায়গায় গেলাম তো শুনলাম আপনি আর এক জায়গায়, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আপনাকে এখানে পেয়ে গেছি– আল্লার লাখ লাখ– কোটি শুকরিয়া।

হুজুর! বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ পড়েছে। না খেয়ে খেয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। ঋণের পাহাড় সমান বোঝা আমার মাথায় হুজুর। হুজুর, চাকরি–নকরি নেই হুজুর। হুজুর, হুজুর আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্যে একটু দোয়া করুন গো– যেন আল্লাহ আমাকে সমস্ত বালা–মুসিবত থেকে মুক্তি দান করেন।

ঐ রকম অনুনয়–বিনয় করতে করতে লোকটি পীর সাহেবের পায়ের উপর দু'টি টাকা নজরানা পেশ করলো। পীর সাহেব তা পকেটে ভরেই মোনাজাতের জন্য হাত উঠালেন, ইকবালকেও হাত উঠাতে বললেন। এই বলেঃ

আসুন, আমরা পরওয়ারদেগারের দরবারে হাত উঠাই।

আল্লামা জবাবে বললেনঃ

– আপনিই দোয়া করুন প্রথমে তারপরে করবো আমি।

পীর সাহেব চোখ দু'টি বন্ধ করে ঠোঁট বিড় বিড় করতে লাগলেন। তারপর মুখ–দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মুরীদের সারা শরীরে ফু দিতে লাগলেন। খুশীর চোটে মুরীদের অবস্থা ফেটে পড়ার মত। ঈমানের তরক্কী হচ্ছিল তার – দু'দন্ড পরেই সমস্ত অভাব–অনটন তার ফু হয়ে যাবে মনে মনে ভাবছিল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইকবাল পীর সাহেবের উদ্দেশে বললেনঃ

–তাহলে এবার আমার মোনাজাতের পালা।

ইকবাল দোয়ার জন্যে হাত উঠালেন এবং বড় বড় করে বলতে লাগলেনঃ

– হে খোদা ! এ যুগের পীরেরা বে–ঈমান হয়ে গেছে, তাদেরকে হেদায়েত দাও।

পীর সাহেব চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ

–এ আপনি কি বলছেন? বরং তাদেরকে সতর্ক হবার জন্য দোয়া করুন।

ডঃ ইকবাল বললেনঃ

–দেখুন পীর সাহেব! আপনার দোয়ার সময় বাধা দেইনি, আমাকে প্রশান্ত চিত্তে দোয়া করতে দিন, দয়া করে।

পীর সাহেব অগত্যা চুপ করলেন। আল্লামা আবার দোয়া শুরু করলেনঃ

–হে খোদা! এ –যুগের মুরীদদেরকেও আপনি হেদায়েত দান করুন, যেন তারা তাদের পীরদের অবাধ্য হতে পারে।

পীর সাহেব আবারও অনুযোগ করলেন, কিন্তু ইকবাল মোনাজাত করেই চললেনঃ

–এ মূর্খ মুরীদ বলছে, সে দুই শো দুই টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে।

পীর সাহেব ছটফট করে উঠলেনঃ

–আপনার এ ধরনের মোনাজাত করা সত্যিই উচিত হচ্ছে না। আপনি আমাকে অপমানিত করছেন।

ডঃ ইকবাল বলে উঠলেনঃ

–আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার মোনাজাত শেষ করছি, তবে শর্ত হচ্ছে– আপনার মুরীদের কাছ থেকে নজরানা হিসেবে পাওয়া ঐ টাকা এখনই ফেরৎ দিতে হবে, ঋণ শোধ করার জন্যে মুরীদটিকে আপনারই সাহায্য করতে হবে, একটি চাকরিরও ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পীর সাহেব অসন্তুষ্টির সাথে ঐ দুই টাকা তখনই ফেরৎ দিলেন এবং অন্যান্য শর্তগুলোও পূরণ করার ওয়াদা করলেন।

২.

১৯৪১ সালে মুনশী মুহাম্মদ উদ্দীন ফাওক "শিক্ষক–ছাত্রের হাস্য–কৌতুক" শিরোনামে একটি চিত্তাকর্ষক সংকলনের সম্পাদনা করেন। আল্লামা ইকবালও ছিলেন কলেজের প্রফেসর। তাই, সে বইয়ে তাঁরও ক'টি হাস্য–কৌতুক সন্নিবেশিত হয়েছিলো। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১· একবার একজন মাদ্রাজী ছাত্র এসেছিলো আল্লামা ইকবালের সাক্ষাতে। বসন্তকালীন ছুটি কাটানোর জন্যে কাশ্মীর যাবার পথে লাহোরে সে তার এক মাদ্রাজী বন্ধুর বাসায় ওঠেছিলো। ইকবাল জিজ্ঞেস করেন ঃ

আল্লামা ইকবাল

'তোমার পরিচয়' ?

মাদ্রাজী ছাত্রটি জবাব দিলো–

چتین نارائینم وینکتاپیاسنگرایلوراجکو پالم چیتي آئینگر

ডঃ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার থেকে রামায়ণের কোন প্যারা তো শুনতে চাইনি? তোমার নাম জানতে চেয়েছি মাত্র'।

২· একবার হিন্দুস্তানের অধিবাসী কয়েকজন মুসলমান ছাত্র, যাদের দাড়ি– মোছ ক্লিন শেভ করা ছিলো। ডঃ সাহেবের সাক্ষাতে এসে তারা পর্দার ক্ষতিকর দিকগুলো এবং পর্দাহীনতার উপকারিতা বলেই যাচ্ছিলো। প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ তারা বাদানুবাদ করে। ডঃ সাহেব ধৈর্যের সাথে শুনছিলেন কোন জবাব না দিয়েই। অবশেষে তারা বললো, আমরা তো পর্দা প্রথা এবং পর্দাহীনতার ব্যাপারে আপনার মতামতই জানতে এসেছি। এতক্ষণ আপনি আমাদের মতামত শুনলেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? ডঃ সাহেব বললেনঃ আমার সংক্ষিপ্ত জবাব হলো আমার শক্তি–সুযোগ হলে আমি তোমাদের সবাইকেই পর্দার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো।

৩· ইকবালের ছাত্র জীবনের একটি কাহিনী শোনা যায়। একবার তিনি দেরীতে স্কুলে আসলেন, শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'ইকবাল! তুমি দেরীতে এসেছো কিন্তু।'

ইকবাল সবিনয়ে উত্তরে বললেন ঃ

''হজরত! 'ইকবাল' – সৌভাগ্য দেরীতেই আসে।"

৪· ইকবালের প্রাথমিক স্কুল সহপাঠীদের একজনের নাম ছিলো (جھنڈے خان) ঝান্ডে খাঁ। কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হয়ে তার নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ করছিলো। কেউ এ নাম, কেউ ওনাম বলতে লাগলো। ইকবালের কাছে নাম প্রস্তাব করার কথা বললে তিনি বলেছিলেন, তার দেহের উচ্চতা এবং শরীরের গঠনের বিবেচনা করলে তো এনামই উপযুক্ত। এটাকেই একটু পরিবর্তন করে (علمدار خان) আলমদার খাঁ, রেখে দাও। এ নামটি সবাই পছন্দ করেছিলো। শিক্ষক শুনে ইকবালের বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য, (جھنڈے خان) সেই (جھنڈے خان) নামেই প্রসিদ্ধ ছিলো।

৫· ডঃ ইকবাল ইংলন্ডে ব্যারিস্টারী পড়ার সময়কার একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলেছিলেন। বলেছিলেন ঃ লন্ডনে এক পাঞ্জাবী মুসলমান আচার, মোরব্বা ও চাটনি বিক্রি করতো। আমি তার একজন স্থায়ী গ্রাহক ছিলাম। একবার সে আমার নাম এবং বাসস্থানের কথা জিজ্ঞেস করে। আমি ইকবাল এবং সিয়াল কোট বলে উত্তর দিলাম। 'ইকবাল'– সৌভাগ্য শুনতেই সে বললো ঃ ইকবাল –সৌভাগ্য, অথচ দেশের বাইরে ওহ! (یوسف کوچه وبازار میں)

অর্থাৎ ইউসুফ, অথচ বাজারের গলিতে। আমি বললাম ঃ মুক্তার সম্মান তো সমুদ্র থেকে বেরিয়েই বেড়েছে। চাটনি বিক্রেতা বললো ঃ আপনি কোন গোত্রের? ইকবাল মুচকি হেসে জবাব দিলেন ঃ মুসলমান গোত্র থেকে। চাটনি বিক্রেতা বললো ঃ এটা তো আমি জানি। আমার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হলো ঃ আপনি কোন্ সম্প্রদায়, কোন্ গোত্র বা বর্ণের তা–ই জানা। ইকবাল বললেন ঃ ইকবালের সম্পর্ক তো কোন সম্প্রদায়, কোন বর্ণের সাথে হতে পারে না।

৬· ইকবাল লাহোরস্থ গভর্নমেন্ট কলেজে এম· এ· ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সে সময়েই লাহোরে (انجمن کشمیری مسمانان) 'কাশ্মীরী মুসলিম সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইকবালও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এক সভায় তিনি কয়েকটি রোবায়িয়াত চতুষ্পদী কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন, তার মধ্যে একটি রোবায়ী পংক্তি অনুরূপ ঃ

مل کے دنیا میں رہو مثل حروفِ کشمیر

দুনিয়াতে বসবাস কর তোমরা

'কাশ্মীর' অক্ষরগুলোর ন্যায়

একবার আঞ্জুমানের সভাপতির কাছে শিয়ালকোটের (چونڈہ) চুভাহ জেলা থেকে এক ভদ্রলোক এই অভিযোগ লিখে পাঠান–তহশিলদার একটি সিদ্ধান্তে কাশ্মীরীদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, তারা ভয়ঙ্কর ঝগড়াটে এবং বাহাদুর হয়ে থাকে। 'ফাসাদী' – ঝগড়াটে শব্দটি ফেলে দেয়ার জন্যে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আঞ্জুমানের আপীল করা উচিত। ইকবাল সে সময় শুধুমাত্র 'মুহাম্মদ ইকবাল' ছিলেন, তথাপিও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেছিলেনঃ আমি এ সিদ্ধান্তের বিচার প্রত্যাশী নই। তার প্রমাণ বলছি, যে সম্প্রদায় ঝগড়া করতে জানে না, তারা বাহাদুরও হতে পারে না। ঝগড়ার অর্থই হলো বাহাদুরীর সাপোর্ট। আপনারা বাহাদুর–বীর পুরুষ কেউ বলুক–যদি তা না চান তো নির্বিঘ্নে আপীল করুন। সবাই তাঁর মতামত পছন্দ করে আপীল দায়ের করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সে–সময় ইকবালের বয়স সম্ভবত ২১ কি ২২ বছরের বেশি ছিলো না।

৭· ইকবাল দ্বিতীয় কি তৃতীয় ক্লাসের ছাত্র। শিক্ষক তক্তার ওপর কিছু লেখার জন্যে দেন। তার মধ্যে একটি শব্দ (غلط) "গলত্' অর্থাৎ 'অশুদ্ধ'ও ছিলো। তিনি (غلط) গলত্ শব্দটি (غلت) গলত (তোয়দিয়ে না লিখে .তা. দিয়ে) লেখে ফেলেন। শিক্ষক ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন তুমি এ শব্দ (غلط) গলত অশুদ্ধ লিখেছো। ইকবাল জবাব দেন (غلط) অশুদ্ধ–কে (صحیح) শুদ্ধ কিভাবে লিখে দেই। এটাকে তো (غلط ہی) অশুদ্ধই লেখা যাবে। এটা বাল্যাবস্থার সরলতাই ধরে নেবেন, না সম্ভাবনাময় বালকের ঔদ্ধত্ব?

[উর্দু ডাইজেস্ট ও তাজকারে ইকবাল অবলম্বনে]।

আল্লামা ইকবালের বন্ধু-বান্ধব

ছালেহ আহমাদ

আল্লামা ইকবাল জীবনে সমাদৃত হয়েছেন সর্বতোভাবে। তাঁর ছিলো অগণিত বন্ধু-বান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর বাসায় প্রায় সব সময় লোক সমাগম থাকতো লেগেই। মাহফিল হতো, শিক্ষার আসর বসতো। জাতীয়, রাজনৈতিক এবং অন্যবিধ জীবনোপায়ের বিষয়াবলীর ওপর কথানুষ্ঠান লেগেই থাকতো। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্ঞানী, ধ্যানী, বিদ্বজ্জন ছাড়াও অনেক রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের সাথে আল্লামা ইকবালের চিঠিপত্রের ছিলো আদান-প্রদান। তাঁদের মধ্যে এমনো মনীষী আছেন যাঁদের প্রতি স্বয়ং আল্লামা ছিলেন স্পর্শকাতর। কখনো কখনো তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাও হতো।

পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্না'র সাথে আল্লামা ইকবালের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে দীর্ঘদিন যাবত। লেখনীর মাধ্যমে তিনি বেশীর ভাগই রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যার বিশ্লেষণ করতেন। আফগানিস্তানের শাসক নাদের শাহ শহীদের সাথে লাহোরের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দু'জনই একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরে নাদের শাহ আফগানিস্তানে গিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের পর আল্লামার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে তাঁকে আফগান সফরের দাওয়াত দেন।

ইটালীর ডিক্টেটর এবং প্রথম মহাযুদ্ধের হোতা মুসোলিনীর সাথে আল্লামা ইকবালের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়েছিলো। ইকবাল তখন ইটালী সফরে ছিলেন, থাকতেন রোমে। মুসোলিনী জানতে পেরে তার লোক মারফত আল্লামা ইকবালের কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালেন যে, আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। আল্লামা দাওয়াত গ্রহণ করে নিজেই মুসোলিনীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

তাঁরা অনেক্ষণ যাবত কথাবার্তা বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লামা ইকবাল মুসোলিনীকে *"বাইবেলবিহীনলুথার"* বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আল্লামা ইকবালের ছিদ্রান্বেষণকারী যে একেবারেই ছিলো না তাও নয়। সারশাদী লাল ছিলেন পাঞ্জাব হাই কোর্টের চীফ জাস্টিজ। প্রশাসন আল্লামা ইকবালকে হাই কোর্টের জজ নিয়োগদানের ব্যাপারে সারশাদী লালের মতামত চাইলে তিনি এভাবে বিরোধিতা করেছিলেনঃ

"We know him as a poet, But we do not know him as a Lawyer",

এখানে আমরা সে–সব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো, যাঁদের কোন না কোনভাবে আল্লামা ইকবালের নিকটতম হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। এর মধ্যে এমনো ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ আছে, যাঁরা আল্লামা ইকবালের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁর কথানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর কথাবার্তা দ্বারা হয়েছেন উপকৃত। এসব বন্ধু–বান্ধবের মধ্যে সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে সাংবাদিক পর্যন্ত শামিল ছিলেন।

মীকলগুন میکلگن

তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর। ইনিই বৃটিশ প্রশাসনকে আল্লামা ইকবালের সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিতে তাঁকে *'নাইট হুড'* উপাধিতে ভূষিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে আল্লামা ইকবালের পরামর্শে মীকলগুন মৌলবী মীর হাসানকে শামসুল ওলামা খেতাবের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লামা ইকবালের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক।

ম্যালকম হেলী میلکم ہیلی

ইনিও ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর। আল্লামা ইকবালের সাথে সালাম–কালাম ছিলো। চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর ম্যালকম হেলী আল্লামা ইকবালকে চা–চক্রে আমন্ত্রণ জানান। সে চা–চক্রে শহরের অনেক গণ্য–মান্য ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল ডঃ আলী নকীকে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। কবিতাটি ডঃ আলী নকী চমৎকারভাবে লেখে সে অনুষ্ঠানে গভর্নরকে উপহার দেন। কবিতাটি ছিলো–

پنجاب کی کشتی کو دیا اس نے سہارا
تابندہ ہمیشہ رہے ہیلی کا ستارا

পাঞ্জাবের কিশতিকে তিনি করেছেন সাহায্য

সর্বদা উজ্জ্বল থাকুক হেলীর নক্ষত্র।

স্যার ম্যালকম ডার্লিং سر مالکم دارلنگ

ইনি ছিলেন বৃটেনের অধিবাসী। পাঞ্জাবে তিনি ফিনানসিয়াল কমিশনার ছিলেন। আল্লামা ইকবালের দোস্ত এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। গ্রামের মানুষের সাথে মিশে থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। অফিসে তিনি সাধারণ্যে সাহায্য–সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ছিলেন অকৃপণ। "পাঞ্জাবের কৃষক" তাঁর প্রসিদ্ধ বই। হযরত আল্লামার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো গভীর।

ইকবালের বন্ধু-বান্ধব

ডক্টর লুকস داکٹر لوکس ۔

লাহোরের ফারমান কৃস্চেন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। একবার কলেজের বার্ষিক সভায় ডঃ লুকস আল্লামা ইকবালকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আল্লামা ইকবাল বলেন, সভা শেষে চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমরা চা পান করছিলাম। এ সময়েই ডঃ লুক্স আমাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই। অতএব, আমরা দু'জনই এক পাশে বসে গেলাম।

ডঃ লুক্স বলতে লাগলেন ইকবাল! বলুন, আপনাদের নবীর ওপর কুরআনে কারীমের মাফহুম-(বোধগম্য, জ্ঞাত, বস্তু) অবতীর্ণ হয়েছিলো? তিনি তো স্রেফ আরবী ভাষাই জানতেন। তাই, তিনি কুরআনে কারীমকে আরবী ভাষায় রূপদান করেছেন-না, এ ইবারতই এভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলো? আমি বললামঃ *"এই ইবারতই অবতীর্ণ হয়েছিলো।"* ডঃ লুক্স চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন; *"আপনার ন্যায় লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও কি এ বিশ্বাস করেন যে, এ ইবারতইঅবতীর্ণহয়েছিলো?"*

আমি বললাম, ডঃ লুক্স, বিশ্বাস! আমার তো এই অভিজ্ঞতাই আছে, 'যখন আমার মধ্যে কবিতাই পুরোপুরিভাবে অবস্থান করে (অবতীর্ণ হয়), তো রাসূল (সঃ)-এর ওপর ইবারাত কেন হুবহু অবতীর্ণ হয়নি?"

ইকবালের ডায়েরী থেকে

মোজ্জাম্মেলুল হক

আল্লামা ইকবাল ১৯১০ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে এ লেখা শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৪৬ বছর। তিনি থাকতেন আনারকলী বাজারে। কয়েক মাস লিখে আর কেন জানি লেখেননি। তিনি এ লেখার শিরোনামে লিখেছিলেন "Stray Reffections"। এগুলো তাঁর জীবনের বিক্ষিপ্ত লেখার পর্যায়ভুক্ত। এটা বই–পত্র পড়ার পর তাঁর মনোভাব অথবা সমসাময়িক প্রেক্ষিত বিবেচনায় তাঁর চিন্তা–চেতনার অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এসব লেখার সমন্বয়ে লাহোরস্থ 'মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব' "শাজারাতে ফিকরে ইকবাল" শিরোনামে বই আকারে বের করে। এটি সম্পাদনা করেন ইকবাল তনয় জাস্টিজ ডঃ জাভিদ ইকবাল। ১৭২ পৃষ্ঠার এ বইতে ভূমিকা ও পরিচিতি ছাড়া ইকবালের ডায়েরীর ১২৫টি ছোট–বড় অংশ স্থান পেয়েছে। আমরা শুধু ইকবালের লেখাগুলোই বিদগ্ধজনের সামনে উপস্থাপন করে যাবো ক্রমে ক্রমে।

১. ফন (আর্ট)

ফন–আর্ট, বা শিল্প একটি কৃত্রিম সত্য।

২. ইকতিশাফ–খুলে যাওয়া

কোন বড় প্রতিভাবানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের অন্তরাত্মা এমনিতেই উন্মিলিত হয়। গ্যাটের কল্পনা জগতের প্রান্তসীমার সাথে পরিচিত হবার পর আমার সম্পর্কে আমার ধারণা উন্মিলিত হয়ে যায়।

৩. মানব জ্ঞান

মানব জ্ঞান, সৃষ্টি–কৌশলের দিক থেকে স্বয়ং (انتقادی) এর একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

৪. অনুদানের জীবিকার্জন

উদার মানুষ মূলত অনুদারকেই সাহায্য করে, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তকে নয়।

কারণ, অভাবগ্রস্তকে যা–ই দেয়া হয় মূলত তা সে–সব মানুষকেই দেয়া হয় যারা দরিদ্রজনদের দান করে না। এমনিভাবে অনুদার মানুষ দয়া দাক্ষিণ্য থেকে মুক্ত থাকে। আর উদার মানুষ তার পাওনা চুকিয়ে দেয়। এটাই হলো দানের জীবিকার্জন।

৫. আল্লাহর অস্তিত্ব

বন্ধু–বান্ধব অহরহই আমার কাছে জানতে চায়ঃ 'তুমি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী'? আমার মনে হয় জবাব দেবার আগে, আমি এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রশ্নে যে শব্দ ক'টি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নেই। যদি বন্ধু–বান্ধব তাদের প্রশ্নের উত্তর চায় তা হলে তাদেরকে প্রথমে এটা বুঝিয়ে দেয়া চাই যে, 'খোদা'–আল্লাহ 'অজূদ',–অস্তিত্ব এবং 'ঈমান'–বিশ্বাস (বিশেষত প্রথম দু'টি শব্দ) দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কি?

আছে যে, এ শব্দগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নই। আর যখন আমি তাদের কথার খন্ডন করি তখন দেখি আমার ন্যায় তারাও বোঝে না।

৬. একটি কথিকা

অন্তর ঃ 'একথা তো সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে।'

জ্ঞান ঃ 'কিন্তু বন্ধু আমার। 'অজুদ' অস্তিত্ব তো আমার প্রবাদে আছে, তোমাদের তো এটা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই।'

অন্তরঃ 'এটা তো আরো ভালো, ওগো আমার এরিষ্টটল' (শিক্ষক)।

উল্লেখ্য, এরিষ্টটলের উপাধি ''প্রধান শিক্ষক''। সেই বিবেচনায় 'আমার এরিষ্টটল' অর্থাৎ ''আমার শিক্ষক'' ব্যবহৃত হয়েছে–অনুবাদক।

৭. কল্পনার শান্তি

কল্পনার সান্ত্বনা আমাদের জন্যে আমাদের জীবন চলার একটি দিক বৈ কি। আপনি আমাকে হাসপাতাল এসিস্ট্যান্ট–এর স্থলে সাব–এসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট বললে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যাবো। যদি আপনি আমার মাস–মাহিনা বর্ধিত নাও করেন।

৮. তিক্ত মনস্তত্ত্ব

একটি তিক্ত মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যর্থ হয়েছেন, আর এ মুহূর্তে আপনি আপনার বাসা থেকে দূরে অন্যের বাড়ীতে বসে ভাগ্য পরীক্ষার প্রত্যাশী। তার অর্থ এই নয় যে, ব্যর্থতা আপনার সংকল্পে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করে দিয়েছে; বরং, প্রকৃত কারণ এই যে, আপনি সে–সব মানুষ থেকে দূরে থাকতে চান যারা আপনার ব্যর্থতার জাজ্বল্য স্বাক্ষী।

৯. বিশ্বাসের শক্তি

বিশ্বাস এক বিরাট শক্তি। আমি যখন দেখতে পাই আমার কোন থিওরীতে কারো বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে, তখন সে থিওরীর সত্যাসত্যের ওপর আমার নিজের বিশ্বাস সীমাহীন বেড়ে যায়।

১০. ইসলামে আল্লাহ–ভাবনা

খ্রীষ্ট ধর্মে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাশীলতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আর ইসলামে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এ দু'টি চিন্তাভাবনার মধ্যে আমরা কিভাবে সাযুজ্য বিধান করবো? আমার মতে, বিশ্ব চরাচর এবং মানব জাতির ইতিহাসই আমাদের বলে দেয় যে, এর মধ্যেকার কোন ভাবনা বিশুদ্ধতর। ইতিহাসে তো আমি অহরহ করুণা এবং ক্ষমার চাইতে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করছি তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। আমি বলতে চাচ্ছি যে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহকে একচ্ছত্র ক্ষমতাবান বলাই সবচেয়ে সমীচীন।

ইকবাল ও সূফীবাদ

ডঃ মুহাম্মাদ বাকের

ফারুক আহমাদ খান অনূদিত

সাধারণ কোন মানুষের চলন–বলন, ঘোরাফেরা এবং চিন্তাচেতনার পরিধি নির্ধারণ করাই সহজ নয়; আর লব্ধপ্রতিষ্ঠজনের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অনুভবের তো প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে সে ক্ষেত্রে যখন তাঁর চিন্তার পরিসর হয় পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর সম্পর্ক ও জীবনের পরিধি বিভিন্ন দেশ, ব্যক্তিত্ব অধিকন্তু আন্দোলনের সাথে হয় সংশ্লিষ্ট। বিংশ শতাব্দীতে আল্লামা ইকবালের অর্ধশত বছরাধিক *(১৮৯৩–১৯৩৮)* বয়স এমন কতগুলো পরিস্থিতিতে অতিবাহিত হয়েছে; যার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ আজকের এ প্রবন্ধে করা উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ পঁয়তাল্লিশ বছরে ইকবাল শুধু অনুসন্ধিৎসুভাবেই বেড়ে ওঠেননি; বরং এ শতাব্দীর অন্যতম বিচক্ষণ চিন্তাবিদ হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। দুঃখের বিষয় হলো, ইকবালের কালজয়ী আবেদনের ওপর এই নিরিখে চর্চা হয়নি যে, তিনি ধরণীর মানুষের সৌভাগ্যের কতই না আকাঙক্ষী ছিলেন। আর তাঁর চিন্তার পরিধি তিনি কোন নিরিখে এবং অবিরত গবেষণার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সততার দ্বারা নির্বাচিত করেছেন। এ পরম্পরায় তাঁর সম্পর্কে কতকগুলো দিকের উপস্থাপনা করা হচ্ছে, যার ছিলো না কোন অস্তিত্ব, আর না ছিলো সাক্ষ্য–প্রমাণ। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ইকবাল সূফী–সাধকদের প্রথম কাতারে ভক্ত ছিলেন এবং চিন্তা–চেতনায় তিনি হোসাইন মনছুর হাল্লাজ দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত ছিলেন।[১]

এও বলা হয়ে থাকে যে, ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি সূফীবাদ এবং হোসাইনের ভক্ত–অনুরক্ত ছিলেন। অবশ্য, পরে তাঁর চিন্তায় পরিবর্তন আসে।

"....... they (the undercurrents in his thought) prove also how deeply embedded the roots of his feeling and thinking were - consciously or unconciously - in the great mystical tradition of his country." (Schimmel. 341.)

এও বলা হয়েছে যে, ইকবাল সূফীদের কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেনঃ

"Abdul Qadir Gilani, the great Iraqian mystic (d.1166) and founder of the Qadiriya order to which Iqbal was affiliated, explains the ana'l haqq in the following way." (Schimmel, 347 & 372).

আল্লামা ইকবালের আকীদা–বিশ্বাস কি ছিলো, এ ব্যাপারে নির্ভরশীল এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা শুনুন। তিনি তাঁর অছিয়তের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছিলেনঃ "আকীদা–বিশ্বাসের দিক থেকে আমি পূর্বপুরুষদের পদাংক অনুসারী। তত্ত্বের দিক থেকে ফিকহী লেন–দেনের বেলায় আমি মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী নই। আমলের দিক থেকে আমি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর অনুসারী।"[২]

আল্লামা ইকবালের ১৯১০ সালের লেখা একটি চিঠির ওপর নির্ভর করে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিলেন। এ চিঠিটি তিনি সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী (রঃ)–কে লিখেছিলেন। তিনি লেখেনঃ "খাজা নকশবন্দ এবং মুজাদ্দিদে সরহিন্দ–এর জন্যে আমার মনের মণিকোঠায় রয়েছে অতি উঁচুমানের সম্মান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ এ সিলসিলাও আজমিয়াত বা অনারব রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। অবশ্য কাদেরিয়া সিলসিলার বর্তমান অবস্থান এই যে, আমি স্বয়ং এ সিলসিলার বাইয়াত করতে আগ্রহী।"[৩]

সে চিঠিতে অবশ্য তিনি এও লিখেছিলেনঃ "এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সূফীবাদের অস্তিত্বই ইসলামী দুনিয়ায় একটি নতুন চারাস্বরূপ।"[৪]

বাকী থাকলো একথাটি তিনি বুজুর্গানে দ্বীন, আইম্মায়ে কেরাম এবং মাশায়েখদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন – এ প্রেক্ষিতে এ–ই বলতে হবে যে, এটা কোন অসম্ভব বা অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার নয়। এমন সব ব্যক্তিত্ব যাঁদের ইসলামের প্রতি আছে গভীর হৃদ্যতা ইকবাল সে–সব দ্বীনি খাদেমের ওপর যে অনুরক্ত ছিলেন তা লুকোবার কোন বিষয়ই নয়। তাঁরা তো এমনই দ্বীনের খাদেম যাঁরা ইসলামের সঠিক খেদমত আনজাম দিয়েছেন, আর আল্লামাও তো অনুরূপ সচেতন বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যেকারই একজন ছিলেন। এ জন্যেই তিনি 'আখলাকে মাজহাব'–এর ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে প্রফেসর নিকলসনকে লিখেছিলেন ঃ ''আমার মতে, মানুষের চারিত্রিক এবং ধর্মীয় সর্বশেষ ও চরম উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দেবে। অথবা, তার খুদীকে মিটিয়ে দেবে; বরং প্রকৃত সত্য হলো সে তার স্বীয় ব্যক্তিত্বকে অটল রাখবে, আর তা বাস্তবে রূপ দেয়ার পথ হলো ঃ নিজের মধ্যে বেশী বেশী স্বকীয়তা সৃষ্টি করবে। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

تخلقوا باخلاق الله

অর্থাৎ, তোমরা নিজের মধ্যে আল্লাহর গুণ সৃষ্টি করো।

অতএব, মানুষ যেভাবে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবে, অনুরূপ তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য এবং স্বকীয়তার রূপই সৃষ্টি হতে থাকবে।[৫]

এ কারণেই খাজা হাসান নিজামীকে উদ্দেশ্য করে আল্লামা ইকবাল বলেছিলেনঃ ''যে–সব ব্যক্তিত্বের আকীদা–বিশ্বাস এবং আমলের মূল উৎস কিতাব ও সুন্নাহ, ইকবাল তাঁদের পদপৃষ্ঠে টুপি কেন, মাথা রাখতেও প্রস্তুত। আর তাঁদের সাহচর্যের একটি মুহূর্তকে দুনিয়ার সমুদয় উচ্চ সম্মানের ওপর প্রাধান্য দেয়।''[৬]

এটা এমনই এক বর্ণনা, যার ওপর সামনে এগিয়ে আলোচনা হবে যে, ইকবালের চিন্তার উৎস কি কুরআন–সুন্নাহ ছিলো; না তাছাউফ। যেমন– অনেক সমালোচক (বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা) অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, ইকবাল তাছাউফ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। এমনকি, তারা নাম ধরেই বাজে বকেছেন যে, ইকবাল হোসাইন মনছুর হাল্লাজ দ্বারা সীমাহীন প্রভাবিত ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে তাছাউফশাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে এখানে যৎসামান্য আলোচনা করা অত্যাবশ্যক এ জন্যে, তা হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তাছাউফ এবং সুফী–সাধকদের আকীদা–বিশ্বাস ও বাস্তব আমল কি ছিলো –যার থেকে বেরিয়ে এসে ইকবাল নিজেকে শুধুমাত্র সে–সব ব্যক্তিত্বের পদাংক অনুসারী হওয়ার প্রাধান্য দিয়েছেন –যাঁদের বিশ্বাস ও আমলের উৎস–মূলই ছিলো কিতাব ও সুন্নাহ।

এটা সততই সত্য, কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ এবং হাদীসের নিরিখে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়েছে যে, কুরআনের মধ্যে এমনও আয়াত আছে যার ব্যাখ্যা তাছাউফ সংক্রান্ত করা যায় বৈ কি। অবশ্য, এটাও নিশ্চিত সত্য যে, কুরআন বা হাদীস শরীফের কোথাও তাছাউফের বর্ণনা সরাসরি পাওয়া যায় না। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত তাছাউফের অস্তিত্ব প্রমাণে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়ে থাকেঃ[৭] –

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيئ عليم (٥٢:٣)

অর্থাৎ, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ এবং তিনিই জাহির, তিনিই বাতিন, আর তিনিই সব জিনিস সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। [৫৭ঃ৩]

এটা আমার বোধগম্যের সম্পূর্ণ বাইরে যে, উল্লিখিত আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালার যেসব গুণের ঘোষণা রয়েছে সেগুলোকে কোন্ যুক্তি–তর্কের দ্বারা তাছাউফের প্রসঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে নেয়া হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা হলো, তাছাউফকে কুরআনের মধ্য থেকে বের করার ক্ষেত্রে অমুসলিম তথা হিন্দুদের প্রচারণাকে সাক্ষ্য হিসেবে অনেক মুসলমানই সনদস্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন –প্রফেসর ইউসুফ

সলীম চিশতী লেখেনঃ ডঃ ডুনাল্ডসন (ڈونالڈسن) তাঁর *'মুসলমানূঁ কা ফালসাফায়ে আখলাক'*– মুসলমানদের আচরণ–দর্শন শীর্ষক গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ ইবনে খালদুনের ভাষ্যানুযারী সূফী–সাধকরা যে পথ অবলম্বন করেছেন, এ পথ ও পন্থা ইসলামের সূচনাকালেও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। প্রফেসর গায়ুম (گیوم) তাঁর *'ইসলাম'* শীর্ষক কিতাবের ১৪৩–১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ "কুরআনের শিক্ষার ভেতরে দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাছাউফের রঙও পাওয়া যায়।"

প্রফেসর গেব (گب) তাঁর গ্রন্থ *'মোহামেডানিজম'*–এর ১২৮ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ "প্রফেসর মীসী নিউন (میسی نیون) ইসলামী তাছাউফের সযত্ন অধ্যয়নের পর এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে তাছাউফের আন্দোলন সেই ধর্মভীরুতারই ফলস্বরূপ যা কুরআন থেকে উৎসারিত এবং হাদীসে নববীর দ্বারা তার সাহায্য মেলে।" ডঃ তারা চান্দ (تاراچند) তার রচিত 'হিন্দী ছাকাফাত পর ইসলাম কা আছর'–হিন্দী সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব শীর্ষক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ "তাছাউফের মূল উৎস কুরআন এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন"। প্রফেসর হিট্টি তাঁর রচিত *'তারীখেআকওয়ামেআরব'*––আরব জাতির ইতিহাস নামক বইয়ের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ 'তাছাউফের উৎসমূলই হলো কুরআন ও হাদীস।' প্রফেসর ব্রাউন তাঁর রচিত *'ইরান কী আদবী তারীখ'*– ইরানের সাহিত্যের ইতিহাস শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ "আহাদীস বাদ দিলেও স্বয়ং কুরআনে এমনও কিছু আয়াত বর্তমান রয়েছে যার ব্যাখ্যা সূফীয়ানাভাবে করা সম্ভব।" [তারীখে তাছাউফ ২৫–১২২]

ডঃ বেন্ট (بنٹ) তাঁর সম্পাদিত এবং ১৮৯৩ সালে লন্ডনে প্রকাশিত বইয়ের ২০৮ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ প্রফেসর মামের (پروفیسرمامر) লিখেছেনঃ 'তাছাউফ মূলত ইসলামের বাতেনী বা অদৃশ্য শিক্ষার নাম। তিনি বলেন, এর সূত্র কুরআন থেকেই চয়ন করা যেতে পারে।" কিন্তু, এসব বর্ণনা প্রকৃত সত্য থেকে কত দূর আপনারা তা অনুভব করতে পারবেন এই ঘটনার দ্বারা যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই *'তাছাউফ'* শব্দটির উৎপত্তিই ঘটেনি।

আল–জাহেজই [মৃত্যুঃ ২৫৬/৮৬৯] সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই খেতাবকে প্রথম ব্যবহার করেছেন। *[তারীখুল ফালাসাফাতুল আরাবীয়াহ্–খলীলুল জারু ওয়া হানাল ফাখরী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৯৩]* আর প্রথম ব্যক্তি যার জন্য এই কুনিয়াত বা উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে তিনি হলেন আবু হাশেম কুফী। তিনি হিজরী ১৬২ সনে ইন্তেকাল করেন। (پیرہرات) হিরাতের পীর শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনছারী হারবী বলেন ঃ 'সূফী আবু হাশেম সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যাঁকে সূফী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি সিরিয়া দেশের শায়েখ ছিলেন। মূলত তিনি কুফী ছিলেন বলা হয়। আর এই কুনিয়াত (ডাক নাম) দ্বারাই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি সুফিয়ান ছাওরীর সময়ে জীবিত ছিলেন। সুফিয়ান ছাওরীর ছাত্ররা বলেন, যতদিন আমরা আবু হাশেমকে দেখিনি এর পূর্বে আমাদের জানাই ছিলো না যে, সূফী কি হতে পারে? সুফীয়ান বছরায় ১৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আর তাঁর (আবু হাশেম) পূর্বেও তো বুজুর্গরা ছিলেন যাঁরা ধর্মভীরুতা এবং নেক কাজ–কর্মে তাওয়াক্কুল এবং মুহাব্বাতের পথ–পন্থায়ই ছিলেন। কিন্তু সূফী নাম সর্বপ্রথম তাঁকেই দেয়া হয়েছিল" *[তবাকাতুছ ছুফীয়াহ–খাজা আবদুল্লাহ আনছারী পৃঃ৭]*

এটা হলো সূফী শব্দ এবং এর আবিষ্কারকের ইতিহাস। এর উপরে বিদ্বজ্জনের মতৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এ শব্দের অস্তিত্বও বিদ্যমান ছিলো না। কুরআন–সুন্নাহ থেকে এর উদ্ভাবন তো দূরের কথা।

ইকবাল ইসলামের মধ্যে আমলিয়াত [Rationalism] -এর অনুপ্রবেশের উপর আলোচনা করে লেখেনঃ

"We are all familiar with the rationalist movement, which appeared in the church of Islam during the early days of the Abbasides, and the bitter controversies which it raised.....

The rise and growth of ascetic sufism. which gradually developed under the influences of a non-Islamic character, a purely speculative side, is to a large extent responsible for the attitude. On its purely religious side, Sufism fostered a kind of revolt against the verbal quibbles of our early doctors. The case of Sūfyan Sauri is an instance in point. He was one of the acutest legal minds of his times and was nearly the founder of a school of law but their intensely spiritual, the dry-asd-ust subtleties of contemporary legist drove him to ascetic sufism on its speculative side which developed later, Sufism is a form of free thought and in alliance with rationalism the emphasis that it laid on the distinction of *zahir* and *batin* (Appearance and Reality) created an attitude of indifference to all that applies to Appearance and not to Reality.

This spirit of total other-worldliness in later sufism obscured men's vision of a very important aspect of Islam as a social polity, and offering the prospect of unrestrained thought on its speculative side attracted it and finally absorbed the best minds in islam. The Muslim state was thus left in the hands of intellectual mediocrities and the unthinking masses of islam, having no personalities of higher calibre to guide them, bound their security only in blindly following the schools.[8]

সে যা-ই হোক, ইকবালের নিকট তাছাউফ এক আমলিয়াত এর সমষ্টির নাম। ইসলাম এবং হাকায়েকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, এতদসত্ত্বেও খৃষ্টান, য়াহূদ এবং হিন্দু ধর্ম ও তাদের পথ-পন্থা নিয়ে গবেষণা যাঁরা করেন তাঁরা ইকবালের প্রেরণার উৎস তাছাউফকে মেনে নিতে নারাজ।

সূফী শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তার নিষ্পত্তি তো এখনো হয়নি। আবুল হাসান কান্নাদের মতামত হলো, সূফী (صوفى) শব্দটি *'সাফা'* (صفا) শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর প্রয়োগ এর উপর। কেউ কেউ বলেনঃ যে-সব মানুষকে মানবিক প্রবৃত্তি থেকে পূতঃপবিত্র করে দেয়া হয়েছে তারা সূফী হিসেবে খ্যাত হতে থাকেন। কেউ বা এই মত ব্যক্ত করতে থাকেন যে, যেহেতু এসব লোকের পোশাক পশমী হয়ে থাকে সে জন্য এঁরা সূফী বলে অভিহিত হতে থাকেন। এও বলা হয়েছে যে, আছহাবে ছুফ্ফারা সূফী বলে বিশেষিত হয়েছেন, কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত এই শব্দের ধারক বাহকদের বিলাপ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে এই হয়েছিলো যে, *'রিসালাতুল কুশায়রিয়াহ্'* -এর সংকলক আবুল কাসেম আব্দুল করীম ইবনে হাওয়াযেন লেখেনঃ "এই শ্রেণীর যে-সব বিশ্লেষক ছিলেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইন্তেকাল করেছেন। আমাদের যুগে তো সে-সব লোকের স্রেফ স্মরণই বাকী থেকে গেছে। মূল তরীকা তো লোপ পেয়ে গেছে। প্রকৃত ব্যাপার তো কৃত্রিমতায় ছেয়ে গেছে। না ওই সব বুড়ো বর্তমান আছেন যাঁদের পথে চলা যায়, না ওই সব জওয়ান বর্তমান আছে যাদের জীবনচরিত অনুসরণ করা যায়। ধর্মভীরুতার উপায়ই উল্টে গেছে। লোভ-লালসার যুগ এসে পড়েছে। শরীয়তের মর্যাদা পর্যন্ত অন্তর থেকে উঠে গেছে। ধর্ম থেকে উদাসীনতা সহজ হয়ে গেছে। হুকুম-আহকামের প্রভাব অবর্তমান। ইবাদাত, নামায, রোযার প্রতি অনীহা অন্তরসমূহে জেঁকে বসেছে। গাফিলতি এবং জৈবিক চাহিদার দিকে ধাবমান হওয়া এখন স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে *[রেসালাতুল কুশায়রিয়াহ্ঃ আবুল কাসেম আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযেনুল কুশায়রী পৃঃ ২ঃ৩ তরজমাঃ আবদুল মাজেদ-দর তাছাউফে ইসলাম পৃঃ ৮৮]* *'কাশফুল মাহজুব'* ফারসী ভাষায় তাছাউফের উপর সর্বপ্রথম কিতাব। এটি হিজরী পঞ্চম শতাব্দী এবং একাদশ খৃষ্টীয় সালে সাইয়্যেদ আলী হাজবেরী লিখেছেন। এ বইটিতে সূফীদের বারটি ফেরকার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে স্বীকৃত দশটি সিলসিলার নাম (মুহাসেবিয়্যাহ, কাছারিয়াহ, তয়ফূরিয়্যাহ, জুনায়দিয়্যাহ, নূরীয়্যাহ , সাহলিয়াহ,

হাকীমিয়্যাহ, খারাবিয়াহ, হাফীফিয়াহ ও সিয়ারিয়াহ সন্নিবেশিত হয়েছে। বাকী দুটোকে বিভ্রান্ত বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো সিলসিলায়ে হালবিয়্যা, এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু হুকমান দামেশকী, দ্বিতীয়জনের ফারমীর নাম বিবৃত হয়েছে। হালবিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দুদের ন্যায় পুনর্জন্ম–বাদে বিশ্বাসী ছিলো। আর ফারমী স্পষ্টতঃই নিজেদের মানছুর হাল্লাজের পদাংক অনুসারী বলে দাবী করছিলো। সাইয়্যেদ আলী হাজবিরী [দাতা গঞ্জে বখশ] বলেন, এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার এর চেয়ে বেশী ব্যাখ্যা জানা নেই *[কাশফুল মাহজুব : সাইয়্যেদ আলী হাজবিরী পৃঃ ১৯৫, নাফহাতুল আনাস–জামী]* উল্লিখিত সব দিক দেখে ইকবাল এটা বলতে বাধ্য হয়েছেনঃ

"The presence of Christianity was a further contributory factor in the growth of sufism. 9

অথবা এই যে,

"It was however, principally the actual life of the Christian hermit rather than this religious ideas that exercised the greatest fascination over the minds of early Islamic saints."10

এই ভূমিকা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে, আল্লামা ইকবাল তাছাউফ দ্বারা এত প্রভাবিত ছিলেন না যে, তিনি সূফীদের জীবন যাপন পদ্ধতিকে মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। অথবা তার দ্বারা স্বীয় চিন্তা–শক্তিকে ভষ্ম করে দিয়েছেন; বরং তিনি অতি স্পষ্ট করে এহেন জীবন যাপনকে পথের প্রদীপ বানানো থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই দিয়েছেন। এখানে একথাটি সুস্পষ্ট আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে করছি, আল্লামা ইকবালের আকীদা–বিশ্বাসের ব্যাপারে এটা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, যদি তিনি সূফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত না–ই হবেন তা হলে বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব, মাশায়েখ অথবা একনিষ্ঠ দ্বীনি ব্যক্তিত্বের দ্বারাও প্রভাবান্বিত ছিলেন না কেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মৌলিক জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি তিনি সব সময়ই সদাচরণ এবং শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপারে ছিলেন অকৃপণ, এর প্রমাণ তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। অবশ্য, মূর্খ নামধারী জ্ঞানের দাবীদার ও দ্বীনের ধ্বজাধারীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ইকবাল তাঁর রচনাবলীতে ইসলামী নিরিখে *মরদেকামেলের* জন্য *মরদেকলন্দর, মরদেমোমেন* এবং *মরদে হুর* ইত্যাকার পরিচিতিমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ জন্য তাঁর চিন্তার মূল এবং পথপ্রদর্শনের আলোক–বর্তিকা ছিলো মাছনবীয়ে মাওলানা রুম। এর মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত থেকে আরম্ভ করে মানুষের কর্মের নিদান ছিফাতে বারী তা'য়ালার্কে নির্দিষ্ট করা হয়েছেঃ

فعل حق وفعل ماهر دو ببين

যদি আমাদের কাজ কর্মকে নিরিখ করতে হয় তা হলে হক কাজকে সম্মুখে রাখো।

আর এর মধ্যে গ্রীকদের বিজ্ঞান [যা ইকবালের ভাষ্যানুযায়ী ইসলামী তাছাউফের ভিত্তিস্থল] হতে দূরে থেকে ঈমানদারদের পদাংক অনুসরণ করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছেঃ

تابکی از حکمت یونانیان

حکمت ایمانیان راهم نجوان

গ্রীকদের বিজ্ঞানের পেছনে তোমরা আর কতকাল ছুটতে থাকবে, ঈমানদারের বিজ্ঞানও বোঝার চেষ্টা করো।

মাওলানা রুমী–যাঁকে ইকবাল তার পথপ্রদর্শক হিসেবে মানেন, স্বয়ং তিনি গ্রীকদের বিজ্ঞানকে মরদূদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর সেই অহং–এর শিক্ষাই দেন যাকে ইকবাল *'তাহাফফুজে খুদী'* শিরোণামে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

ইকবাল এর বিশ্লেষণ করে বলেনঃ

আল্লামা ইকবাল

زنده ای یامرده ای یاجان بلب

ازسه شاهد کن شهادت راطلب

شاهد اول شعور خویشتن

خویش را دیدن بنور خویشتن

তুমি জীবিত কি মৃত অথবা মৃত্যু শয্যাশায়ী; যে অবস্থাতেই থাক না কেন নিজকে নিজে পরখ করার জন্য তোমার তিনটি বস্তু থেকে সাক্ষ্য নেয়া দরকার। প্রথম সাক্ষী হলো স্বয়ং নিজের ব্যাপারে উপলব্ধি অর্থাৎ নিজেকে নিজে উজ্জ্বল অন্তর দ্বারা পরখ করা।

মানুষকে পরীক্ষা করার এই পন্থা যিনি শিখিয়েছেন ইক্‌বাল তাকে তাঁর পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেন। কেননা, এটা হলো ন্যায়পরায়ণতার মে'রাজস্বরূপঃ

پیر رومی آن امام راستان

آشنائی برمقام راستان

মাওলানা রুমী ন্যায়পরায়ণদের ইমাম, আর তাদের স্থান সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবহিত।

ইকবালের ইমাম রুমী মরদে খোদার যে প্রশংসা করেছেন তা শুনুন, তা হলে ইকবালকে বুঝা সহজ হয়েযাবেঃ

মরদে খোদা ছেঁড়া কাপড় পরা সত্ত্বেও হয় বাদশা
সে ঐ কোষাগারের ন্যায় যা মরুপ্রান্তরে লুকায়িত
মরদে খোদা হাওয়া ও মাটির সৃষ্টি নয়
সে আগুন এবং পানি দ্বারাও সৃজিত নয়
সে কূলহীন এমনি সমুদ্র যার থেকে অগণিত মূতি বেরোয়
মরদে খোদা প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে চেনে
সে কিতাব পড়েই আইনজ্ঞ বনে যায় না
মরদে খোদা এমনি দ্বীনদার যার থেকে কুফরী কখনো পাওয়া যায় না
তাই সে শুধু পুণ্যই করে, কখনো গুনাহ করে না

গ্রন্থপঞ্জী

১. Schimmel, Annemarie, Gabriel's Wing , 341, 342 and 346
২. রোযগারে ফকীর, ফকীর সাইয়েদ ওহীদ উদ্দীন, পৃ ৫৯
৩. ইকবালনামা, সম্পাদনা ঃ শেখ আতাউল্লাহ, প্রথম খন্ড, পৃ ৭৯
৪. ঐ, পৃ ৭৮
৫. আল্লামা ইকবাল মরহুমের লেখা পত্র, প্রফেসর ইউসুফ সলীম চিশতি অনূদিত পৃ ১৪
৬. আনওয়ারে ইকবাল, পৃ ১৮৬
৭. তাছাউফের ইতিহাস, প্রফেসর ইউসুফ সলীম চিশতী, পৃ ১০৫ Mazharuddin siddiqi. "Concetp. of Muslim Culture in Islam." 48
৮. Iqbal, Sir muhammad, 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam. 142-143.
৯. Iqbal, M, Mataphyiscs in Persia, 79
১০. Ibid 80

ফররুখ আহমদ অনূদিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক–কবি হিসাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত; তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসাবে স্বদেশে–বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচনার অন্তর্গত বাণীর আবেদন ছাড়াও রূপের ঐশ্বর্য এবং শিল্প–সাফল্যও ইকবালকে এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের কবিতার, কাব্যগ্রন্থের এবং দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে।[১] এই অনুবাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ, অনুবাদকের সংখ্যাও তেমনি স্বল্প নয়। ইকবালের কাব্য ও অন্যান্য রচনার অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক প্রখ্যাত কবি–সাহিত্যিক, সুপন্ডিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল–কাব্য ও তাঁর অন্যান্য রচনার অনুবাদ শুরু হয় চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকেই। গত প্রায় অর্ধ শতকেরও অধিককাল ধরে বাংলা–ভাষায়ও ইকবালের কাব্যগ্রন্থ, কবিতা ও গদ্য রচনার বহু অনুবাদ হয়েছে। তাঁর অনেক বিখ্যাত কাব্য এবং কবিতার অনুসরণে ও অনুকরণে বাংলা–ভাষায় রচিত হয়েছে কিছু কিছু কবিতা ও কাব্য। উপজীব্য আহরণে যেমন, রচনার আঙ্গিক ও রূপরীতি অনুসরণ এবং উপমা, চিত্রকল্প, রূপক ইত্যাদি ব্যবহারেও তেমনি ইকবালের প্রভাব বর্তেছে অনেক বাঙ্গালী কবির ওপর। ফররুখ আহমদের কোনো কোনো কবিতায়ও এর স্বাক্ষর আছে। ইকবাল–কাব্যের একনিষ্ঠ পাঠক, তাঁর কবিতা ও পদ্য রচনার অনুরাগী, আদর্শের অনুসারী এবং ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতার অনুবাদক হিসাবে ফররুখ আহমদের ওপর এই প্রভাব ছিল খুবই স্বাভাবিক।

---

(১) ইকবালের কবিতাসমূহ দুনিয়ার বহু ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজী, জার্মান, ইতালীয় ও রুশ ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। তাঁর কবিতার কতিপয় তরজমা বেরিয়েছে ফরাসী, তুর্কী ও আরবী ভাষায়। তাঁর বেশীর ভাগ রচনা উর্দু ও ফারসী ভাষায় লেখা। বহু সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর ফারসী কবিতা সংগ্রহ কেবল সংখ্যায় নয়, বরং গুণের দিক দিয়েও তাঁর রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। (ইকবাল ঃ বিশ্বজনীনতার কবি, ডক্টর এম, ডি, তাসীর, এম এ পিএইচ ডি (ক্যান্টাব), অনুবাদঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, ইকবাল মানস, পৃঃ ৫৩)

মনে রাখা দরকার যে, ইকবাল–কাব্য অনুবাদে বাঙালী মুসলমান লেখকদের আত্মনিয়োগের মুখে সাহিত্য, শিল্পগত কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত কারণও ছিল। ইকবালের কবিতা ও অন্যান্য রচনার সাথে বাঙালী মুসলমান লেখকদের পরিচয় ঘটে এমন এক সময়ে যখন উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামও ব্যাপ্তি লাভ করেছে; পরবর্তীকালে *'রেনেসাঁ আন্দোলনের'* পটভূমিতে ইকবালের রচনা ও তাঁর চিন্তাধারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা জোগায় এবং উৎসে পরিণত হয়। উর্দু, ফারসী, ইংরেজী–এই তিন ভাষায়ই ইকবাল কাব্য রচনা করেছেন, যদিও তাঁর দার্শনিক রচনাবলী প্রধানতঃ ইংরেজীতেই লেখা। তবে অনেকের মতে, ফারসী ভাষায় রচিত ইকবালের কবিতাবলীই উৎকৃষ্টতর। এর মূলে ফারসী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কাব্য–ঐতিহ্য কতটা কাজ করেছে তা বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। যেহেতু ফারসী ইরান ছাড়াও সন্নিহিত অঞ্চলের জনগণের ভাষা এবং এই উপমহাদেশে এককালে রাষ্ট্রভাষা ছিল, এই উপমহাদেশে ফারসী জানা লোকের সংখ্যাও কম নয়, সে কারণেও সম্ভবতঃ ইকবাল ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকবেন। হয়তো কবির মনে এই বাসনাও সংগোপন ছিল যে, তাঁর বাণী ও কাব্য–শিল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ুক।

ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার এবং স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণের বাণীবাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলতঃ মানবতাবাদী কবি, তাঁর বাণী এবং কাব্য–শিল্পের আবেদনও তাই বিশ্বমানবতার কাছেই। ইকবাল–সাহিত্যের এই বিশ্বজনীন আবেদনের জন্যে তো বটেই, উপরন্তু, মুসলিম নবজাগরণ এবং ইসলামী আদর্শের বাণীবাহক বলেও এই মহাকবির রচনা এ দেশের বিদ্বজ্জন মহলে এবং পাঠক–মনেও ব্যাপকতর ও গভীরতম আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উর্দু ও ফারসী ভাষায় রচিত ইকবালের কাব্য–কবিতার মূলের সাথে পরিচয়ের সুযোগ সীমিতসংখ্যক লোকেরই ঘটেছে বটে, তবে অনুবাদেও তাঁর রচনার আবেদন কম ব্যাপ্তি লাভ করেনি। এর একটা প্রধান কারণ, বাংলা–ভাষায় যাঁরা ইকবালের কাব্য কবিতার অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান কবি। কাজী নজরুল ইসলাম ইকবালের কোনো রচনা অনুবাদ করেননি বটে, তবে প্রাচ্যের এই মহাকবির রচনার সাথে যে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, সে কথা মুহাম্মদ সুলতান অনূদিত ইকবালের *'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া'* কাব্যগ্রন্থের *'ভূমিকা'* পাঠেই বোঝা যায়। তাতে নজরুল এই অনুবাদ মূলের সাথে মিলিয়ে পড়েছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন।

ফারসী কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলায় হাফেজ ও ওমর খৈয়ামের রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষান্তরকারী নজরুলের কাছ থেকে আমরা ইকবালের কোনো অনুবাদ পাইনি বটে, তবে তাঁর পূর্বসুরি–উত্তরসুরি অনেক খ্যাতিমান কবিই ইকবাল–কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও

অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন, দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত অর্ধ শতকেরও অধিককালের পরিধিতে যাঁরা ইকবাল–কাব্যের অনুবাদে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, অমিয় চক্রবর্তী, আবদুল কাদির, মহিউদ্দিন, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, আবুল কালাম মুস্তফা, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল হাফিজ, মুনীর চৌধুরী, আবদুর রশীদ খান, মুফাখখারুল ইসলাম, নেয়ামাল বাসির প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইকবাল–কাব্যের অনুবাদের পটভূমি এবং এ ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেনঃ

"বাংলাতে তাঁর (ইকবালের) প্রথম অনূদিত গ্রন্থ '*শেকোয়া*'। যে–সময় বাঙালী মুসলমান নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে আপন দুঃখ–দুর্দশার নিবৃত্তি খুঁজছে, স্বস্তিহীন মুহূর্তে সে আল্লাহর বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছে, তখন ইকবালের '*শেকোয়ায়*' সে আপন মনের অনুরণন শুনেছিলো। চরম দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, দুঃখে জর্জরিত এবং তৎহেতু আত্মঘাতী কবি আশরাফ আলী খান '*শেকোয়া'র* প্রথম তর্জমা করেছিলেন। আশ্চর্য আবেগ এবং গতির মধ্যে আশরাফ আলী 'শেকোয়া'য় আপন মনের প্রতিফলন দেখেছিলেন, তাই তার অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং কাব্য–সৌন্দর্যে নবোদিত সূর্যের বর্ণ বৈচিত্র্যের মতো। এরপর '*শেকোয়া'র* তর্জমা অনেক হয়েছে – তন্মধ্যে মুহাম্মদ সুলতান, মীজানুর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ– এ তিন জনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'*আসরারেখুদী'র* প্রথম বাংলা তর্জমা করেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। অনুবাদটি জনপ্রিয়ও হয়েছে। আবদুল মান্নান পদ্যে তর্জমা করেছেন। এরপর আমি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত কাব্যানুবাদ করেছিলাম। আমি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিনি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছি। ফররুখ আহমদও কাব্যে অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন।[২]

ফররুখ আহমদ অনূদিত ইকবালের কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত এবং এই অনুবাদকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে স্বভাবতই কিছুটা ইতিহাস এবং উপরোক্ত পটভূমিকার দিকে ফিরে তাকাতে হয়। মূল লেখক ও অনুবাদকের অনন্যসাধারণ কবি–প্রতিভা, সাহিত্যে–বিশেষ করে কাব্য ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য অবদান, চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের দিক থেকে উভয়ের মিল ও মানস–সাযুজ্য এবং সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের নবরূপায়ণে, আর স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদানই এটুকু দাবী করে। বিভাগ–পূর্বকালেই ফররুখ আহমদ ইকবাল–কাব্যের অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশের দশকে '*রেনেসাঁ–আন্দোলনের*' পটভূমিতেই ইকবালের কবিতা ও তাঁর দার্শনিক–চিন্তাধারার সাথে ফররুখ আহমদের ব্যাপক পরিচয় ঘটে। সে–সময়েই তিনি ইকবাল–কাব্যের

(২) ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য, প্রকাশক ঃ প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৫২

অনুবাদে আত্মনিবেদিত হন এবং ইকবাল সম্পর্কে প্রবন্ধও লেখেন একই সময়ে। তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী অনেক কবিও ইকবাল–কাব্যের অনুবাদে, ইকবাল–সাহিত্যের মূল্যায়নে ব্রতী হন। ইকবাল–কাব্যের সাথে পরিচয় ও তাঁর কাব্যানুবাদের এই পটভূমি বিশ্লেষণ করে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন ঃ

"নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান যখন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে, তখন ইকবালের *'শেকোয়া'র* সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নজরুলকে পথিকৃৎ মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। *'শেকোয়ায়'* তিনি আপন মনের অনুরণন শুনলেন। কাব্য হিসাবে *'শোকায়া'র* মূল্য যত লঘুই হোক না কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিলো। নজরুলকে ভালো লেগেছিলো, কিন্তু সেই দীপ্তির দাহন আছে– স্নিগ্ধতা নেই; ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে, কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই, তাই তা মূলতঃ প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।

এরপর যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানকে অন্য এক জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করতে বললেন, তখন তাঁকে আমরা নেতৃপদ দিলাম।—পাকিস্তান পরিকল্পনার উন্মেষ হলো এভাবেই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয়, কিন্তু আদর্শের স্বীকার। সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যেতে লাগলো আরও পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হলো প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা। কেননা, আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংসক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ আদর্শের অনুসৃতি হলো সার্থক। পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত আবেগ, উল্লাস ও কল্পনার এবং কবিতাই হল এ আবেগ প্রকাশের একমাত্র পরিসর। এ বক্তব্যের সঙ্গে রূপকল্পের সমন্বয় সাধনের পর কখনও কখনও কারো কবিতা শ্রোত্ররসায়নও হয়েছে। কিছুটা অগভীরভাবে হলেও কাব্য ক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেলো–ইসলামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা; ইসলামের সত্য বিশ্বাস এবং উপলব্ধিগত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথি–সাহিত্য ও পল্লী গীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন। ইকবালের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিলো প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে। ইকবালের প্রভাবে এ দু'টি ধারা বলিষ্ঠ হয়েছিলো এবং নতুন রূপ নিয়েছিলো–ক্ষীণ প্রাণধারা স্রোতাবেগ পেয়েছিলো।" (ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতার সমর্থন মিলবে সে–সময়ে লেখা ফররুখ আহমদের ও তাঁর সমসাময়িক সহযাত্রী কবিদের অনেকের রচনায়। বলেছি, ফররুখ আহমদ যেমন ইকবাল–কাব্যের অনুবাদ করেছেন তেমনি এই মহাকবির কোনো কোনো কবিতা অবলম্বনে লিখেছেন নতুন কবিতা। প্রসঙ্গতঃ তাঁর *'জওয়াব–ই–শেকোয়া'র* অনুকরণে *'জওয়াব'* শীর্ষক কবিতাটি

উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বেই ফররুখ আহমদ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন ঃ

এ আকাশ মুছে যাক এ আকাশে এসেছে জীর্ণতা।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

তবে মুখ ঢাকো আজ হায় বন্ধ্যা আচ্ছন্ন সবিতা

দীপ্ত দিন তুলে ধরো আঁধারের কালো যবনিকা। [নাটক] মনে হয়, প্রাচ্যের দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতার সঙ্গে ফররুখ আহমদের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বেই ঘটে গিয়েছিলো। ফররুখ আহমদ অনূদিত ইকবালের একটি কবিতায় আছে ঃ

'এ আকাশ জরাজীর্ণ এইসব তারারা পুরান

আমি চাই সদ্যজাত পৃথিবী নতুন।'

ইকবালের মতো দার্শনিক-মনের অধিকারী না হলেও কাব্যক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই মহাকবির আদর্শের অনুবর্তিতা ফররুখ আহমদের রচনায় বিশেষভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ১৯৪৫ সালেই কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন ঃ "বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক, তাঁরা অবশ্য প্রধানতঃ বুদ্ধির মুক্তিবাদী। তবে মোটের ওপর নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফররুখ আহমদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন, যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তাঁর নয়। তিনি তরুণ, বিচার-বিশ্লেষণ নয়, সুপরিণতিই তাঁর জন্য আজ কাম্য।"

পরবর্তীকালে ইকবালের কবিতা অনুবাদে আত্মনিয়োগের ফলে এই আদর্শ-অনুবর্তিতা এবং অনুসরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভাগ-পূর্বকালে তো বটেই, (সাবেক) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গত দুই-আড়াই দশকে ফররুখ আহমদ ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করেন। সে-সব কবিতার মধ্যে রয়েছে-তাঁর পূর্বসুরি ও সমসাময়িক কবিদের অনূদিত কবিতা ছাড়াও ইকবালের অনেক কবিতা-যা ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি। কিন্তু বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ সময়ের পরিধিতেও ফররুখ আহমদ অনূদিত ইকবালের কবিতা আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ও সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত '*ইকবালের কবিতা*' সংকলনে স্থান পায় ফররুখ আহমদ অনূদিত ইকবালের ১২টি কবিতা। বাকী কবিতাগুলির অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান ও আবুল হোসেন। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন ঃ

"বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও আমার তর্জমা।-অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ আমাদের অবলম্বন ছিলো ইকবালের কবিতার ইংরেজী তর্জমা। *'আসরারেখুদী'* ছাড়া অন্যান্য কবিতার ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে। যাতে ভাবান্তর মূলের সঙ্গে যথাযথ থাকে।

ফররুখ আহমদের 'পূবালী', 'বুআলী কলন্দর' ও 'ভিক্ষা' *'আসরারে খুদী'র* তিনটিঅধ্যায়ের তর্জমা-প্রথমটি অংশবিশেষ, পরের দু'টি সম্পূর্ণ। অনুবাদের জন্য ফররুখ আহমদের অবলম্বন ছিলো নিকলসনকৃত 'আসরারে খুদী'র ইংরাজী তর্জমা।" (ঐ)

পরবর্তীকালে, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান পাবলিকেশান্স প্রকাশিত *'ইকবাল-চয়নিকা'* সংকলন গ্রন্থেও ফররুখ আহমদ-অনূদিত অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'ই ফররুখ আহমদ অনূদিত কবিতার প্রথম গ্রন্থ। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের অন্তর্গত ইকবালের কবিতাবলী ইতিপূর্বে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত *'ফররুখ-রচনাবলী'তেও* স্থান পেয়েছে। এসব অনূদিত কবিতায় ফররুখ আহমদ মূলের সাথে কতটা সঙ্গতি রক্ষা করতে পেরেছেন, ভাষান্তরে দিতে পেরেছেন কতটা দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয়, তা বিচার করতে হলে, অনুবাদের নিয়ম-কানুন, কায়দা-কৌশল এবং শিল্পরূপের নিরিখেই তা যাচাই করতে হবে। মনে রাখা দরকার, ফররুখ আহমদ তাঁর অনুবাদকর্মে অবলম্বন করেছেন মূল রচনার ইংরেজী অনুবাদই। এবং অন্য অনুবাদকদেরও অবলম্বন হয়েছে প্রধানতঃ ইংরেজী-অনুবাদই। মূল রচনা এবং ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ছাড়াও অন্যদের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারেও এই অনুবাদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অনুবাদ *'কাশ্মীরী শালের উল্টো পিঠের মতো।'* সঙ্গত কারণেই, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ লাভ সর্বক্ষেত্রে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। বিশেষ করে কাব্যের অনুবাদে ভাবদেহের পরিচয় মিললেও, রূপ-সৌন্দর্য এবং কাব্যের মনোহর লাবণ্যের সাক্ষাৎ সব সময় মেলে না। স্বল্প শক্তিমান অনুবাদকের হাতে পড়ে এ-কারণেই বহু মহৎ কবির কাব্যের বিপর্যয় ঘটেছে, তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। উৎকৃষ্ট অনুবাদের অভাবে এবং দুর্বল অনুবাদের দরুন সমগ্র বিশ্ব পটভূমিকায় রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা যে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, এ দুঃসংবাদ বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি রচনায় কয়েক বছর আগেই পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য অনুবাদে নবসৃষ্টিও সম্ভব। ফিটজেরাল্ড বা কান্তি ঘোষের মতো দক্ষ অনুবাদকের হাতে পড়লে অনুবাদ-কাব্য নবসৃষ্টির মহিমা পায়। ইকবালের জন্যে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, অনেক অক্ষম অনুবাদকের হাতে তাঁর কাব্যের মহিমা ও মাধুর্য লাঞ্ছিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তাঁদের

অনেকেই সৃজনক্ষমতার অভাবে এবং আক্ষরিকভাবে মূলানুগ হবার মূঢ় বাসনায় উদ্দীপিত হয়ে ইকবাল-কাব্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তাঁরা এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন যে, অনুবাদ অর্থ মূলের ভাষান্তর মাত্র নয়, মূল সৌন্দর্যের নবরূপায়ণও বটে। নবসৃষ্টির মহিমায় মাধুর্যময় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারলে অনুবাদ বিপর্যয়কেই প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখিত অনুবাদকদের কল্যাণে আমরা '*দার্শনিক*' ইকবালকে পেয়েছি বটে, কিন্তু কবি ইকবালকে অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়েছি।৩

ইকবাল সম্পর্কে প্রখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছেন ঃ "তাঁর দর্শন ও জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় তাঁর কবি-প্রতিভা ও সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে খুব কম বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর বাণীর প্রাণবস্তু এবং শক্তির উৎস হচ্ছে তাঁর কবিতা। ফয়েজের লেখা থেকে জানা যায়, উর্দু কাব্যে ইকবাল অর্ধ ডজন নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেন, প্রথম সার্থকভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন এবং অসংখ্য নতুন শব্দ আমদানী করেন। অপরিচিত ধ্বনি, শব্দ ও বিশেষ্য পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ইকবালের কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে ফয়েজ বলেন ঃ 'ইকবালের মতো আর কোনো কবি উর্দু কবিতায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের এতখানি ধ্বনি- বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি। এ পদ্ধতির তিনিই উদগাতা। আর ইকবালের অন্বেষা হলো বিশ্ব-জগত ও মানুষ, বিশ্ব-জগতের মুখোমুখি মানুষ। তাঁর কবিতার শেষ কথা হলোঃ মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা। ফয়েজের দৃষ্টিতে, এই মূল্যবোধই ইকবালের কবি কীর্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।"

ভাব-সম্পদের মতো কাব্যের রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইকবাল নবসৃষ্টির মহিমা সঞ্চারিত করেছেন। কাব্যের টেকনিক বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষায় ইকবালের সাফল্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি নব-উদ্ভাবিত টেক্‌নিকে কবিতার ঐন্দ্রজালিক রূপ সৃষ্টিতেও তাঁর পারঙ্গমতা দুর্লভ শিল্পীজনোচিত। ইকবালের কাব্যের মূলের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, অনুবাদের মাধ্যমেই যারা *দার্শনিক*-কবি ইকবালকে জানেন, তাদের পক্ষে ইকবাল-কাব্যের বিস্ময়কর

---

৩. "তাঁহার কবিতায় শিল্পী ও স্রষ্টার সম্মেলন ঘটিয়াছে, ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষারই চোস্ত ও সুমার্জিত কবিতায় ইকবাল মিনারেটসমূহের সুদূরবর্তী ইশারা ও আরবীয় মরু বালুকার চাকচিক্যময় স্বপ্ন আমাদের চোখে জাগাইয়াছেন। জীবনের বাস্তবতার পটভূমিকার নীলিম নিঃসীমতা যেন এখানে গলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার রহস্যবাদ জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে, তবু ইহা যেন রহস্যের অতলতাকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। তাঁহার ভাষায়ও প্রাঞ্জল শব্দাবলী যেন অগম্য অতলতাকে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সুদক্ষ জহুরী যেভাবে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি চয়ন করিয়া থাকে, ইকবাল তেমনই সতর্কতা সহকারে শব্দ চয়ন করিতেন। তবুও তাঁহার শৈল্পিক নৈপুণ্যতা ও ভারসাম্য রক্ষার অন্তরালে স্রষ্টার বাস্তবতাবোধ *প্রভমান।*"-(ইকবাল, অমিয় চক্রবর্তী, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার সম্পাদিত 'কবি ইকবাল', বুলবুল হাউস, কলকাতা, ১৯৪১ দ্রষ্টব্য)

শিল্পরূপ এবং অন্তঃসত্ত্বার প্রকৃত পরিচয় লাভ অসম্ভব। কারণ, অনুবাদে মূলের ভাব ধারা দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর শিল্পরূপ ধরা দেয় না; ফলে অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে 'দার্শনিক' ইকবালকে জানা সম্ভব হলেও কবি ইকবালকে জানা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাঁর শিল্পদক্ষতা থেকে যায় পাঠকের বোধের পরপারে ; এর জন্যে অক্ষম অনুবাদও কম দায়ী নয়। আশার কথা এই যে, কয়েকজন প্রতিভাধর কবি ও সহমর্মী ইকবাল–কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও সাধনা নিয়োজিত করার ফলে আমরা বাংলা ভাষায়ও প্রাচ্যের এই মহান দার্শনিক–কবির অনেক কবিতার চমৎকার ভাষান্তর উপহার পেয়েছি।

ফররুখ আহমদ অনূদিত, গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলী পাঠ করলে ও ইকবাল–কাব্যের বাণীর এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে সাথে তার সৌন্দর্য এবং লাবণ্য মহিমার সাথেও পরিচিত হওয়া যাবে। এবং অনুবাদ পাঠে স্পষ্টতঃই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে, ইকবাল শুধু আত্মার রহস্য–সন্ধানী এবং আত্মসত্তার উদ্বোধনকামী মহৎ দার্শনিকই নন, তিনি মহৎ কবিও। ইকবাল তাঁর জীবনাদর্শ, জীবনানুভূতি এবং স্বতন্ত্র জীবন–দর্শন ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাব্যের ভাষা এবং আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং ভাবনা উৎসারিত হয়েছে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে, আর এ–কারণেই প্রত্যক্ষতার বন্ধন অতিক্রম করে তা অনেকখানি রহস্যময় চরিত্র অর্জন করেছে। ইকবালের সৌন্দর্য দৃষ্টি ও অপরিমেয় কল্পনাশক্তি তাঁকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়। উপমা–উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপ প্রতীকের ব্যবহারের সাহায্যে ইকবাল তাঁর বক্তব্যকে দিয়েছেন সৃজনধর্মিতা, করেছেন অনিঃশেষে তাৎপর্যমন্ডিত। ইকবাল যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টি ও রূপকের ব্যবহারে অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত মহৎ কবিদের মতোই সুদক্ষ–এর পরিচয় আমরা ফররুখ আহমদ অনূদিত এই গ্রন্থের কবিতাবলীতেও পাবো।

ইকবাল–কাব্যের অনুবাদে ফররুখ আহমদের দক্ষতার পরিচয় তুলনামূলক বিচারে এবং এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে, ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী, প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের সৃজনী ক্ষমতায়, অনুবাদও কতখানি নবসৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে। উপমা ও রূপ প্রতীক সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য কবিতার ভাষান্তর করেছেন ফররুখ আহমদ এইভাবে ঃ

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর পরে
আমার ক্রন্দনধারে শিশির–সিঞ্চিত হল
গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায়
আমারি সে একাগ্র আবেগে। [আসরার–ই–খুদী, সূচনা খন্ড]

সৈয়দ আলী আহসান উপরোক্ত স্তবকেরই অনুবাদ করেছেন এইভাবেঃ

দিনের প্রথম সূর্য দুরন্ত আঘাতে যবে
শর্বরীর তিক্ত ক্লান্তি করিলো হরণ
অশ্রুর নীহারে কাঁপে নিষিক্ত পুষ্পের দল
রক্তিম বরণ ;
নার্গিস ফুলের তন্দ্রা মুছিয়া দিলাম আমি
অশ্রুর প্রবাহে
জাগিয়া উঠিল অণু অচেতন ছিলো যাহা
মৃত্যুরপ্রদাহে।
আমার উচ্ছ্বাসে জাগে শীত–শীর্ণ কিশলয় দল।

উদ্ধৃত কবিতাংশের দু'জন অনুবাদকই আমাদের সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি এবং অনুবাদে তাঁদের দক্ষতাও স্বয়ং প্রকাশ; তবুও দু'টি কবিতাংশই পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে অনুভব করা যাবে যে, ফররুখ আহমদের ভাষা, তাঁর নিজের কবিতার ভাষার মতোই অনেক বেশী গাঢ়বন্ধ, সংহত এবং প্রাণবান। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো কেউ–ই করেননি। কেননা, সৈয়দ আলী আহসান নিজেই বলেছেন, ইংরেজী থেকে অনুবাদেও তিনি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ কনেনি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। তবুও, এঁরা নিজেরা সৃজনশীল কবি বলেই ইকবালের উপমা–চিত্রকল্পও অনেকখানি ভাষান্তরিত হয়ে এসেছে। '*দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর পরে*'–ফররুখ আহমদ–অনূদিত এই চিত্রকল্পটি তো অনবদ্য রূপ–মহিমা লাভ করেছে। তাঁর অনূদিত অন্যান্য কবিতায়ও লক্ষ্য করা যাবে যে, তিনি শুধু ইকবালের বাণীর আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাষান্তরই করেননি, উপমা–উৎপ্রেক্ষা–চিত্রকল্পেরও নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন; এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, ফররুখ আহমদ নিজেও শক্তিমান এবং রূপদক্ষ কবি, উপমা–উৎপ্রেক্ষা–চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও ছিল তাঁর পারঙ্গমতা।

ফররুখ আহমদ–অনূদিত 'খোদার দুনিয়া' কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

কে তিনি––মাটির নিবিড় আঁধারে লালন করেন বীজ ?
কে তিনি––ওঠান সহজে এ মেঘ দরিয়ার ঢেউ থেকে ?
কে তিনি––আনেন পশ্চিমী হাওয়া, সুফলপ্রসূ এ বায়ু ?
এ জমিন কার ? অথবা এ কার সূর্য–রশ্মিধারা।

মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা!
কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা ?
শোন জমিদার--এ ক্ষেত খামার এ তোমার নয়,
এ তোমার নয়,
এ নয় তোমার কোন সম্পদ; আমারো এ নয়
কোন সঞ্চয় ।।

আবুল হোসেনের অনুবাদ ঃ

মাটির আঁধার গর্ভে লালন করে কে লক্ষ বীজ ?
সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশে তোলে কে কালো মেঘ ?
পশ্চিম পাহাড় থেকে ডেকে আনে কে মধুর হাওয়া ?
এ সোনার মাঠ কার, কার ওই সূর্যের স্বচ্ছ আলো ?
মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শীষ ?
মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে ?
এ জমি তোমার নয়, হে ভূস্বামী তোমার তো নয়
নয় পূর্ব–পুরুষের, তোমার আমার কারো নয়।

দু'জন কবিই অনুবাদে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এঁরা শক্তিমান ও রূপদক্ষ কবি বলেই অনুবাদেও উপমা–চিত্রকল্প আকর্ষণীয়রূপে ভাষান্তরিত হয়েছে। অনুবাদের ভাষা ব্যবহারে আবুল হোসেন অবলম্বন করেছেন অনেকটা কথ্যরীতি এবং ঘরোয়াভঙ্গি, ফলে ছন্দনির্ভর এই অনুবাদও অনেকটা গদ্যের ধার ছুঁয়ে গেছে; অন্যপক্ষে ফররুখ আহমদের ভাষা অনেকটা ক্লাসিকধর্মী, উচ্চারণ গম্ভীর এবং ছন্দও সুনিরূপিত ও বাণীবদ্ধ। ফলে কবিতাটি পাঠ বা আবৃত্তিকালে এর ধ্বনিময়তা, গাম্ভীর্য এবং গতিময়তা চেতনাকে স্পর্শ করে হৃদয়ে অনেক বেশী আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। *'মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শীষ? মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে'*– এই অনুবাদ হয়তো অনেকখানি মূলানুগ, কিন্তু *'মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা। কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা?'*–যে ভাষার ক্লাসিকধর্মিতা ও ছন্দ ধ্বনিময়তার কারণে অধিক আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তা অস্বীকার করা যাবে না।

ইকবাল-কাব্যের অন্যতম দক্ষ অনুবাদক এবং উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ মনির উদ্দীন ইউসূফ লিখেছেন, "ইকবালের উর্দু ক্লাসিক্যাল উর্দু, অর্থাৎ তাঁর ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য সুপ্রকট। Image allusion-এর জন্যই যে এ প্রাধান্য, তাও নয় ; ভাষার গাম্ভীর্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা রক্ষার খাতিরেই বরং ভাষার ক্লাসিক্যাল রূপকে কবি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও প্রাচীন রীতিই তাঁর কাছে বেশী উপযোগী মনে হয়েছে।"--(ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ন, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) ক্লাসিক্যাল ভাষা ও বাণীভঙ্গি অনুসরণ, ছন্দ ও শব্দের নিপুণ ব্যবহার এবং উপমা চিত্রকল্প রচনায় দক্ষতার গুণে অনুবাদও কতটা মৌলিক কবিতার চারিত্র্য অর্জন করতে পারে, ফররুখ আহমদ অনূদিত '*ইকবালেরনির্বাচিত কবিতা*'য়ও তার পরিচয় মিলবে। '*আদমেরপ্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন*' কবিতাটি ধরা যাক, এর প্রথম স্তবকটি হলো ঃ

খোল আঁখি, দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভঃতল;
দেখ এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির বিদার সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে
সুপ্তপূর্বাচল।।
গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে,
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা বহ্নি
দেখ তুমি ধরাবক্ষ হতে।
অধীর হ'য়ো না তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিতসংগ্রামের স্রোতে।।

[ফররুখ আহমদ অনূদিত]

এই কবিতাটির একাধিক অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যকরা। কারো কারো অনুবাদ মূল থেকেই; তবুও অনুবাদগুলির পাশাপাশি সংস্থাপন এবং তুলনামূলক পাঠে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ফররুখ আহমদের অনুবাদের মতো এতটা সংহত ও সুন্দর রূপ, উপমা-চিত্রকল্পের সমবায়ে এমন প্রাণময়তা ও গতিশীলতা, আর কারো ভাবান্তরে মূর্ত হয়নি, বরং অনেকের অনুবাদে জড়তা এবং ক্লিষ্টতাই অনুভবযোগ্য। এর প্রধান কারণ, ভাষা ও ছন্দ নির্বাচনে তাঁদের যথার্থতাবোধের অভাব, ভাষা ও ছন্দকে বাণী বহনের উপযোগী করে ব্যবহারের ক্ষমতার ন্যূনতা এবং উপমা ও চিত্রকল্পে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করতে না পারা। এই কবিতাটির উল্লেখযোগ্য অংশের কয়েকটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো ঃ

আল্লামা ইকবাল

মেল আঁখি হের সুন্দর
হের নভঃতল, প্রকৃতি হের ;
পূর্ব–দিগন্তে উদিত সূর্য
ক্ষণিকের লাগি তাহারে হের।
গুণ্ঠনহীন উজ্জ্বল বিভা
গুণ্ঠন ঢাকা তাহারে হের,
বিরহ যুগের যাতনা মথিত
অত্যাচারিত হৃদয় হের,
অধীর হয়ো না। দেখ কী দ্বন্দ্ব
রয়েছে আশা ও ভীতির মাঝে

[অনুবাদ ঃ সুফিয়া কামাল]

খোল আঁখি, হের ধরা, দেখ চেয়ে গগন প্রাঙ্গণ,
কেমনে উদিছে ওই পূর্বাচলে ভাস্কর তপন।
সে নগ্ন প্রকাশ হের, যবনিকা–মাঝারে গোপন।
অত্যাচার দেখ আজ দিবারাত্র তব বিচ্ছেদের
অধীর হয়ো না বন্ধু, দ্বন্দ্ব হের আশা ও ভয়ের।

[অনুবাদ ঃ মনির উদ্দীন ইউসুফ]

উপরোল্লিখিত সবগুলো অনুবাদই সুন্দর এবং প্রশংসার দাবী রাখে। দু'টি ছন্দোবদ্ধ এবং একটি গদ্য–ছন্দের অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখলেও বুঝা যাবে যে, ফররুখ আহমদ মূল থেকে তেমন দূরে সরে যাননি, বরং মূল ভাববস্তু এবং শিল্প–সম্পদের ওপর ভিত্তি রেখেই তাঁর সৃজনক্ষমতার স্পর্শে এই অনুবাদ কবিতাটিকেও নতুন মহিমা দিয়েছেন এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। আর এ–ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছে ভাষা ও ছন্দের ওপর অবাধ অধিকার এবং কল্পনা–প্রতিভা। তিনি যখন উচ্চারণ করেন ঃ

ওঠো–দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও ।।

ফররুখ আহমদ অনূদিত '*ইকবালের নির্বাচিত কবিতা*'

করো ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন–দুঃখীর রাজ ;
পাপের চিহ্ন মুছে দাও, ধরা রাঙিয়ে দাও ।।
কিষান–মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল,
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও—

তখন এই রচনা আদৌ অনুবাদ বলে মনেই হয় না, এটি ইকবাল কিংবা অন্য কারো কবিতা কি–না, সে–প্রশ্নও মনে জাগে না; বরং একটি মৌলিক কবিতারূপেই পাঠকের চেতনায় আঘাত হানে, মনে অনুরণন জাগায়। অনুবাদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে ? অনেকেই এই কবিতাটির অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ফররুখ আহমদের অনুবাদের মতো এতটা জনপ্রিয়তা আর কারো ভাষান্তরই লাভ করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বাসে জোর না বাঁধলে বাক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না; আদর্শবাদী ও জীবনশিল্পী কবি ইকবালের বিশ্বাস ছিল গভীর ও অনমনীয় এবং তা–ই তাঁর কবিতা বাক্যবন্ধনের দৃঢ়তায়, রূপে–রঙে, মনোহর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইকবালের কাব্যাদর্শের অনুরাগী ও অনুবর্তী ফররুখ আহমদেরও বিশ্বাস ছিল সুগভীর, তিনিও ছিলেন আদর্শবোধে উজ্জীবিত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। এই প্রত্যয়ের পরিচয় তাঁর মৌলিক রচনায় যেমন, তেমনি অনুবাদেও দৃঢ় বাক্যবন্ধনের রূপে, উপমা–চিত্রকল্পের মনোহারিতায় আকর্ষণীয় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ অনূদিত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেও উপলব্ধি করা যাবে যে, ইকবালের কবিতা ভাবের সঙ্গে মনোহর রূপের সমন্বয়েই মহৎ এবং মাধুর্যময়। তাঁর বিশিষ্ট জীবন–দর্শন যেমন কবিতাকে সারবান করেছে, তেমনি তাঁর ব্যাপক জীবনদৃষ্টি ও দুর্লভ সৃজনক্ষমতা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের আভা। ইকবাল–কাব্যের সৌন্দর্য–মহিমা শুধু এর বহিরঙ্গেই বিদ্যুতের মতো ঝলসিত নয়, এর অন্তঃপ্রবাহেও বিচ্ছুরিত। ইকবাল কাব্য পাঠে–এই অনুবাদেও পাঠক যে উপঢৌকন পাবেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে ইকবাল–কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে হয়, "কবি ইকবালের কাব্য কাননে বিচরণ করলে সৌরভি কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামল মেলে আছে অগণ্য মনোহর বীথি, আহবান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গি, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে, তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্তচারী।"––(সাম্প্রতিক পৃঃ ১২৯) *[সংকলিত]*

প্রকৃতির উপর মানব আধিপত্য ঃ ইকবাল দর্শন

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

কুরআনের মর্মানুসারে তা স্বয়ং যেমন মানবকুলের জন্য একটি আসমানী কিতাব, গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিও তেমনি অপর একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ। কুরআন পাঠ ও তার মর্ম অনুধাবন করা যেমন ইবাদতের কাজ, বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা ও তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করাও তেমনি ইবাদতের শামিল। অন্য কথায়, বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-সমাজ হলো কুরআনে বর্ণিত হাকিকতগুলোর প্রণিধান ক্ষেত্র।

আল্লাহ্ তা'য়ালার দু'টি দিক আছেঃ *'জাহির'* অর্থাৎ বাহ্য, অপরটি *'বাতিন'* অর্থাৎআভ্যন্তরীণ। জাহিরী দিকের সূত্র ধরেই মানুষ তাঁর বাতিনী রূপের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এ বিশ্বজোড়া প্রকৃতি আল্লাহ্‌র বাহ্যরূপ। তাই প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা মানে আল্লাহ্‌রই সাথে সংযোগ স্থাপন করা। আল্লাহ্ তা'য়ালার চোখে তারাই জ্ঞানী, যারা প্রকৃতি নিয়ে ধ্যান করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বশীভূত করে তা মানব কল্যাণে নিয়োজিত করে। কারণ, তারাই বিশাল প্রকৃতির শক্তির আলোকে তাদের সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে গভীরভাবে চিনতে পারে। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছেঃ

"আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে। এরা উঠতে, বসতে ও শুইতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। এরা আসমান-যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে ধ্যান করে এবং তাদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে কৃতজ্ঞতা ভরে বলে উঠেঃ ''হে আল্লাহ্! এ জগত তোমার উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি, তুমি এ সকল অনর্থক সৃষ্টি করনি।" (আল-কুরআন)

ইকবালের নিকট মানুষের শিক্ষা ক্ষেত্র এতটা প্রশস্ত, যতটা এ বিশ্ব-প্রকৃতি। তিনি মনে করেন, মানুষের মধ্যে বহুমুখী ও সীমাহীন সম্ভাবনা লুকানো রয়েছে। তাদের বিকাশ নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে করতলগত করার উপর! এ জগতে মানুষ আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রতিনিধি। তাই, তাকে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে আপন সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করতে হবে; গোটা দুনিয়ার উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করতে হবেঃ

পাহাড়, মরু, ময়দান, নদ-নদী-

গোটা জল-স্থল জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্র।

তাই আধিপত্য স্থাপন কর প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর,

তবেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে তোমার বহুমুখী প্রতিভা।
মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি;
তাই তারই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে সারা বিশ্বে।

মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি, তাঁর একমাত্র খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। সুতরাং তাকেই আল্লাহ্‌র গুণে সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিনিধিত্বের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর বাণী *'আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও'* মানব সমাজকে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হবার প্রেরণা দিয়েছে। মানুষ যতই আল্লাহ্‌র গুণে সমৃদ্ধ হবে, ততই সে খিলাফতের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে। আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম *'ছামাদ'* অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি পরমুখাপেক্ষী নন। তাই তাঁর সত্যিকার বান্দাও একমাত্র আল্লাহ্‌রই সামনে মাথানত করতে পারে। সে প্রকৃতি বা জগতের অন্য কোন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে পারে না, তার পূজা–অর্চনাও করতে পারে না। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জাতি প্রকৃতির বড় বড় শক্তির কাছে হার মেনে তাদের পূজা করেছে। এখনও কোন কোন জাতি প্রকৃতিকে দেব–দেবী মনে করে তার উপাসনা করে থাকে। কুরআন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলঃ *"আল্লাহ্ আকাশ–যমীনের সব কিছু তোমাদের ক্ষমতাধীন করে রেখেছেন।"* তাই আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দা ও মুমিন প্রকৃতির কাছে হার মানতে পারে না। কারণ, এসব মানুষেরই দাস। তারই আদেশে এসব মাথা নুঁইয়ে সেবা করবে। ইকবাল বলেনঃ

আকাশের নিশ্চল ও গতিশীল
সব কিছুই ছিল
প্রাচীন জাতিসমূহের প্রভু,
হে মানব! এ সব তোমারই দাস,
তোমারই পরিচারক ও আজ্ঞাবাহক।

ইকবালের নিকট মুমিন আর কাফের–এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের বিশ্বসত্তার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে বিশ্ব প্রকৃতির নিকট পরাজয়বরণ করে। পক্ষান্তরে মুমিন আপন *'খুদী'* (ব্যক্তিত্ব)–এর বলে বিশ্বকে আপন কবলে নিয়ে আসে। তাকে আপন ইচ্ছার ছাঁচে ঢেলে নেয়। যতই সে প্রকৃতিকে আপন মুঠোর ভেতর আনতে পারবে, ততই তার 'খুদী' বলিষ্ঠতা অর্জন করবে। ইকবালের ভাষায়ঃ *"কাফেরের চিহ্ন এই যে, সে নিজেকে বিশ্বের মাঝে হারিয়ে ফেলে, আর মুমিনের চিহ্ন এই যে, বিশ্বই তার মাঝে হারিয়ে যায়।"*

ইকবালের মতে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা কেবল সংকীর্ণ ধর্মীয় পার্থক্যই নয়; বরং তা হচ্ছে প্রধানত জগৎ ও জীবনের প্রতি মৌলিক চিন্তাধারা, জীবন-পদ্ধতি ও কৃষ্টিগত পার্থক্য। মুমিন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব কায়েম করার জন্য বিশ্ব প্রকৃতির উপর বিজয় অর্জন করে এবং তাকে আপন অভিলাষ অনুযায়ী সাজিয়ে তোলে, কিন্তু কাফের তাকে ভয় করে এবং তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন যে, তাকদীরের অধীন মুসলমান কাফেরের পর্যায়ে পড়ে। সত্যিকার মুমিন আপন তাকদীর (অদৃষ্ট) নিজেই সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনের তাকদীর রচনার কাজ মুমিনের উপরই ন্যস্ত করেন। তাকদীর নির্বাচনের পূর্বেই তাকে জিজ্ঞেস করে নেয়া হয়–কিরূপ হওয়া চাই তোমার তাকদীর?

কাফেরমনা মুসলমানই তাকদীরের অধীন হয়;
মুমিন স্বয়ং খোদা–কল্পিত তাকদীরে রূপদান করে।
আপন ব্যক্তিত্বকে সে এত বলিষ্ঠ করে নেয় যে,
তাকদীর রচনার পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে জিজ্ঞেস করেনঃ
বল! তুমি কি চাও?

মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)–কে ফেরেশতাকুল সেজদা করেছিলেন কেন? কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব? তিনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুর হাকিকত উপলব্ধি করেছিলেন যা ফেরেশতাগণ পারেননি। এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

কুরআনে আছেঃ *"আদম (আঃ)–কে আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত বস্তুর হাকিকত শিখিয়েছিলেন।"*

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ আদম (আঃ)–এর সন্তান। তাই বলে কি প্রত্যেক মানুষই উত্তরাধিকার সূত্রে সেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে? তা কখনও নয়। বনী আদমের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে জগৎ ও জীবনের হাকিকত অনুসন্ধান ও তার অবগতির উপর। ইকবাল দর্শন ও ইকবাল সাহিত্যের অপর নাম মানব মহত্ত্বের জয়গান। তিনি মনে করেন, মানুষের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। মানুষ যদি আপন *'খুদী'* (আত্মা)–কে বলিষ্ঠ করে নিতে পারে, তা হলে প্রকৃতি কেন, প্রকৃতির স্রষ্টাকেও সে আপন আয়ত্তে আনতে পারেঃ

আকাশ, যমীন, আরশ, কুর্সী তথা আল্লাহ্‌র সমগ্র রাজ্য খুদীর মুঠোর ভেতর।

ইকবাল দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যে আত্মবিকাশ ও আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। তা কখনও বা আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, আবার কখনও বা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য আপন পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামের মাঝেই সে আপন সুপ্ত ক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করে তুলছে। এমনি করে সে আপন স্রষ্টার মহিমা বিস্তার করে যাচ্ছে এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে আপন রূহকে বলিষ্ঠ করে তুলছে। ইকবাল বলেনঃ *'প্রত্যেক বস্তু আত্মবিকাশের উল্লাসে বিভোর।'*

প্রত্যেক অণু আল্লাহর মহত্ত্ব গুণে সমৃদ্ধ হবার জন্য মাতোয়ারা। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু কিভাবে চতুষ্পার্শ্বের বস্তুগুলোকে আত্মস্থ করার জন্য আকর্ষণ করছে, তা ইকবাল এক কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেনঃ

আমি ফুলকে বললামঃ হে বক্ষ বিদারিত ফুল!
বল–কিভাবে তুমি টেনে নাও রং ও গন্ধকে
মাটি ও বাতাস থেকে?
ফুল উত্তর দিলোঃ হে জ্ঞানহারা জ্ঞানী!
তুমি যেমন পেয়ে থাক খবর
নিস্তব্ধবিজলী থেকে।
আমাদের জৈবিক প্রাণ এদিক সেদিকের আকর্ষণেরই ফল;
তোমার আকর্ষণ প্রকাশ্য, আর আমার আকর্ষণ অপ্রকাশ্য।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এ আকর্ষণী ক্ষমতা থাকলেও মানুষের মাঝে তা আছে সবচেয়ে বেশী। তাই সে প্রাকৃতিক শক্তিকে কবলিত করে এবং তাকে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগায়। প্রকৃতি যেন কোন অবস্থাতেই মানুষের উপর অধিনায়কত্ব না করতে পারে, সে জন্য ইকবাল মানুষকে সজাগ করে দিচ্ছেন এবং প্রকৃতির আধিপত্যমূলক যে–কোন পদক্ষেপের পূর্বেই তার উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তারের পরামর্শ দিচ্ছেনঃ

প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠ;
নইলে সে গ্রাস করবে তোমায়,
যেমন শরাবকে গ্রাস করে সোরাহী।

ইকবালের মতে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য মানুষের কায়া ও মন প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। কিন্তু মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রকৃতি কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিকাশের ক্ষমতা থাকলেও সে নিজকে নিজে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পরিপক্ক করে তুলতে পারে না। তার মধ্যে কিছু না কিছু শূন্যতা থেকেই যায়। মানুষের সৃজনীশক্তি সেটা দূর করে তাকে আপন সাধের মাধুরী দিয়ে মনঃপূত করে তোলে। ইকবাল বলেনঃ

অবশ্য প্রকৃতি আত্মবিকাশ–প্রেরণা থেকে বঞ্চিত নয়;
তথাপি যেটুকু তার পক্ষে সম্ভব হয়নি;
তা তুমি পুরো করে দাও।

যে প্রকৃতি মানুষের সৃজনীশক্তি না হলে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, সে আবার কখনো কখনো বাধা–বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় মানুষের আত্মবিকাশের পথে। অন্তরায় সৃষ্টি করে তার মনজিলে

মন্‌জিলে। কিন্তু বলিষ্ঠ *'খুদী'* তার কাছে হার মানে না। সে প্রকৃতির বাধা-বিপত্তিকে জয় করেইচলে।

প্রকৃতিকে জয় করতে হলে বুঝে নিতে হবে তার বিধানসমূহকে। খতিয়ে দেখতে হবে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে। দূর থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করলে বা তাকে পূজা করলে সে নুয়ে পড়বে না। চিরে দেখতে হবে তার অন্তরকে, দেখতে হবে তার শক্তির উৎসকে। লড়াই করে যেতে হবে তার সাথে অনবরত। তবেই তার রহস্য ভেসে উঠবে মানুষের নজরে। সে আত্মসমর্পণ করবে মানুষের সামনে। এ জন্য দরকার কঠিন সাধনার। দরকার চেষ্টা ও শারীরিক পরিশ্রমের। ইকবালের ভাষায়ঃ

চেষ্টা কর, প্রতিষ্ঠিত কর আপন উদ্দেশ্য;

জয় কর জগত ও জীবন।

প্রকৃতির সাধারণ বাধা-বিঘ্নকে চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা জয় করা যায়। কিন্তু তার কঠিন ও জটিল অন্তরায়কে পদানত করতে হলে কায়িক মেহনতের পেছনে 'আক্‌ল' (বুদ্ধিমত্তা)-এর সক্রিয় সহায়তা অপরিহার্য। আক্‌ল অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান জড় জগতের ধর্ম ও গুরুত্ব নিরূপণ করে। কোন শক্তিকে আয়ত্তে আনা যায় না, যতক্ষণ না তার প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছা যায়। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে ঘোষণা করছেঃ *"যে ব্যক্তি হিক্‌মত (জ্ঞান)-প্রাপ্ত, সে প্রাচুর্যময় মঙ্গলের অধিকারী।"* তাই, ইকবাল আমাদেরকে বুদ্ধিমত্তা বলে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির উপর হুকুমত কায়েম করতে উৎসাহিত করেছেন। দেশে দেশে গিয়ে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আকাশ ও যমীনের রহস্য উদঘাটন করে

আক্‌ল বশীভূত করে চতুর প্রকৃতিকে।

আগুনের তৈরী শয়তানও নুয়ে পড়ে

মাটির মানুষের কাছে, এর বদৌলতে।

আল্লাহ্ হিকমতকে 'প্রাচুর্যময় মঙ্গল' আখ্যা দিয়েছেন;

তাই যেখানেই তা খুঁজে পাও, গ্রহণ কর।

জীবনের পূর্ণতা যদি চাও,

চোখখুলতেশেখ।

আত্মকেন্দ্রিক হবে না কখনো;

গ্রাস কর বিশ্বকে পানির ন্যায়;

বের করতে শেখ আসমান-যমীনের রহস্য।

আধ্যাত্মিক শক্তিবলেও মানুষ প্রকৃতির উপর হুকুমত কায়েম করতে পারে। শুধু কায়িক মেহনত বা আক্‌ল দ্বারা এ মহৎ শক্তি অর্জিত হয় না। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি। এটা লাভ করা যায় *'ইশ্‌ক'*-এরমাধ্যমে। ইকবাল-সাহিত্যে *'ইশ্‌ক'* বলতে বুঝায় লক্ষ্যে পৌছার প্রেরণাকে, কর্ম ও সৃজনের উদ্দীপনাকে। এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলে মানুষের আত্মা হয়ে উঠে অসাধারণভাবে বলীয়ান ও বলিষ্ঠ। এ অদম্য স্পৃহা উপেক্ষা করে চলে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন। এ রূহানী শক্তি মানুষকে করে তোলে নির্ভীক, দুঃসাহসী ও অপরিসীম শক্তির অধিকারী।

'ইশ্‌ক' ছাড়া আক্‌ল কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আক্‌ল অবশ্য *ইশ্‌কের* সহায়তা করে। কিন্তু ইশ্‌ক কোন সময় আক্‌লের অপেক্ষা করে না। ইশ্‌ক-এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানুষ আপন লক্ষ্যবস্তুর উপর দ্বিধাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমন পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের উপর। কাফের ভরসা করে সম্পূর্ণরূপে জড় শক্তির উপর। কিন্তু আল্লাহ্ প্রেমে উদ্বুদ্ধ মুমিন ভরসা করে প্রধানত আধ্যাত্মিক শক্তির উপর। কাফের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভরসা করে যুদ্ধাস্ত্রের উপর। কিন্তু মরদে মুমিন ভরসা রাখে আল্লাহ্‌র শক্তির উপর। সে যথাসম্ভব আপন চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়, কিন্তু ফলাফলের আশা রাখে আল্লাহ্‌র নিকট। সে আপন অস্ত্রশস্ত্রের দীনতা ও হীনতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য লড়ে যায় দুশমনের সাথে। এ মনোবলই

কাফের তরবারীর উপর ভরসা করে;
মুমিন-সৈনিক তরবারী ছাড়াও লড়ে যায়।

'ইশ্‌ক' পূর্ণতা লাভ করলে মানুষের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিণত হয়। সে অসাধ্য সাধন করে। কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে চলে যায়। প্রাকৃতিক শক্তি তার কাছে হার মানে। নবীগণ এ ক্ষমতার অধিকারী হয়েই অলৌকিক কাজ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ ক্ষমতাবলেই হাতের ইঙ্গিতে চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছেন। ওলীগণ যে শক্তিবলে অতি প্রাকৃতিক কাজ করে থাকেন, সে রহস্য *'ইশ্‌ক'* ছাড়া আর কিছুই নয়ঃ

ইশ্‌ক দ্বারা আত্মা বলিষ্ঠ হলে
সে শক্তি হুকুমত করে সারা বিশ্বের উপর।
শক্তিশালী আত্মার হাত আল্লাহ্‌র হাতে পরিণত হয়;
তার ইঙ্গিতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়।

ইশ্‌ক মানুষকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করে। এ প্রেরণাবলেই মানুষ প্রকৃতির অনেক রহস্য আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এখনো অনেক কিছু আবিষ্কারের বাকী রয়েছে। আমরা যে-সব নক্ষত্র

দেখতে পাই, তার ওপারে কত যে জগৎ রয়েছে, তা কে জানে? এ শূন্য জগৎ জীবনশূন্য নয়। এখানে রয়েছে আরও কত কাফেলা! একমাত্র 'ইশ্‌ক'-এর পক্ষেই এর রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভবঃ

নক্ষত্ররাজির ওপারে আরও অনেক জগৎ রয়েছে;
এখনো ইশ্‌কের পরীক্ষা অনেক বাকী রয়েছে।
এসব শূন্য জগত জীবনশূন্য নয়।
ওখানে রয়েছে আরও কত শত শত কাফেলা।

ইকবালের মতে, মানুষের পরম ও চরম লক্ষ্য হলো আল্লার সান্নিধ্য। ইশ্‌ক দ্বারাই সে লক্ষ্য অর্জন করা যায়। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছেনঃ

আমার ইশ্‌কের কাছে জিব্রাইল একটি দুর্বল শিকার;
হে বীরোচিত সাহস! আল্লাহ্‌কে আপন মুঠোর ভেতর নিয়ে এস।
মাওলানা রুমী বলেছেনঃ
আমার মনোরাজ্যে ওরাই বীর পুরুষ,
যারা ফেরেশ্‌তা ও নবীকে শিকারে পরিণত করে;
আল্লাহ্‌কে আপন মুঠোর ভেতর নিয়ে আসে।

ইকবাল মানব জাতিকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে শক্তি আহরণ করে প্রকৃতির রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করার প্রতি আহবান করেছেন। কিন্তু এ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়; কোন ব্যক্তি বা জাতির ক্ষতি সাধন করার জন্যও নয়; বরং তা মানব কল্যাণের জন্য; আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য। *'মরদে-মুমিন'* আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্যই দুনিয়ার সব কাজ করে থাকে। সে আপন জীবন-মরণ আল্লাহ্‌র জন্যই উৎসর্গ করে। প্রত্যেক কাজের মাধ্যমে সে আপন স্রষ্টার মহিমা বিস্তার করে। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ডাকেই সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে। এখানেই মুমিন ও কাফেরের পার্থক্যঃ

প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভই তোমার উদ্দেশ্য হউক!
তোমার হাতে তাঁর মহিমা বিকশিত হউক।

ইকবালের পয়গাম

গোলাম মোস্তফা

কবিরা শুধু স্রষ্টাই নন--দ্রষ্টাও। অনাগত যুগের পদধ্বনি তাঁরা শুনতে পান। জাতি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কবি আসে নকীবের বেশে-মুয়াজ্জিনের বেশে-আলোকের আজান দিতে-কওমের ঘুমন্ত আত্মায় আগুন ধরাতে-কণ্ঠে ভাষা দিতে-বাজুতে কুয়ৎ দিতে-চোখে নব নব আশার স্বপ্ন দিতে। কবির কাব্যে থাকে কওমের আযাদীর ইশারা-তার উজ্জ্বল ভবিষ্যর্তের ইঙ্গিত। যুগে যুগে নবীরা যে-কাজ করে যান ধর্মের দিক দিয়ে, কবিরা করে যান তা-ই তাহজীব-তমদ্দুনের দিক দিয়ে-জাতির স্বপ্ন-সাধ ও আশা-আকাঙক্ষার দিক দিয়ে। সত্যিকার কবি তাই যুগস্রষ্টা। এঁদের কাব্যে ও গানে যমানার মোড় ফিরে যায়।

আল্লামা ইকবাল যুগের তেমনি একজন কবি। একটা নতুন যুগের তিনি স্রষ্টা-একটা নতুন রাষ্ট্রের তিনি রূপকার। পাক-ভারতীয় মুসলমানদের নিদমহলার তিনি মুয়াজ্জিন। তাঁর জ্যোতির্ময়ী বাণী মুসলিম জাহানে এনেছে নতুন জীবন-নতুন জাগরণ।

কবির কণ্ঠ আজ নীরব, কিন্তু আমাদের কণ্ঠ আজ মুখর। ইকবাল আজ নেই, কিন্তু তাঁর বাণী-তাঁর সুর ঝংকৃত হচ্ছে আজও আমাদের প্রাণে। যে বাণী- যে গান থেমে যাবার পরেও শোনা যায়, তা-ই তো শাশ্বত। ইকবাল সেই শ্রেণীর কবি। তাঁর বাণী-তাঁর সুর-চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের মর্যাদা পেয়েছে। ইকবালের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর কাব্য তাঁকে দিয়ে গেছে অমরতার স্বাক্ষর।

কবি ইকবাল যে চিরদিনের কবি-একটা তরল স্বপ্ন-বিলাস নিয়ে যে তিনি আসেননি, একথা তিনি গর্বের সঙ্গেই বলে গেছেন। সে ঘোষণা আত্মপ্রত্যয়ের আলোকে সমুজ্জ্বল। '*আসরারে খুদী*'তে তিনি বলেছেনঃ

" I have no need of the ear of to-day
I am the voice of the poet of to-morrow
My own age does not understand my deep meaning

My Joseph is not for this market....
My song is of another world than theirs
This bell calls other travellers to take the road."

অর্থাৎ,

আজকের শ্রোতা আমি চাই না
আমি আগামী দিনের কবি।
আমার নিজের যমানা আমার গূঢ় কথা বুঝবে না,
আমার ইউসুফ এই বাজারের জন্য নয়,
আমার গান স্বতন্ত্র এক জগতের,
আমার ঘন্টাধ্বনি অন্য পথিকদের ডাকে।

ইকবালের এই সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। ইকবালের মৃত্যুর পর আজ আবার তাঁর নবজন্ম হয়েছে আমাদের মধ্যে। তাঁর ঘন্টাধ্বনি থেমে যাবার পর আজ যে দলে দলে তরুণ কাফেলারা তাঁরই নির্দেশিত পথ বেয়ে চলেছে, এ-ই তো তাঁর বাণীর সত্যতার প্রমাণ।

ইকবাল যে শুধু কবিই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যুগের একজন মস্ত বড় দার্শনিক। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ইউরোপের প্লেটো, এরিস্টটল, হেগেল, নীচে, বার্গসঁ প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ পড়ে পড়ে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁদের চোখ দিয়ে আমরা এতদিন আমাদের জীবন ও জগতকে দেখেছি আর ভেবেছি, আমাদের বুঝি নিজস্ব কোন দর্শনই নেই। ইকবাল সেই দৈন্য আমাদের ঘুচিয়েছেন–ইসলামের জীবনদর্শনকে তিনি দিয়েছেন এক অভিনব রূপ। ইকবাল–কাব্যে তাই পাওয়া যায় ইসলামের অন্তর্মূর্তির সাচ্চা পরিচয়।

ইকবাল দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে 'খুদী'–যাকে বলা যেতে পারে আত্মা, *Ego* বা *Soul,* খুদীর জাগরণই হল ইকবালের প্রধান পয়গাম। তিনি বলেন, প্রত্যেক জীবের *(living organism)* মধ্যেই আছে এই আত্মশক্তি বিকাশের প্রতিশ্রুতি। সব–কিছুরই বেঁচে থাকা নির্ভর করে এই আত্মশক্তির উপলব্ধির উপর। সবল–দুর্বল বা ছোট–বড়র তারতম্যও আসছে এই আত্মশক্তির তারতম্য থেকে। আত্মশক্তি বা ব্যক্তিত্ব *(individuality or personality)* যার যত বলিষ্ঠ, সে তত বড়। কুল্–মাখলুকের মূলে আছে এই ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্য। সমগ্র সৃষ্টি তাই এই খন্ড খন্ড '*খুদীর*'ই বিরাট সমষ্টি। একটা বিরাট ইমারতের মাঝে তার প্রত্যেকটি ইট যেমন, গোটা মানব সমাজের কাছে প্রতিটি ব্যক্তি ঠিক তেমন। প্রতিটি ইট মজবুত হ'লে যেমন ইমারতটিও মজবুত হয়, প্রতিটি ব্যক্তি সবল ও সক্ষম হলে গোটা মানব–সমাজও হয় তেমনি সার্থক ও সুন্দর। হিমালয় পাহাড় আর ধূলিকণা একই উপাদানে গঠিত, কিন্তু বিরাট শক্তি

সঞ্চয় করে হিমালয় হয়েছে দুর্লংঘ্য ও শক্তিমান, আর পথের ধূলিকণা সেই শক্তির সাধনা করেনি বলে হয়েছে চির-দুর্বল। সাগর তাদের অনায়াসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারা কাঁদে আর বলেঃ দেখ দেখ, স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল! ভিতর থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার কাছে তার পারিপার্শ্বিক সব-কিছু নতিস্বীকার করে। চাঁদের চেয়ে পৃথিবী শক্তিমান ও আত্মস্থ। তাই চাঁদ অনুগত ভৃত্যের মত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ তাকেই করে পরিক্রমণ। এ সম্বন্ধে ইকবাল কি সুন্দরই বলেছেনঃ

"When the mountain loses its self
It turns into sands
And complains that the sea surges over it;
Because the earth is firmly based on itself
The captive moon goes round it perpetually.
The being of the sun is stronger than that of the earth
Therefore is the earth fascinated by the sun's eye."

অর্থাৎ ঃ

পর্বত যখন ব্যক্তিত্বকে হারায়,
তখন সে ধূলিতে পরিণত হয়
এবং সাগর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
পৃথিবী আত্মশক্তিতে অধিষ্ঠিত
কাজেই বন্দী চাঁদ চিরকাল তারি চারিপাশে ঘোরে।
পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অধিকতর বলবান-
তাইত পৃথিবী সূর্যের দৃষ্টিতে সম্মোহিত।

বস্তুত, ইকবালের মতে খুদীই হল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সারবস্তু, বাদবাকী সব অসার। যার খুদী নেই, তার কিছুই নেই। খুদীর শক্তি ও সম্পদেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। অন্য কথায়ঃ খুদীর পরিপুষ্টিই হল জীবন বিকাশের একমাত্র উপায়।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করার মত। পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্য দর্শন এতকাল এ কথাই ঘোষণা করে এসেছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ বস্তু, আর সব অসৎ বা অনিত্য। বিশ্বের সব-কিছুই মায়া বা মরীচিকা; এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মানুষের আত্মারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা

নেই–পরমাত্মারই সে অংশবিশেষ; সেই পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়াই হল মানব জীবনের একমাত্র পরিণতি। অন্য কথায় ঃ অদ্বৈতবাদ *(Pantheism)* বা "এক মাবা দ্বিতীয়াম'–ই হ'ল একমাত্র দার্শনিক সত্য। প্লেটো, এরিস্টটল,ক্যান্ট বা হেগেল–এঁরা কেউ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেননি; বস্তুজগতেরও কোন সত্তা আছে বলে তাঁরা মনে করেননি। বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপই *(noumena)* হল তাঁদের মতে আসল সত্য। তাঁদের কাছে বস্তুজগৎ ভাবজগতেরই ছায়াবিশেষ। আসল সত্য হল Idea-বস্তু নয়। আত্মার স্বাতন্ত্র্য তাই তারা কেউ মানেন না। কিন্তু ইকবাল এই প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতও মিথ্যা নয়; যা আমরা দেখছি তাও সত্য। এর মূলে আছে–প্রাণ–শক্তিরই লীলা–খেলা। জগৎ যে আছে–একথা কেমন করে আমরা অস্বীকার করবো! সৃষ্টি মিথ্যা নয়, স্বপ্নও নয়। অবশ্য, এই পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতই একমাত্র সত্য নয়; এর অতীতেও আর এক অদৃশ্য লোক *(the great unseen)* আছে। সে সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে, আর মানতে হবে যে, দুটোই সত্য। বস্তুজগতের সত্যকে জানা যায় জ্ঞান ও চিন্তা দিয়ে, আর অদৃশ্য লোকের সত্যকে জানতে হয় অনুভূতি বা *Intuition* দিয়ে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য দর্শন যেখানে নেতিমূলক, ইকবাল–দর্শন সেখানে হাস্তিমূলক। অন্যান্য দর্শনে যেখানে আছে জীবনের অস্বীকার *(nagation of life)* অর্থাৎ, ভগবানের মধ্যে লয়প্রাপ্তি, ইকবাল সেখানে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ঃ *'আমি আছি'*–এই তেজোদৃপ্ত বাণী। তিনি বলেনঃ বিশ্ব–সত্তার ভিতরে নিজকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যে মানুষের জয়–গৌরব নেই; অনন্তকাল বেঁচে থাকার মধ্যেই আছে জীবনের আকর্ষণ ও সার্থকতা। একথা কুরআনের সত্যের বাইরে নয়। পুণ্যবানেরা যে অনন্তকাল বেহেশ্‌তে বাস করবে, এ–ই আল্লার বাণী। ইকবালের দর্শন তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার দর্শন। এ জগতে *'খুদী'* ছাড়া তিনি আর কিছুর মূল্যই দেননি। তিনি বলছেন ঃ

"Thou alone art the Reality in this Universe,

All the rest is a mirage"

অর্থাৎ ঃ

একমাত্র তুমিই সত্য আর সব মিথ্যা।

এই খুদীর উপলব্ধি যার যত বেশী হয়েছে, জীবনের মূল্য ও মান তার তত বেশীঃ

" Only that truly exists which can say 'I am'

It is the degree of the intuition of " I-am-ness"

That determines the place of a thing in the scale of being."

অর্থাৎ ঃ সেই সত্যিকারভাবে বেঁচে থাকে যে বলতে পারে *'আমিআছি'।*

এই *'আমি আছি'* চেতনার কম-বেশীতেই প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব পরিমিত হয়।

এই খুদীকে কি করে শক্তিসম্পন্ন করা যায়? ইকবালের মতে নব নব আশা ও আকাঙক্ষা *(desires)*-ই হল খুদীর খোরাক। আকাঙক্ষার মধ্যেই খুদী বেঁচে থাকে। যার আকাঙক্ষা নেই, তার খুদীও নেই। আকাঙক্ষা হল জীবন-সমূদ্রে তরঙ্গবিশেষ। গর্জন থেমে গেলে সমুদ্র হয় নীরব-নিস্তব্ধ একটা হ্রদের মত। সে হয় তখন শক্তিহীন -

" Desire keeps the self in perpetual uproar
It is a restless wave of the self's sea
Negation of desire is death to the living
Even as absence of heat extinguishes the flame."

অর্থাৎ ঃ আকাঙক্ষাই জীবনকে চির-চঞ্চল করে রাখে-

জীবন-সমুদ্রে আকাঙক্ষা তরঙ্গবিশেষ

আকাঙক্ষার নিবৃত্তিই হ'ল জীবনের অবসান-

উত্তাপ না থাকলে অগ্নিশিখা যেমন মরে যায়।

বাঁচবার উদগ্র কামনা (will to live) অথবা একটা প্রাণচাঞ্চল্য (State of tension)-ই হল ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অবলম্বন।

অবশ্য এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ নয়। একটা নৈতিক নিয়ম-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতার আওতায় ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। এর জন্য চাই নিয়মানুবর্তিতা। এ সম্বন্ধে কবির যুক্তি অতি চমৎকার। ফুলের সুরভি ফুলের পাপড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; কস্তুরীর সুন্দর খুশবুর জন্য দরকার হয় একটা মৃগনাভির আধারের। মুক্তি তাই নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ। এ সম্বন্ধে ইকবাল বলছেন ঃ

"Endeavour to obey, O heedless one,
Liberty is the fruit of compulsion."

অর্থাৎ ঃ

ওরে বেখেয়াল, নিয়ম মেনে চল

আযাদী নিয়মানুবর্তিতারই সুফল।

নিয়মানুবর্তিতার পরে আসে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা। অপরের অন্ধ অনুকরণ করলে ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা পড়ে। ক্রীতদাসের তাই কোন ব্যক্তিত্ব নেইঃ

"I will tell you a subtle point, bright as a pearl,

That you may distinguish between the salve and the free

The slave is by nature repetitive

His experiences are bereft of orginality

The free man is always busily creative."

অর্থাৎঃ

আমি তোমাকে একটা মূল্যবান কথা বল্‌ব-

যাতে তুমি ক্রীতদাস এবং স্বাধীন মানুষের তফাৎ বুঝবে।

ক্রীতদাস স্বভাবতই অনুকরণকারী

তার অভিজ্ঞতায় কোন স্বকীয়তা নেই

যারা স্বাধীন – তারা চিরদিনই সৃষ্টিধর্মী।

ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চরম পরিণতি কোথায়? ব্যক্তিত্ব বা খুদীর শক্তি জাগরিত হলে আমাদের লাভ কি? ইকবাল বলেনঃ খুদীর শক্তি জাগরিত হলে আমরা মানবজীবনের চরম কাম্য আল্লাহর খেলাফত লাভ করতে পারি। আল্লাহর খলীফা (Vicegerent of God) হওয়াই আমদের জীবনের চরম কাম্য ঃ

"It is sweet to be God's Vicegerent in this world."

কিন্তু যে- সে মানুষই তো আর আল্লাহর খলীফা হতে পারে না। মানুষের ভিতর শয়তানওত আছে। এই জন্যই প্রয়োজন হয় নিয়ম-নিষ্ঠার। শ্রেষ্ঠ নিয়ম-কানুন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তরীকা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল্‌লে লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের ভুল হবে না।

আল্লাহর খলীফা হতে হলে আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হয়। তাঁর গুণাবলীর অনুকরণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ তাই বলেছেনঃ 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর গুণাবলী অনুসরণ কর। অতি সত্য কথা। ধ্রুবের নৈকট্য লাভ শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। কাজেই যে যতখানি আল্লার নৈকট্য লাভ করবে, সে হবে ততখানি শ্রেষ্ঠ।

এখানে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে গিয়ে আল্লাহতে বিলীন হয়ে গেলে চলবে না। সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যই হল ইকবাল–দর্শনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহকে ভালবেসেই আল্লাহর কাছে ছুটে যাব, তাঁর কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করবো, কিন্তু সেখানে থাকবো না, শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মধ্যে ফিরে আসব – এ–ই হল ইকবালের কথা।

" Abandon self and flee to God,

Strengthened by God, return to thyself."

অর্থাৎ ঃ

নিজকে ফেলে আল্লাহর কাছে ছুটে যাও

আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আবার নিজের কাছে ফিরে এস।

ইকবাল এখানে প্রচলিত সূফী–মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। অলস খোদাপ্রেম তাঁর কাম্য নয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর ফিরে আসবার দৃষ্টান্ত মিলে রাসূলুল্লাহর মি'রাজের মধ্যে। আল্লাহ্ তা'য়ালার চরম নৈকট্য লাভ করেও তিনি আবার ফিরে এলেন দুনিয়ায়, আর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্বিগুণ উদ্যমে জীবন–সংগ্রামে। সমস্ত শক্তির উৎস–মুখ হচ্ছেন আল্লাহ্, কাজেই তাঁর সঙ্গে রাখতে হবে আমাদের নিবিড় যোগ। পক্ষান্তরে ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্যও আমাদের চাই, আল্লাহকে মানতেও হবে, আবার নিজের স্বাধীন সত্তাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তক্‌দীর ও তদ্‌বীরের চমৎকার সমাধান হয়েছে এখানে।

গ্রীক ও খৃষ্টান দর্শন ভারতীয় দর্শনের মতই সন্ন্যাসবাদের সমর্থক। দেহ বা জগতের কথা এরা ভাবেনি; অধ্যাত্ম–জগতের কথাই ভেবেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে ইউরোপ ঘোর জড়বাদী সেজেছে। হেগেলের দর্শনকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে কার্লমার্কস্ নিয়ে এসেছেন এক নতুন জীবন–দর্শন। হেগেলের মতে আত্মাই একমাত্র সত্য, বস্তু কিছুই নয়, কিন্তু মার্কসের মতে বস্তুই হ'ল একমাত্র সত্য, আইডিয়া বা আত্মা কিছু নয়, বস্তু জগতেরই ছায়া বিশেষ। জড় থেকেই চৈতন্য জন্মে, চৈতন্য থেকে জড় নয়। এই দর্শনের নামই হল 'Dialectic materialism' বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

বলা বাহুল্য, হেগেল এবং কার্লমার্কস উভয়ের দর্শনই এক–প্রান্তিক। একজন শুধু আইডিয়াকেই সত্য বললেন, আর একজন শুধু বস্তুকেই সত্য বললেন।

ইকবালের দর্শন ভিন্নরূপ। তিনি বস্তু এবং চৈতন্য (Matter and Spirit) দুইকেই সত্য বলেন। চৈতন্যবাদীদের মত তিনি সন্ন্যাসও মানেন না, আবার জড়বাদীদের মত নিছক জড়বাদকেও

স্বীকার করেন না। তাঁর দর্শন হল দু'য়ের সংমিশ্রণ। তিনি বলেন, বস্তুজগৎ মিথ্যা নয়; তবে পূর্ণ সত্য এর মধ্যে পাওয়া যাবে না, পূর্ণ সত্য পেতে হলে জড় এবং চৈতন্য দুটোকেই মানতে হবে।

বলা বাহুল্য, এ–মত সম্পূর্ণ ইস্‌লাম–সম্মত। ইসলাম দ্বন্দ্বমূলক (dialectic) ধর্ম। দুই বিপরীতের সমন্বয়ই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রতিদিন তো আল্লাহর কাছে এই মুনাজাত করি;

হে আল্লাহ্! ইহকালের এবং পরকালের যে কল্যাণ, তা–ই তুমি আমাদের দাও।

ইসলামের মূলনীতি বজায় রাখতে গিয়ে ইকবাল শুধু ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সমাজের কথাও ভেবেছেন। এককভাবে প্রতিটি মানুষ শক্তিশালী হলেই যে মানব–জাতির উন্নতি বা কল্যাণ হয়, তাও তো নয়। প্রতিটি মানুষের স্বয়ং–স্বাধীন ভাব বৃহত্তর মানব–সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে সে বাস করে। কাজেই সামাজিক সুখ–দুঃখ, সামাজিক বিপ্লব বা সামাজিক নীতি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা পথ চল্‌তে পারে না। সমাজের উপর সেও যেমন প্রতিক্রিয়া করে, তার উপর সমাজও তেমনি প্রতিক্রিয়া করে। কাজেই বলা যেতে পারে, মানুষের দ'ুটি সত্তা ঃ এক· তার ব্যক্তিসত্তা, দুই· তার সমাজ–সত্তা। সমাজজীবনের সঙ্গে তার ব্যক্তি–জীবন নিবিড় যোগসূত্রে বাঁধা। ব্যক্তি ও সমাজ তাই পরস্পরের আর্শিস্বরূপ। ইকবাল তাই শুধু ব্যক্তিত্বের কথাই বলেননি; ব্যক্তিত্ব লোপের কথাও বলেছেন। উৎকট ব্যক্তিত্বের বর্তমান সমাজতন্ত্র (Socialism) -এর যুগে অচল। তাই একদিকে যেমন তিনি *'আসরার–ই–খুদী'* (Secrets of the Self) লেখে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি *'রমুয–ই–বেখুদী'* (Mysteries of Selflessness) লিখে সমাজ–সচেতনতার প্রতিও জোর দিয়েছেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছেঃ ইকবাল কাব্যের মূল সুর হচ্ছে ঃ পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ববাদ (healthy development of the individul within a healthy community) অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বকে সমাজের মধ্যে বাস করতে হবে; সেই অবস্থায় নিজেকেও শক্তিশালী করে তুলতে হবে, সমাজকেও বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ করে গড়তে হবে। তাকে থাকতে হবে সমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দুর মত, সুন্দর সৌধের প্রতিটি প্রস্তরখন্ডের মত, বৃক্ষের প্রতিটি পত্রের মত। শক্তিশালী হয়ে; বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করলেও চলবে না, আবার দুর্বল–অক্ষম হয়ে সমাজ–জীবনের মধ্যে আত্মগোপন করলেও চলবে না। আত্ম–গঠন এবং সমাজ–গঠন দু'য়েরই দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে।

এ–ই হলো ইকবাল কাব্যের মূল সুর।

ইকবালের বাণী তাই কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের জন্যে নয়; তাঁর আবেদন বিশ্বজনীন। সকল মানুষের, সকল কালের তিনি কবি। *[সংকলিত]*

মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল

"মুহাম্মদ উচ্চতম বেহেশ্‌তে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; আল্লাহ্‌র কসম–আমি যদি সেখানে পৌঁছতে পারতাম তা হলে কখনই প্রত্যাবর্তন করতাম না।"

খ্যাতনামা মুসলিম সাধক আবদুল কুদ্দুস গাংগোহী এই উক্তি করেছিলেন। সমগ্র সূফী সাহিত্যে আর কোথাও বোধ হয় একটিমাত্র বাক্যে নবী–মানস এবং সূফী মানসের চৈতন্যের এরূপ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য প্রকাশ পায়নি। সূফী তাঁর অখন্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চান না; এবং যদিও তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তবুও বৃহত্তর মানব–সমাজের পক্ষে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের কোন সার্থকতা থাকে না। নবীর প্রত্যাবর্তন কিন্তু সৃষ্টিধর্মী। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কালের প্রগতির সাথে যোগদান করতে, ইতিহাসের ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে নব আদর্শের পৃথিবী সৃষ্টি করতে, সূফীর কাছে অখন্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তিই শেষ কথা; নবীর পক্ষে এ হচ্ছে যুগান্তর আনয়নকারী মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি দিয়ে তিনি মানব–জগতের রূপান্তর সাধন করেন। নবীর চরম কামনা তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত জাগতিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করা। এইরূপে তাঁর প্রত্যাবর্তন তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের একটা প্রায়োগিক *(Pragmatic)* মানদন্ড। সৃষ্টিধর্মী কর্মের মধ্যে নবী নিজের সংকল্পকে এবং যে সকল মূর্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি একে রূপ দেবেন সেগুলিকে যাচাই করে দেখেন। সামনের দুর্লংঘ্য বাধা জয় করার মধ্য দিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটা মানদন্ড হবে কী ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তাঁর বাণীর প্রেরণায় কি ধরনের তমদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে। এই বক্তৃতায় আমি শেষোক্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। জ্ঞানরাজ্যে ইসলামের অবদানের বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ইসলামী তমদ্দুনের কতগুলি প্রধান ধ্যান–ধারণার প্রতি। এতে এইসব ধ্যান–ধারণার পেছনে যে চিন্তাধারা বর্তমান সে সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে এবং আরও সম্ভব হবে ইসলামী তমদ্দুনের ধ্যান–ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশমান মর্মরূপের পরিচয় লাভ। কিন্তু তা করার আগে ইসলামের একটা বড় অভিমতের তামদ্দুনিক মূল্য উপলব্ধি করা দরকার। এই অভিমতটা হচ্ছে নবুয়ত খতম হওয়ার কথা।

নবীকে বলা যেতে পারে এক ধরনের মরমীয় *(mystic)* চৈতন্যের প্রতীক–যার মধ্যে *'অখন্ড অভিজ্ঞতা'* আপনার সীমা অতিক্রম করে এবং সমষ্টিগত জীবনের গতির মোড় ফেরাবার অথবা একে নতুন রূপ দেবার সুযোগ সন্ধান করে। জীবনের সসীম কেন্দ্রস্থল তাঁর ব্যক্তিত্বের

অসীম গভীরতায় ডুবে যায় এবং তার পরেই নতুন উদ্যমে আবার জেগে ওঠে পুরাতনকে ধ্বংস করতে এবং জীবনের নতুন নতুন দিক খুলে দিতে। আপন সত্তার মূল কেন্দ্রের সাথে এই যোগাযোগ অবশ্য শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুতঃ কুরআনে *'ওয়াহী'* শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, *'ওয়াহী'* হচ্ছে জীবনের একটা বিশ্বজনীন ধর্ম, যদিও এর প্রকৃতি এবং স্বরূপ জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার।

পৃথিবীর বুকে গাছ-পালা এই যে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে প্রাণীজগতে এই যে নতুন অঙ্গ গড়ে ওঠে, আর মানুষ এই যে তার জীবনের গহীন তল থেকে আলোক পায়-এ সবই *'ওয়াহী'* (অনুপ্রেরণা); প্রয়োজন মুতাবিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন রূপ। মানব জাতির অপরিণত অবস্থায় তার মানসিক শক্তি এমন একটা বিশেষ উন্নত স্তরে বিকাশ লাভ করে যাকে আমি বলি নবীসুলভ চৈতন্য। এই চৈতন্য মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তার অপেক্ষা না করে উপস্থিত বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত-বলে জীবনের কর্মধারার পথনির্দেশ করে। মানব জাতির ক্রমবিকাশের আগের দিকে তার মানসিক শক্তি এই যে যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে প্রবাহিত হয়েছে, পরবর্তীকালে তার মধ্যে যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ লাভ ঘটার সঙ্গে জীবন তার নিজেরই স্বার্থের খাতিরে এই যুক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক শক্তির বিকাশ-পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানবজাতির বিবর্তনের প্রথম স্তরে এই চেতনার মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির স্ফুরণ হতো। মানুষ পরিচালিত হয় প্রধানত আবেগ ও প্রবৃত্তির দ্বারা। কেবল আরোহমান যুক্তিই *(inductive reason)* মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকের ওপর প্রভুত্ব দান করতে পারে। এ একটা অর্জিত বস্তু। একবার জন্ম হলে এই বিচারবৃত্তি জ্ঞানের অন্যান্য প্রণালীর প্রতিরোধ করে আপনার শক্তি বৃদ্ধি করবেই। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পৌরাণিক জগতে মানুষ যখন ছিল অনেকখানি আদিম প্রকৃতির এবং কম-বেশী প্রবৃত্তির তাগিদেই যখন তারা পরিচালিত হত, তখন তারা দর্শনের কয়েকটি উন্নত মতবাদের প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, পৌরাণিক পৃথিবীর এই মতবাদ ভাবাত্মক *(abstract)* চিন্তার সৃষ্টি। এই চিন্তাধারা অস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করার *(systematization)* বাইরে যেতে পারে না এবং এর থেকে বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন পথ পাওয়া যায় না।

এদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, ইসলামের পয়গম্বর প্রাচীন আর আধুনিক জগতের মধ্যখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নিকট প্রকাশিত বাণীর উৎসমূলের দিক দিয়ে তিনি প্রাচীন জগতের এবং সেই বাণীর মর্মরূপের *(the spirit of his revelation)* দিক দিয়ে তিনি আধুনিক জগতের। জীবনের নতুন পথে চলার উপযোগী জ্ঞানের নতুন নতুন উৎসমূল তাঁর সাধনায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আশা করি, আমি অচিরেই প্রমাণ করে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারব যে, ইসলামের জন্ম হচ্ছে আরোহমান বুদ্ধিবৃত্তিরই জন্ম। আর যে নবুয়তের প্রয়োজন

নেই, এই উপলব্ধিই ইসলামের নবুয়তকে পূর্ণতা দান করেছে। এতে বোঝা যায় যে, জীবন চিরদিন পরের পরিচালনায় চলতে পারে না; পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির জন্যে মানুষকে তার নিজস্ব সঙ্গতির ওপরই নির্ভর করতে হবে। ইসলামে পুরোহিত প্রথা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে রাজক্ষমতা লাভ নিষিদ্ধকরণ, কুরআনে সর্বদা যুক্তি আর অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন এবং মানবীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রকৃতি ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তের ওপর নজর দেওয়ার তাকিদ, এ সবই হচ্ছে সেই অবসানবাদের একেক দিক। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, মরমীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আজ নেই। এই মরমীয় অভিজ্ঞতা একটা জীবন্ত ব্যাপার। প্রকৃতির দিক দিয়ে নবুয়তের সঙ্গে এর আত্মীয়তা আছে। এই অভিজ্ঞতা গুণগত বিচারে নবীর অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন জাতীয় নয়। বস্তুতঃ কুরআনে *'আনফাস'* (আত্মা) এবং *'আফাক'* (জগৎ) এই দুইকেই জ্ঞানের উৎস বলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনপুঞ্জ প্রকাশ করেন বাহ্যিক এবং আত্মিক এই উভয় প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকম অভিজ্ঞতারই জ্ঞান-প্রদায়ক সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা। অতএব এই অবসানবাদের অর্থ এমন মনে করতে হবে না যে, জীবনে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন ব্যাপার সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। চিন্তা-জগতে এ অবসানবাদের মূল্য হচ্ছে এইখানে যে, এতে মরমীয় অভিজ্ঞতাকে স্বাধীনভাবে বিচার করে দেখার একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়, আর এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে, মানুষের ইতিহাসে অতিপ্রাকৃতিক উৎসের দাবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সব ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের দিনই অতীত হয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে উক্তরূপ মাহাত্ম্যের প্রসার প্রতিরুদ্ধ হয়। এই মতের প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রদেশে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত হয়- যেমন ইসলাম করেছে। পূর্বকালের সংস্কৃতি মানুষের বাইরের অভিজ্ঞতাকে দৈব বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ইসলামের ফর্মুলার প্রথম অংশ এই অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিক্ষা দিয়েছে। অতএব মরমীয় অভিজ্ঞতা যতই অসাধারণ আর অস্বাভাবিক হোক না কেন, মুসলমান একে একটা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা বলেই বিশ্বাস করবে। অবশ্য মানুষের আর সব অভিজ্ঞতার মত এই অভিজ্ঞতাও বিচার-সাপেক্ষ। ইবনে সাইয়াদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মনোভাব থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইসলামে মরমীবাদের কাজ হচ্ছে মরমীয় অভিজ্ঞতাকে প্রণালীবদ্ধ করা, যদিও এটা স্বীকার করতে হবে যে, ইবনে খালদুনই একমাত্র মুসলমান, যিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে একে বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞান লাভের মাত্র একটা উপায়। কুরআনে আরো দু'টি উপায়ের নির্দেশ করা হয়েছেঃ একটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং আরেকটা হচ্ছে ইতিহাস। জ্ঞান লাভের এই দু'টি উপায়কে ব্যবহার করার মধ্যে ইসলামের মর্মরূপ সবচেয়ে সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন চরম সত্তার নিদর্শন দেখতে পায় সূর্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে, দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে, মানুষের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে, মানুষের

সাফল্য ও বিপর্যয়ের মধ্যে–বস্তুতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে। মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে এইসব নিদর্শন অনুধাবন করা, অন্ধ ও বধিরের মতো এসবকে তাচ্ছিল্য করা নয়। কেননা, এই জীবনে এইসব নিদর্শনের প্রতি যে অন্ধ হয়ে থাকবে সে ভাবী জীবনের বাস্তব সত্যগুলোর প্রতিও *(to the realities of life to come)* অন্ধ হয়ে থাকবে। বস্তুজগতের প্রতি এই অঙ্গুলি–নির্দেশ এবং তার সাথে সাথে প্রারম্ভ থেকে বিশ্ব যে গতিশীল, সসীম ও পরিবর্ধনক্ষম–কুরআনের শিক্ষানুযায়ী এই ক্রমিক উপলব্ধি মুসলিম চিন্তাধারা এবং গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের মনন–সাধনার প্রারম্ভে বিশেষ আগ্রহের সাথে গ্রীক চিন্তাধারা অনুশীলন করেছিলেন। কুরআনের তাৎপর্য যে মুখ্যতঃ এই চিন্তাধারার বিপরীত এটা না বুঝে গ্রীক চিন্তানায়কদের ওপর পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করে মুসলমানদের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল গ্রীক দর্শনের আলোকে কুরআনের অর্থ গ্রহণ করা। গ্রীক দর্শন চিন্তা–বিলাসী এবং বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতি উদাসীন। কুরআনের তাৎপর্য আর গ্রীক দর্শনের এই কাল্পনিক প্রকৃতির কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, মুসলমানদের উক্ত প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হওয়া অনিবার্য ছিল। তাঁদের বিফলতা থেকেই ইসলামী তমদ্দুনের প্রকৃত তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়েছে এবং ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আধুনিক তমদ্দুনের কতকগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্যের।

গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে মুসলিম চিন্তাধারার এই বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে মনন–জগতের সব দিকেই। আমার মনে হয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রে এই বিদ্রোহ যে রূপ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। আশ'আরীপন্থীদের অধিবিদ্যক চিন্তাধারায় *(metaphysical thought of the Asharite)* এই বিদ্রোহ সুস্পষ্ট ; তবে এ বিদ্রোহ সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুসলমানদের গ্রীক ন্যায়শাস্ত্রের *(Logic)* সমালোচনায়। এটা স্বাভাবিক; কারণ সম্পূর্ণরূপে চিন্তামূলক এই গ্রীক দর্শনে তৃপ্তি লাভ না করার ফলে মুসলমান সত্যান্বেষীরা জ্ঞান লাভের নিশ্চিততর পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। আমার মনে হয়, সংশয়কে সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রারম্ভ হিসেবে গ্রহণ করার নীতি নাজ্জাম প্রথম প্রবর্তন করেন। ইমাম গাযালী তাঁর *'ধর্মবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন'* নামক গ্রন্থে এই নীতির আরো ব্যাখ্যা করেন এবং *'দেকার্তীয় পদ্ধতি'*র সূত্রপাত করেন। তবে গাযালী ন্যায়দর্শনে মোটামুটি এরিস্টটল–পন্থীই ছিলেন। *'কিসতা'* নামক গ্রন্থে তিনি কুরআনের কতকগুলো যুক্তিকে এরিস্টটলীয় আর্যায় ফেলেছেন; কিন্তু তিনি কুরআনের *'শুয়া'রা'* নামীয় সূরার কথা ভুলে গেছেন; নবীর বাণী অগ্রাহ্য করার ফলে শাস্তি শুরু হয়, এইমর্মে যে কথা উক্ত সূরায় আছে সে কথাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে একের পর এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সাদাসিধা বর্ণনা দিয়ে। ইশরাকী এবং ইবন–ই–তাইমিয়াই সুসংবদ্ধভাবে গ্রীক ন্যায়ের খন্ডনে প্রবৃত্ত হন। সম্ভবতঃ আবু বকর রাজীই সর্বপ্রথম এরিস্টটলের প্রথম *figure*–এর সমালোচনা করেন। সম্পূর্ণরূপে আরোহমান *(inductive)* দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধ তাঁর আপত্তিগুলো আমাদের যুগে জন

স্টুয়ার্ট মিল নতুন করে সূত্রবদ্ধ করেছেন। ইবন-ই-হাজম তাঁর *'ন্যায়শাস্ত্রের সীমা'* নামক গ্রন্থে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর জোর দিয়েছেন। ইবন-ই-তাইমিয়া তাঁর *'ন্যায়দর্শনের প্রতিবাদ'* নামীয় গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য বিচারের *(argument)* একমাত্র পন্থা হচ্ছে আরোহমান বিচার *(induction)*। এভাবেই নিরীক্ষা আর পরীক্ষার পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। এ কেবল সিদ্ধান্তমূলক *(theoretical)* ব্যাপার ছিল না। মনস্তত্ত্বে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলবেরুনীর আবিষ্কার, যাকে আমরা বলি প্রতিক্রিয়া-সময় *(reaction time)* এবং আলকিন্দির এই আবিষ্কার ইন্দ্রিয় সংবেদনা *(sensation)* প্রণোদক উপাদানের *(stimulus)* সমপরিমাণ; পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ইউরোপীয়দের আবিষ্কার-এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ডুরিং বলেন যে, রজার বেকনের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধারণা তাঁর সম-নামীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের ধারণা থেকে অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ আর সুস্পষ্ট। এই রজার বেকন বিজ্ঞান শিখেছিলেন কোথায়? স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বস্তুতঃ তাঁর *Opus Majus* গ্রন্থের বীক্ষণ নিয়ে আলোচিত ৫ম খন্ড কার্যতঃ ইবন-ই-হাইসাম-এর অক্ষি-বিজ্ঞানের অনুকৃতি। এবং সমগ্রভাবে এ গ্রন্থে ইবন-ই-হাজমের প্রভাবের নিদর্শনেরও অভাব নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইসলামী গোড়া পত্তনের কথা ইউরোপ বিলম্বে হলেও অবশেষে স্বীকৃতি দান করেছে। ব্রিফল্টের *'মেকিং অব হিউম্যানিটি'* নামীয় পুস্তক থেকে আমি এখানে দু'একটা অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছিঃ

'মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের অক্সফোর্ডস্থ উত্তরাধিকারীগণের নিকটেই রজার বেকন আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিখেছিলেন। তিনি অথবা তাঁর সম-নামীয় বৈজ্ঞানিক কেউই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একজন প্রচারক ছাড়া অধিক কিছু ছিলেন না। তিনি এ-কথা প্রচার করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি যে, তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিক্ষা। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি সম্বন্ধে যে বিরাট ভুল করা হয় তারই একটা অংশমাত্র। বেকনের সময়ে আরবদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপে প্রচার লাভ করেছিল এবং আগ্রহের সাথে অনুশীলিত হত।'

বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে আরবীয় সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু এর ফল পরিপক্ব হয়েছিল বিলম্বে। মূর-সংস্কৃতি অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পরে তার গর্ভজাত এই বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণ সঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং বহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।' (২০২ পৃঃ)

'যদিও ইউরোপীয় প্রগতির এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের তামদ্দুনিক প্রভাবের সুনিশ্চিত নিদর্শন না মিলে, তবু প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জাগরণের মতো আর কোন কিছুতে এই প্রভাব এত সুস্পষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবই হচ্ছে আধুনিক জগতের স্থায়ী ও বিশিষ্ট শক্তি এবং তার জয়ের মূল উৎস।' [১০৯ পৃঃ]

'আরবীয় বিজ্ঞানের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শুধু যুগান্তকারী মতবাদের আবিষ্কারের জন্যেই ঋণী নয়; আরবীয় তমদ্দুনের নিকট আধুনিক বিজ্ঞান এর চেয়েও বেশী ঋণীঃ বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে আরব-সংস্কৃতির বুকে। আমরা দেখেছি, প্রাচীন জগত ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীকদের জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত ছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা বস্তু এবং এগুলোর সাথে কখনই গ্রীক সংস্কৃতির পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয়নি। বিধিবদ্ধকরণ *(systematization)*, সামান্যকরণ *(generalization)* এবং তত্ত্বীকরণ *(theorization)* গ্রীকরা করেছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আহরণ, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পদ্ধতি, নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক পুঙ্খানুপুঙ্খ ও দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান--এসব ছিল গ্রীক প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান-চর্চা এক-আধটু হয়েছিল গ্রীক আমলের আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, ইউরোপে তার বিকাশ হয় একটা নতুন অনুসন্ধিৎসার ফলে; গবেষণার নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পরিমাণের পদ্ধতি এবং গণিতের বিকাশের ফলে। এসবই ছিল গ্রীকদের অজ্ঞাত। ইউরোপে এসবের প্রেরণা এনে দিয়েছিল, আর এসব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল আরবরাই।' [১০৯ পৃঃ]

অতএব মুসলিম তমদ্দুনের প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জ্ঞান লাভের উদ্দেশে এ দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সসীম বস্তুজগতের ওপর। অধিকন্তু এও সুস্পষ্ট যে, ইসলামের আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে আপোষের ফলে হয়নি; বরং তার সাথে একটা দীর্ঘকালব্যাপী বুদ্ধিগত সংঘর্ষের ফলেই হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রিফল্টের কথায়, গ্রীকদের প্রবণতা ছিল প্রধানতঃ মতবাদের দিকে, বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের দিকে নয়। তাদের প্রভাব মুসলমানদের কুরআন-উপলব্ধিকে বরং অস্পষ্টই করে তুলেছিল এবং অন্তত দু'শতাব্দী যাবৎ আরবদের বাস্তববাদী প্রকৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং স্বস্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। অতএব গ্রীক চিন্তাধারা যে-কোন দিক দিয়ে মুসলিম তমদ্দুনের ধারা নির্ধারণে কার্যকর হয়েছে, এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর আমি আলোকপাত করতে চাই। আমার যুক্তির একাংশ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছি, অপরাংশ এখন উপস্থিত করছি।

মূর্ত বস্তু থেকেই জ্ঞানকে যাত্রা শুরু করতে হবে। মূর্ত বস্তুর বুদ্ধিগত উপলব্ধি এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভের ফলেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে মূর্ত বস্তুকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

'হে জ্বিন ও মানবমন্ডলী, তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তবে কর, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষমতার দ্বারাই তোমরা তা করতে পারবে।' [৫৫:৩৩]

কিন্তু সসীম বস্তুপুঞ্জের সমষ্টি হিসেবে এই বিশ্ব অবিমিশ্র শূন্যতার মধ্যে একটা দ্বীপের মতো এবং কাল-প্রবাহকে যদি আমরা পরম্পরবহির্ভূত কতকগুলো মুহূর্তস্বরূপ মনে করি, তবে এই কাল নিষ্ক্রিয়, অর্থহীন। বিশ্ব সম্বন্ধে এ রকম ধারণা অনুধ্যানী মনকে কোন পথ দেখাতে পারে না। সংবেদনীয় স্থান ও কালের সীমা আছে-একথা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে কল্পিত সসীম কর্তৃক মনের চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় এর সীমা অতিক্রম করতে হলে মনকে অতিক্রম করতে হবে আনুক্রমিক কাল *(serial time)* এবং সংবেদনীয় স্থানের অবিমিশ্র শূন্যতা। কুরআনে বলা হয়েছেঃ *'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অভিমুখেই তোমার সীমা নিহিত আছে।'* এই আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে কুরআনের একটা গভীরতম তত্ত্ব। কারণ, এখানে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চরম সীমার অনুসন্ধান করতে হবে নক্ষত্রমন্ডলীর দেশে নয়, একটা সীমাহীন বিশ্বজীবন এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। এখন এই চরম সীমার দিকে বুদ্ধিগত অগ্রগতি দীর্ঘায়িত এবং পরিশ্রমসাধ্য; আর এই প্রচেষ্টার মধ্যে ইসলামী চিন্তাধারার গতি গ্রীকদের চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। স্পেঙ্গলার বলেছেন, গ্রীকদের আদর্শ ছিল অনুপাত, অসীমতা নয় *(proportion, not infinity)*। শুধু সুনির্ধারিত সীমাবিশিষ্ট সসীমের বস্তুগত উপস্থিতি নিয়েই গ্রীকদের মন ব্যাপৃত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম তমদ্দুনের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, অবিমিশ্র বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব (আমার মতে যার অন্য নাম সূফীবাদ) এই দু'জগতেই যে আদর্শের সাক্ষাৎ মিলে সে হচ্ছে অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া এবং উপভোগ করা। এরূপ মনোভাব-বিশিষ্ট তমদ্দুনের পক্ষে স্থান ও কালের সমস্যা জীবন-মরণের সমস্যার মতোই। মুসলিম দার্শনিকদের, বিশেষ করে আশ'আরীপন্থীদের কাছে স্থান ও কালের সমস্যা কিভাবে উপস্থিত হয়েছিল তার আভাস আমি ইতিপূর্বে একটি বক্তৃতায় দিয়েছি। ইসলাম-জগতে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ কোনদিনই জনপ্রিয় না হওয়ার একটা কারণ, ইসলাম অন্য-নিরপেক্ষ *(absolute)* স্থান-এর ধারণা উপস্থিত করে। অতএব আশ'আরীপন্থীগণ বিভিন্ন ধরনের পরমাণুবাদ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সংবেদনীয় স্থান-এর জটিলতাগুলোকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এ-কালের পরমাণুবাদীগণের মতোই। গণিতের দিক দিয়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, টলেমী (৮৭-১৬৫ খৃঃ) থেকে নাসির তুসী (১২০১-৭৪ খৃঃ) পর্যন্ত সংবেদনীয় স্থান-এর ভিত্তিতে ইউক্লিদের অনুরূপ স্বীকার্য প্রতিজ্ঞার *(parallel postulate)* নিশ্চয়তা প্রতিপাদনের দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে কেউই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেননি। তুসীই সর্বপ্রথম গণিত-জগতের সহস্র বর্ষব্যাপী প্রশান্তি ভঙ্গ করেন; স্বীকার্য প্রতিজ্ঞার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি সংবেদনীয় স্থান বর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এইভাবে যতটুকু হোক তিনি আমাদের যুগের অতিদেশ *(hyperspace)* আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রিয়ার

(function) আধুনিক গাণিতিক ধারণার সমীপবর্তী হয়ে সম্পূর্ণ রকমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলবেরুনীই বলেছিলেন যে, বিশ্ব সম্বন্ধে স্থিতিশীলতার ধারণা সন্তোষজনক নয়। এও স্পষ্টতঃই গ্রীকদের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। এই ক্রিয়া ধারণা *(function idea)* আমাদের বিশ্বদর্শনে কাল উপাদান সংযোজন করে। এ স্থিতকে পরিবর্তনশীল বলে প্রতীত করে এবং বিশ্বকে বিদ্যমান না দেখে পরিণতি-প্রবণ দেখে *(sees the universe not as being but as becoming)*। স্পেঙ্গলার মনে করেন যে, ক্রিয়ার গাণিতিক ধারণা প্রতীচ্যের প্রতীক, অন্য কোন সংস্কৃতি এর আভাসও দেয়নি। আলবেরুনী কর্তৃক ত্রিকোণমিতিক ক্রিয়া থেকে অন্য যে কোনো প্রকার ক্রিয়ার প্রক্ষেপের নিউটনীয় ফরমুলার সামান্যকরণ *(generalization)* বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, স্পেঙ্গলারের দাবীর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বিশুদ্ধ আয়তন থেকে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে *(frompure magnitude to pure relation)* সংখ্যা সম্বন্ধীয় গ্রীক ধারণায় পরিবর্তন বাস্তবিকপক্ষে আরম্ভ হয়েছিল খারেজমীর গণিত থেকে বীজগণিতে উপনীত হওয়া থেকে। স্পেঙ্গলার যাকে সময়ানুক্রমিক সংখ্যা বলেছেন, আলবেরুনী সুনির্দিষ্টভাবে তা আবিষ্কার করেছিলেন। এর অর্থ বিদ্যমানতা থেকে পরিণতি-প্রবণতার ধারণার দিকে চিন্তা-ধারণার গতি পরিবর্তন। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক ইউরোপীয় গণিত কালকে তার জীবন্ত ঐতিহাসিক প্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখতে চায় এবং তাকে স্থান-এর নিছক প্রতিরূপে পরিণত করতে চায়। আইনস্টাইনের মতবাদে সময়কে দেখি গতিশীলতাহীন এবং অদ্ভুতভাবে স্থান-সদৃশ; এই কারণেই মুসলিম জ্ঞানার্থীদের কাছে তাঁর আপেক্ষিক মতবাদের চেয়ে হোয়াইটহেডের আপেক্ষিক মতবাদের আবেদন বেশী হবে।

মুসলিম জগতে গাণিতিক চিন্তাধারার প্রগতির পাশাপাশি দেখতে পাই বিবর্তনবাদের ধারাবাহিক পরিণতি। জাহিয্ই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, স্থান পরিবর্তনের ফলে পক্ষী জীবনে পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে আলবেরুনীর সমসাময়িক ইবনে মাস্কাওয়েহ্ এই মতবাদকে আরও স্পষ্ট রূপ দেন এবং '*আল-ফউজ-উল-আসগার*নামক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমি এখানে তাঁর বিবর্তনবাদের সারমর্ম দিচ্ছি-তার বৈজ্ঞানিক মূল্যের জন্যে নয়, মুসলিম চিন্তাধারা কোন্দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল তা দেখাবার জন্যে।

ইবনে মাস্কাওয়েহ্-এর মতে বিবর্তনের নিম্নতম স্তরে জন্ম ও পরিবর্ধনের জন্যে উদ্ভিদের কোন বীজের প্রয়োজন হয় না। বীজ থেকেও এর বংশ বিস্তার ঘটে না। খনিজ পদার্থ থেকে এই জাতীয় উদ্ভিদের পার্থক্য শুধু কিঞ্চিৎ সঞ্চরণ-শক্তিতে। উচ্চতর অবস্থায় এই শক্তির আরও বিকাশ হয়। এরপর উদ্ভিদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং বীজের মারফত বংশ বিস্তার শুরু হয়। সঞ্চরণ-শক্তি আরও বর্ধিত হলে আমরা গুঁড়ি, পাতা এবং ফল সমন্বিত উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পাই। বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে এর পরিবর্ধনের জন্যে শ্রেষ্ঠতর জমি এবং আবহাওয়ার প্রয়োজন

হয়। বিকাশের শেষ স্তরে দ্রাক্ষা লতা এবং খেজুর গাছের উদ্ভব হয়। এর পরেই প্রাণী-জগতের সূত্রপাত। খেজুর গাছে যৌন পার্থক্য সুস্পষ্ট। শিকড় এবং আঁশ ছাড়াও এর এমন একটা অংশ থাকে, যা কতকটা প্রাণীদের মস্তিষ্কের মতো এবং এর অক্ষুণ্ন অবস্থার ওপর খেজুর গাছের জীবন নির্ভর করে। এই হচ্ছে উদ্ভিদ-জগতের বিকাশের উচ্চতম স্তর এবং প্রাণী-জগতের পূর্বাভাস। প্রাণী-জগতের প্রথম পদক্ষেপ আরম্ভ হয় মৃত্তিকাস্থ মূলের বন্ধন ছেদনের পর। এই মূল বন্ধন থেকে মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সজ্ঞান গতিশীলতার অঙ্কুর। এই হচ্ছে প্রাণিত্বের প্রথম স্তর। প্রাণীদের স্পর্শেন্দ্রিয় সর্বপ্রথমে এবং দর্শনেন্দ্রিয় সর্বশেষে বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশের সাথে সাথে পোকা-মাকড়, সরীসৃপ, পিপীলিকা এবং মৌমাছি ইত্যাদি প্রাণী সঞ্চরণের স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাণী-জগতের পূর্ণতা লাভ হয়। চতুষ্পদ জাতীয় অশ্ব এবং পক্ষী জাতীয় শ্যেণের মধ্যে এবং অবশেষে বানরের মধ্যে মানবত্বের প্রান্তসীমা এসে পৌঁছে। বিবর্তনের ধারায় বানর মানুষের ঠিক নীচের স্তরে অবস্থিত। এরপর আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের ফলে দৈহিক পরিবর্তন এবং বিচার-বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হতে থাকে।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইরাকী এবং খাজা মুহাম্মদ পারসা প্রমুখ দার্শনিকগণই ধর্মীয় মনস্তত্ত্বে স্থান ও কাল সমস্যার আলোচনায় অনেকখানি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমীপবর্তী হয়েছেন। কালের স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে ইরাকীর অভিমতের উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করেছি। আমি এখন আপনাদের নিকট স্থান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উপস্থিত করব।

ইরাকীর মতে আল্লাহ্ সম্পর্কিত স্থান-এর অস্তিত্ব কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়ঃ

'তুমি কি উপলব্ধি করছ না যে, আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তার সম্বন্ধে জ্ঞাত? নির্জনে তিন ব্যক্তি বাক্যালাপ করে না, আল্লাহ্ চতুর্থ জন; পাঁচ জনও করে না; তিনি ষষ্ঠ জন; তার বেশী কিম্বা কমও করে না, কারণ সর্বত্রই তিনি তাদের সঙ্গী।' [৫৮ঃ৮]

'তোমরা এমন কোন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকবে না, কিম্বা কুরআনের এমন কোন অংশ তিলাওয়াত করবে না, কিম্বা এমন কোন কাজ করবে না, যার সাক্ষী আমরা হব না। পৃথিবীর অথবা আকাশের একটি পরমাণুর ওজনও আল্লাহ্র অজ্ঞাত নয়। এর চেয়ে এমন কোন কম অথবা বেশী ওজনও নেই, যা এই প্রাঞ্জল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (১০ঃ ৬২)

'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তার কানে কানে যা বলে তা আমরা জ্ঞাত আছি; তার কাঁধের শিরা অপেক্ষাও আমরা তার নিকটবর্তী।' (৫০ঃ১৫)

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সন্নিকর্ষ, সংস্পর্শ এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা-এই শব্দগুলো বস্তুজগতের প্রতি প্রযোজ্য, আল্লাহ্র প্রতি নয়। আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক যেমন, আল্লাহ্র

সাথে সমগ্র বিশ্ব-জগতের সম্পর্কও তেমনি। আত্মা দেহের ভিতরেও নেই, বাইরেও নেই; এর সন্নিকটেও নেই এবং এ থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। তবু দেহের প্রতিটি পরমাণুর সাথে আত্মার সংস্পর্শ একটি বাস্তব সত্য এবং এর সূক্ষ্মতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন না কোন প্রকার স্থান-এর কল্পনা না করে এই সংস্পর্শ ধারণা করা অসম্ভব। কাজেই আল্লাহ্র সম্পর্কে স্থান-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে কি ধরনের স্থান আল্লাহ্র অন্য-নিরপেক্ষতার সাথে সুসামঞ্জস্য হতে পারে, তা-ই শুধু সতর্ক হয়ে আমাদের নির্ণয় করতে হবে। এখন স্থান হচ্ছে তিন প্রকার-জড় বস্তুর স্থান, অজড় সত্তাসমূহের স্থান এবং আল্লাহ্র স্থান। জড় বস্তুর স্থান তিন প্রকার। প্রথমতঃ যে-সব স্থূল বস্তুর জন্যে স্থানের প্রয়োজন হয়, তাদের সম্পর্কিত স্থান। এ স্থান-এ সঞ্চরণের জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়, বস্তুসমূহ স্থান অধিকার করে থাকে এবং স্থানচ্যুতি প্রতিরোধ করে। দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম বস্তু-যেমন বায়ু এবং ধ্বনি সম্পর্কিত স্থান। এখানেও বস্তুসমূহ পরস্পরকে প্রতিরোধ করে এবং তাদের সঞ্চরণকাল দিয়ে পরিমাপ করা যায়। স্থূল বস্তুসমূহের কাল থেকেই এই কাল স্বতন্ত্র। কোন টিউবের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে হলে তার মধ্যকার বায়ুকে স্থানচ্যুত করতে হবে; আর স্থূল বস্তু সম্পর্কিত কালের তুলনায় ধ্বনি-তরঙ্গের কাল তো কিছুই নয়। তৃতীয়তঃ আলোক-সম্পর্কিত স্থান। সূর্যালোক অবিলম্বে পৃথিবীর দূরতম অংশে বিকীর্ণ হতে পারে। আলোক এবং ধ্বনির এই গতিবেগের মধ্যে কাল প্রায় শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব এটা স্পষ্ট যে, আলোক সম্পর্কিত স্থান বায়ু ও ধ্বনি সম্পর্কিত স্থান থেকে স্বতন্ত্র। এর চেয়েও শক্তিশালী যুক্তি কিন্তু আরেকটা আছে। প্রদীপের আলোক ঘরের বায়ুকে স্থানচ্যুত না করে সকল দিকে বিস্তৃত হয়। এতে প্রতীত হয় যে, বায়ু সম্পর্কিত স্থান-এর চেয়ে আলোক-সম্পর্কিত স্থান বেশী সূক্ষ্ম এবং বায়ু সম্পর্কিত স্থান আলোক-সম্পর্কিত স্থান-এ প্রবেশ লাভ করতে পারে না।

এই দু'রকমের স্থান-এর মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে; এই কারণে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছাড়া এদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব। অধিকন্তু, গরম পানিতে আগুন এবং পানি পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে বলে মনে হয়, কিন্তু এদের ধর্ম পরস্পরের বিপরীত। এই কারণে দু'টি বস্তু কখনো একই স্থানে অবস্থান করতে পারে না। এই দু'টি বস্তু সম্পর্কিত দেশের মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য থাকলেও এরা স্বতন্ত্র, এটা ধরে না নিলে ব্যাপারটার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দূরত্বের উপাদান *(element of distance)* সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না থাকলেও আলোক-সম্পর্কিত স্থানে পারস্পরিক প্রতিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রদীপের আলোক কোন একটা বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে মাত্র এবং এক প্রদীপের আলোক অন্য প্রদীপের আলোককে স্থানচ্যুত না করেও শত প্রদীপের আলোক একই স্থানে পরস্পর মিশে যায়।

এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের সূক্ষ্মতা-বিশিষ্ট স্থানের বর্ণনা দিয়ে ইরাকী বিভিন্ন শ্রেণীর অশরীরী সত্তাদের (যেমন ফেরেশ্তাগণের) প্রধান কয়েক প্রকার স্থানের বর্ণনা

দিয়েছেন। দূরত্বের উপাদান এই প্রকার স্থানে পুরোপুরি অনুপস্থিত নেই। কারণ, অশরীরী সত্তাগণ অনায়াসে প্রস্তর প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারলেও গতিকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। ইরাকীর মতে, গতি আধ্যাত্মিকতার অপূর্ণতার পরিচায়ক। মানবাত্মা দৈহিক স্বাধীনতার চরমে উপনীত হলে এ স্থিরও থাকে না, গতিসম্পন্নও থাকে না–তখন এর স্বরূপ হয় তুলনা রহিত। এভাবে স্থানের অগণ্য প্রকারভেদ অতিক্রম করে আমরা খোদায়ী স্থান–এ উপনীত হই। এই স্থান সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার আয়তন–বর্জিত এবং সকল অসীমতার কেন্দ্রবিন্দু।

ইরাকীর মতবাদের এই সংক্ষিপ্তসার থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, যে যুগে আধুনিক গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মতবাদ ও প্রত্যয়সমূহের কোন ধারণাই লোকের ছিল না, সে–যুগে একজন সংস্কৃতিবান মুসলিম সূফী কিভাবে তাঁর স্থান ও কাল সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইরাকী গতিশীল স্থানের ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্থানের অবিচ্ছিন্ন নিঃসীমতার ধারণার সাথে তাঁর মন একটা অস্পষ্ট সংগ্রামে লিপ্ত ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। কারণ, প্রথমতঃ তিনি গণিতজ্ঞ ছিলেন না এবং দ্বিতীয়তঃ বিবর্তমান বিশ্ব সম্বন্ধে পরম্পরাগত এরিস্টটলীয় ধারণার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল। তারপর চরম সত্তার মধ্যে অতিস্থানি *'এখানে'* এবং অতিশাশ্বতিক *'এখন'*–এর পরস্পর অন্তপ্রবেশ স্থান কি কালের আধুনিক ধারণার নির্দেশ দেয়। অধ্যাপক আলেকজান্ডার তাঁর *'Space, Time and Deity'* গ্রন্থে বলেছেন যে, এই স্থানিক কাল সকল বস্তুর মূলীভূত। আরেকটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে ইরাকী বুঝতে পারতেন যে, স্থান ও কালের মধ্যে কালই অধিকতর মৌলিক। অধ্যাপক আলেকজান্ডারকে অনুসরণ করে কালকে স্থানের মানস বললে তা নিছক অলঙ্কার হবে না। বিশ্বের সাথে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধকে ইরাকী দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধের অনুরূপ মনে করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার মৌলিক এবং জাগতিক দিকগুলোর দার্শনিক আলোচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হননি, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একে স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছেন। স্থান ও কালকে একটা বিলীয়মান বিন্দু মুহূর্তে পরিণত করাই যথেষ্ট নয়। দর্শনের যে–পথ বিশ্বের সর্বব্যাপী মানসরূপী আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে দেয়, তা নিহিত রয়েছে জীবন্ত চিন্তনকে স্থানিক কালের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে আবিষ্কার করার মধ্যে। ইরাকীর চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে সঠিক পথেরই অভিমুখী হয়েছিল, কিন্তু তাঁর এরিস্টটলীয় সংস্কার এবং তারই সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাববশত তাঁর প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মতে ঐশী কাল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন–বর্জিত; স্পষ্টতঃই সজ্ঞান অভিজ্ঞতার যথেষ্ট বিশ্লেষণের অভাবেই তাঁর এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই কারণে ঐশী কাল এবং আনুক্রমিক কালের সম্বন্ধ নির্ণয় তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টিধারা, যার অর্থ প্রবর্ধমান বিশ্ব–এই খাঁটি ইসলামী ধারণায় উপনীত হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এইভাবে সকল মুসলিম চিন্তাধারাই বিশ্বের গতিশীলতার ধারণায় এসে মিলিত হয়েছে। কুরআনে প্রাণী–জগতের বিবর্তন সম্বন্ধে ইবনে মাস্কাওয়েহ্‌–এর মতবাদ এবং ইতিহাস

সম্বন্ধে ইবনে খালদুনের অভিমত এই ধারণায় গতিবেগ সঞ্চার করেছে। কুরআনে ইতিহাস (আল্লাহ্‌র দ্বীন)-কে জ্ঞানের তৃতীয় উৎস বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআনের একটা প্রধান শিক্ষা এই যে, জাতি, জাতিসমূহকে সমষ্টিগতভাবে বিচারাধীন করা হয় এবং পৃথিবীতেই তাদেরকে দুষ্কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। প্রমাণস্বরূপ কুরআনে সর্বদাই ঐতিহাসিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মানুষের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার প্রতি অবহিত হতে বলা হয়েছেঃ

"অতীতে আমরা আমাদের নিদর্শনসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁকে বলেছিঃ 'জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন (ইতিহাসের শিক্ষা) সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করে দাও।' নিশ্চয়ই এর মধ্যে সহিষ্ণু এবং কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (১৪:৫)

'এবং সৃষ্ট জাতির মধ্যে এরূপ জনমন্ডলী আছে, যারা অন্যদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু যারা আমাদের নিদর্শনপুঞ্জকে মিথ্যা মনে করে তাদেরকে আমরা ক্রমে ক্রমে এমন উপায়ে অবনত করি, যা তারা জানে না; এবং তাদের মেয়াদ বর্ধিত করলেও নিশ্চয়ই আমার কৌশল অব্যর্থ।' (৭ঃ ১৮১)

'তোমাদের আগে অনেক দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে।' (৩ঃ১৩১)

'যদি তোমাদের গায়ে কোন জখম হয়ে থাকে, তবে (মনে রেখো) অমন জখম আরও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে। আমরা জাতিসমূহকে পর্যায়ক্রমে সুদিন ও দুর্দিন দিয়ে থাকি। (৩ঃ১৩৪)

'প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে।' (৭ঃ৩২)

শেষ আয়াতটি অল্প কথায় এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উদাহরণ। এর থেকে মনে হয়, মানব-সমাজের জীবনকে জৈব বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা যেতে পারে। অতএব কুরআনে কোন ঐতিহাসিক মতবাদের অঙ্কুর নেই, এ ধারণা নিতান্ত ভুল। বস্তুতঃ ইবনে খালদুনের ভূমিকার পশ্চাতে কুরআনের প্রেরণাই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। এমনকি, চরিত্র-বিচারের দিক দিয়েও তিনি কুরআনের কাছে কম ঋণী নন। উদাহরণস্বরূপ জাতি হিসেবে আরবদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখিত তাঁর দীর্ঘ অনুচ্ছেদটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমগ্র অনুচ্ছেদটি কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতগুলোর বিশদীকরণ মাত্রঃ

'মরুচারী আরবগণ বিশ্বাসহীনতায় এবং কাপট্যে স্থির-সংকল্প; এবং এটাই অধিক সম্ভব যে, রাসূলগণের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি তারা উদাসীন হয়ে থাকবে; এবং আল্লাহ্ জ্ঞাতা ও জ্ঞানী।'

'মরুচারী আরবদের অনেকে আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করে মনে করে যে, তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন হবেঃ পক্ষান্তরে তারাই দুর্দশাগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্, শ্রোতা এবং জ্ঞাতা'। (৯ঃ ৯৮, ৯৯)

যা–ই হোক, জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে ইতিহাসের প্রতি কুরআনের অভিনিবেশ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নির্দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; ঐতিহাসিক সমালোচনার অন্যতম মৌলিক নীতি কুরআন আমাদের দান করেছে। অন্যতম বিজ্ঞান হিসেবে ইতিহাসের অপরিহার্য শর্ত এই যে, এর উপাদানসমূহ যথার্থতার সাথে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং ঘটনাবলী সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনাকারীদের ওপর। অতএব ঐতিহাসিক সমালোচনার সর্বপ্রথম মৌলিক নীতি হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীর সাক্ষ্য বিচারের সময় তার ব্যক্তিগত চরিত্রের কথাও বিবেচ্য। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

'হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন মন্দ–স্বভাব ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন বিবরণ নিয়ে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে নিঃসন্দেহ করে নাও।' (৪৯ঃ ৬)

রাসূলের হাদীস বর্ণনাকারীগণের প্রতি এই আয়াতে বর্ণিত নীতি প্রয়োগের ফলেই ঐতিহাসিক সমালোচনার কানুনগুলো ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হয়েছিল। মুসলিম জগতে ঐতিহাসিক অনুভূতির বিকাশ একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। অভিজ্ঞতার প্রতি কুরআনের অঙ্গুলি নির্দেশ, রাসূলের যথার্থ বাণী নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা এবং ভাবীকালের জন্যে প্রেরণার স্থায়ী উৎসের সংরক্ষণ––এ–সবের তাকিদেই ইবনে তাবারী এবং মাসুদীর মতো প্রতিভার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু একটা প্রকৃত বিজ্ঞানরূপে গড়ে ওঠার প্রথম স্তরে পাঠকের কল্পনা–উদ্দীপক শিল্প হিসেবেই ইতিহাস গড়ে ওঠে। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন বিস্তৃততর অভিজ্ঞতা, বাস্তব বিচার–বুদ্ধির অধিকতর পরিপক্বতা এবং শেষতঃ জীবন ও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলো মৌলিক ধারণার পূর্ণতার উপলব্ধি। এই ধারণা প্রধানতঃ দ'ুটি এবং দু'টিরই সাথে কুরআনের শিক্ষার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

১. মানব জাতির আদি উৎসের একত্ব। কুরআনে বলা হয়েছেঃ *"এবং আমরা তোমাদের সকলকে একই শ্বাসবায়ু থেকে সৃষ্টি করেছি।"* কিন্তু জীবনের অখন্ডতা বিলম্বে উপলব্ধ হয় এবং এর বিকাশ নির্ভর করে পৃথিবীর ঘটনা–প্রবাহের সাথে সংযোগের ওপর। অতি দ্রুত একটা বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এই সুযোগ মুসলমানেরা পেয়েছিল। অবশ্য ইসলামের পূর্বে খৃষ্টান ধর্ম মানুষকে সাম্যের বার্তা শুনিয়েছিল, কিন্তু খৃষ্টান রোম সাম্রাজ্য সমগ্র মানব–সমাজকে একটা জৈবসত্তারূপে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। ফ্লিন্ট যথার্থই বলেছেনঃ

'সমগ্র মানব–সমাজের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে সাধারণ এবং অস্পষ্ট ধারার অতিরিক্ত একটা গভীরতর উপলব্ধির কৃতিত্ব কোন খৃষ্টান লেখককেই দেয়া যেতে পারে না, রোম সাম্রাজ্যের অন্য কাউকে তো দেওয়া যেতেই পারে না।'

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই চিন্তাধারা যে ইউরোপে গভীরতর এবং বদ্ধমূল হয়েছে তাও মনে হয় না। পক্ষান্তরে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জিগির-মুখর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় উদার মানবতাবোধের বিনাশের সম্ভাবনাই বরং দেখা গেছে। মুসলিম জগতে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে। এখানে এই চিন্তাধারা কোন শুষ্ক দার্শনিক প্রত্যয়ও নয় কিম্বা নিছক কাব্যিক স্বপ্নও নয়। সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল এই চিন্তাধারাকে মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের উপাদানে পরিণত করা এবং এইভাবে নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে একে পূর্ণতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

২. কালের বাস্তবতা সম্বন্ধে একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং জীবন যে কালের বুকে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ-এই ধারণা। জীব-জগত ও সময়ের এই ধারণা ইবনে খালদুনের ইতিহাস পর্যালোচনার একটি প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। এ জন্যই ফ্লিন্ট প্রশংসা করে বলেছেনঃ "প্লেটো, এরিষ্টটল, অগাষ্টাইন-এরা তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না এবং অন্যান্যদের নাম তাঁর নামের সাথে উল্লেখ পর্যন্ত করা চলে না।" উপরে আমি যে মন্তব্য করেছি তার উদ্দেশ্য ইবনে খালদুনের মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা নয়। আমার মোটামুটি বক্তব্য এই যে, ইসলামী তমদ্দুনের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, একমাত্র মুসলমানের পক্ষেই ইতিহাসকে কালের বুকে একটা অবিচ্ছিন্ন সমষ্টিগত প্রগতি হিসেবে এবং একটা অনিবার্য বাস্তব বিবর্তন হিসেবে বিচার করা সম্ভব। এই ইতিহাস পর্যালোচনার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইবনে খালদুন কিভাবে পরিবর্তন-ধারাকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এর অর্থ এই যে, কালগত প্রগতি হিসেবে ইতিহাস নিছক সৃষ্টিধর্মী প্রগতি এবং এই প্রগতি পূর্ব-নির্ধারিত নয়। ইবনে খালদুন তত্ত্ব-দার্শনিক ছিলেন না, বস্তুত তিনি তত্ত্ব-দর্শনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; কিন্তু তাঁর কাল-উপলব্ধির কথা বিবেচনা করে তাঁকে অনায়াসে বার্গসঁর *(Bergson)* পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। ইসলামী তমদ্দুনের ধারায় এর পূর্ববর্তী চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কুরআনে 'দিবা-রাত্রির' আবর্তনকে 'প্রত্যেক মুহূর্তে নবতম মহিমায় প্রকাশমান' পরম সত্তার প্রতীক বলা হয়েছে; মুসলিম দর্শনে কাল-কে বিষয় কেন্দ্রিক রূপে ধারণা করা হয়েছে; ইবনে মাস্কাওয়েহ্ প্রাণীজগতের বিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করেছেন এবং প্রকৃতির পরিবর্তন ধারা একটা পরিণতির অভিমুখী-আল্‌বেরুনী এই ধারণার নিকটবর্তী হয়েছেন; এ-সব চিন্তাধারাই ইবনে খালদুন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি যে তমদ্দুনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তার মর্মরূপকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই উপলব্ধিকে ভাষায় সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত রচনাবলীতে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার বিরোধী কুরআন গ্রীক চিন্তাধারার ওপর বিজয়ী হয়েছে। কারণ, হয় প্লেটো এবং জেনোর অনুসরণে গ্রীকরা কাল-কে অবাস্তব মনে করত, নয় হেরাক্লিটাস ও ষ্টোয়িকদের *(stoics)* অনুসরণে তারা একে চক্রবৎ পরিবর্তনশীল বলে মনে করত। সৃষ্টিধর্মী প্রগতির অগ্রগমন বিচারার্থে যে-কোন মানদন্ডই কল্পনা করা হোক না কেন, এই প্রগতিকে যদি

চক্রধর্মী মনে করা হয় তবে, এ আর সৃষ্টিধর্মী থাকতে পারে না। চিরন্তন পৌনঃপুনিকতা চিরন্তন সৃষ্টিক্রিয়া নয়; এ হচ্ছে চিরন্তন পুনরাবৃত্তি।

মনন-জগতে গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিদ্রোহের তাৎপর্য আমরা এবার বুঝতে পারব। কেবল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেই এই বিদ্রোহের পতাকা উড়েছিল, তাতে বোঝা যায় যে, গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কুরআনের ক্লাসিক্যালবিরোধী প্রকৃতিই জয়ী হয়েছিল।

স্পেঙ্গলারের *'পাশ্চাত্যের অবনতি'* *(The Decline of the West)* নামক বহুল প্রচারিত গ্রন্থ যে গুরুতর ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে, এবার তা খন্ডন করা দরকার। তাঁর গ্রন্থে আরব তমদ্দুন নিয়ে আলোচিত দু'টি অধ্যায় এশিয়ার তামদ্দুনিক আলোচনার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম তমদ্দুনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি অধ্যায় দু'টি লিখেছেন। স্পেঙ্গলারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (থিসিস) এই যে, প্রত্যেক তমদ্দুনই একটা বিশেষ জৈবধর্মী সৃষ্টি, পূর্বগামী অথবা অনুগামী তমদ্দুনসমূহের সাথে তার কোনোই সংস্পর্শ নেই। বস্তুতঃ তাঁর মতে, প্রত্যেক তমদ্দুনের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা অন্য তমদ্দুন-অনুসারীর পক্ষে অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব। এই থিসিস প্রমাণের আগ্রহে তিনি অসংখ্য প্রমাণ ও ভাষ্যের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে, ইউরোপীয় তমদ্দুনের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ক্লাসিক্যাল-বিরোধী এবং এই ক্লাসিক্যাল-বিরোধী তমদ্দুন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য। এর পেছনে ইসলামী তমদ্দুনের কোনোই প্রেরণা নেই এবং স্পেঙ্গলারের মতে ইসলামী তমদ্দুন সম্পূর্ণরূপে ম্যাজিয়ান-ধর্মী। আমার মতে, আধুনিক তমদ্দুনের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যথার্থ। কিন্তু আমার বক্তৃতাবলীতে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, আধুনিক জগতে ক্লাসিক্যাল-বিরোধী মনোভাবের মূলে আছে গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিদ্রোহ। স্পষ্টতই এই অভিমত স্পেঙ্গলার গ্রাহ্য করবেন না। কারণ, যদি এটা দেখানো সম্ভব হয় যে, আধুনিক জগতের ক্লাসিক্যাল-বিরোধী মনোভাবের পেছনে এর পূর্বগামী তমদ্দুনের প্রেরণা বর্তমান, তা হলে তমদ্দুনসমূহের স্বাধীন বিকাশের ভিত্তির ওপর স্থাপিত তাঁর সমস্ত যুক্তি-সৌধই ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এই থিসিস প্রমাণের আগ্রহ স্পেঙ্গলারের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করে ফেলায় তিনি ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি।

'ম্যাজিয়ান তমদ্দুন' বলতে স্পেঙ্গলার ইহুদী, প্রাচীন চ্যালডিয়ান, প্রথম যুগের খৃষ্টান জোরোয়াস্ট্রীয়ান এবং ইসলাম-এই ম্যাজিয়ান শ্রেণীর প্রথম ধর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত তমদ্দুনকে বোঝাচ্ছেন। ইসলামের ওপর একটা ম্যাজিয়ান স্তর যে জমেছে তা আমি অস্বীকার করি না। বস্তুতঃ আমার এই সব বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্যই সেই ম্যাজিয়ান প্রভাবমুক্ত ইসলামের মর্মরূপকে পরিস্ফুট করে তোলা। আমার মতে, ইসলামের এই ম্যাজিয়ান-প্রভাবমুক্ত স্বরূপ স্পেঙ্গলারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কাল সমস্যা নিয়ে যে মুসলিম চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে এবং যেভাবে ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় স্বাধীন অভিজ্ঞতার কেন্দ্রস্বরূপ 'আমি'

স্ফূর্তি লাভ করেছে, সে-সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা বিস্ময়কর। মুসলিম চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে কালের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচলিত সেকেলে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশের পক্ষপাতী। একবার ভেবে দেখুন যে, তাঁর মত মহাপন্ডিত ব্যক্তি ইসলামের তথাকথিত অদৃষ্টবাদের সমর্থনে *'আইয়ামে গরদিশ'*ও *'সব কিছুরই সময় আছে'* ইত্যাদি প্রাচ্যদেশীয় প্রবচনের উদাহরণ দেন। যা-ই হোক, ইসলামের ইতিহাসে কালের ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট মানবাত্মা নিয়ে আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছি। ইসলাম আর এর আশ্রয়ে বর্ধিত তমদ্দুন সম্বন্ধে স্পেঙ্গলারের পূর্ণ সমালোচনা করতে হলে একটা প্রকান্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে যা বলেছি, তারপরে সাধারণভাবে আমি এখানে আর একটা কথা বলতে চাই।

স্পেঙ্গলার বলেনঃ

'ভবিষ্যদ্বক্তাগণের বাণী ম্যাজিয়ান-ধর্মী। একজন খোদা আছেন- তিনি জ্যোহোভা হোন, আহুরমজদা হোন অথবা মারদুক-বাল হোন তিনি মঙ্গলের অধিপতি এবং অন্যান্য দেবতাগণ হয় অকর্মা, না হয় অমঙ্গলকারক। এই বিশ্বাসের সাথে এই আশাও পোষণ করা হতো যে, একজন পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। খৃষ্ট ধর্মে এটা পরিষ্কার। অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাকিদে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এরূপ মনোভাব সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। ম্যাজিয়ান ধর্মের এ হচ্ছে গোড়ার কথা। কারণ, এর পেছনে মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে সংগ্রামের ধারণা বর্তমান। মধ্যবর্তী জামানায় মঙ্গল প্রাধান্য লাভ করবে, কিন্তু অবশেষে বিচারের দিনে মঙ্গল বিজয়ী হবে।'

যদি এই অভিমত ইসলাম সম্বন্ধেও পোষণ করা হয়, তবে স্পষ্টতঃই এ হবে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা। এখানে লক্ষণীয় এই যে, ম্যাজিয়ানগণ অপদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে, অবশ্য এরূপ দেবতার উপাসনা তারা করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম এরূপ দুষ্ট দেবতার আদৌ কোন অস্তিত্বই স্বীকার করে না। ইসলামে নবুয়তের অবসান-বিষয়ক অভিমতের তামদ্দুনিক তাৎপর্য স্পেঙ্গলার বুঝতে পারেননি। অবশ্য ম্যাজিয়ান তমদ্দুনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জরাথুষ্ট্রের অজাত সন্তান, পবিত্রতা, অথবা বাইবেলের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত শান্তিকর্তার জন্যে শাশ্বত প্রতীক্ষা। যাঁরা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে কোন্ পথে ইসলামের অবসানবাদের অর্থ খুঁজতে হবে, সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই দিকনির্দেশ করেছি। ইসলামের এই অবসানবাদ ম্যাজিয়ান মানসিকতার শাশ্বত প্রতীক্ষা-রোগের প্রতিষেধক ঔষধ বলা যেতে পারে। এরূপ প্রতীক্ষা ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। ম্যাজিয়ান চিন্তাধারার প্রভাবে ইসলামে অনুরূপ প্রতীক্ষাবাদের কিঞ্চিত ছোঁয়াচ লেগেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইসলামে যে অমন নতুন কারো আবির্ভাবের কথা নেই, একথা ইবনে খালদুন অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করে গেছেন। *[সংকলিত]*

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ তাঁর গবেষণা ও সাহিত্য সাধনা

শরীফুল মুজাহিদ

বাংলাদেশী এবং বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ইকবাল চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ অন্যতম। ইকবালের কালজয়ী অনিন্দ্যসুন্দর আবেদন ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় হওয়াতে অনেকেই ইকবালের গদ্য ও পদ্যকে বুঝেছেন অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু, একত্রে অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী (কামিল হাদীস, এম, এ, ট্রিপল–উর্দু, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, এমফিল–স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা ও পি·এইচ–ডি–ফারসী সাহিত্য) প্রফেসর সাহেব বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও হিন্দী––এ ভাষাগুলো সমানভাবে রপ্ত করেছেন। তাই, ইকবালকে বুঝতে তাঁকে অনুবাদের শরণাপন্ন হতে হয়নি; দ্বারে যেতে হয়নি অন্যের। এছাড়া তিনি আকালের এ প্রেক্ষাপটেও গবেষক হিসেবে খ্যাত ও সমাদৃত। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৩। এছাড়া এসব ভাষায় তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যার ফিরিস্তী দীর্ঘই বলা চলে। তিনি আল্লামা ইকবাল সংসদএর অন্যতম উপদেষ্টা। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থের আলোচনা এবং গবেষণাকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

২

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। ১৯৩২ সালের ১ এপ্রিল তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীর বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙা খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং নিরলস গবেষক প্রফেসর আবদুল্লাহর পিতা মরহুম মুখলিছুর রহমান ছিলেন তদানীন্তন সময়ের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম মাদ্রাসায় পাঞ্জুম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। সে সময় তিনি শশম পরীক্ষায় জেলা বোর্ড বৃত্তি লাভ করেন। প্রফেসর আবদুল্লাহ ১৯৪৩ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৫ সালে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে হাদীস শাস্ত্রের ওপর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম আই· আই·

কলেজ (বর্তমানে হাজী মুহসিন কলেজ) থেকে ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আই· এ· পাস করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উর্দুতে বি· এ· (অনার্স) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম এবং কলা অনুষদে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উর্দুতে ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম· এ· ডিগ্রী লাভ করেন।

মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি কর্মজীবনে আত্মনিয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন সরকারী মাদ্রাসা এবং কলেজে প্রায় ১৮ বছর নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনা করে সুখ্যাতি লাভ করে ধন্য হন। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন তিনি ১৯৭৮ সালে। ১৯৮৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

উল্লেখ, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি যথাক্রমে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিষয়ে ১ম শ্রেণীর আরো দু'টি ডিগ্রী লাভ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে এম·ফিল ও পি· এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এতোগুলো ডিগ্রীর অধিকারী ও গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর আবদুল্লাহ শুধু একটি নামই নয়; তাঁকে গবেষণা জগতে এক ইন্সটিটিউট বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলার কৃতী এই সন্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, হাকীম হাবীবুর রহমান স্মৃতি সংসদ ইত্যাদি সংস্থার অন্যতম সদস্য। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে। আমাদের জানা মতে, তাঁর ন্যায় আর কোন বাংলাদেশী জ্ঞান সাধকের এত বেশী উর্দু লেখা প্রকাশিত হয়নি। বিচারের মানদণ্ডে আনলে তাঁর উর্দু প্রবন্ধগুলোর সাহিত্যিক মান দিল্লী-লখনৌ-খয়রাবাদ, করাচী- লাহোরের উর্দূ ভাষাভাষী প্রবন্ধকারদের লেখার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বলেই মনে হয়।

উর্দূ ভাষাভাষী লেখক, কবি-সাহিত্যিকদের থেকে তিনি স্বীকৃতিও লাভ করেছেন প্রচুর। লাহোরস্থ *'সাইয়ারা'* পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদ উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৬ সালে তাঁকে *'নিশান-ই-উর্দূ'* খেতাবে ভূষিত করেন।

প্রফেসর সাহেবের অনেকগুলো গবেষণামূলক বাংলা প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা এবং আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকায় (ইকবাল স্টাডিজ) প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলের ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন প্রকাশিত চার খন্ডবিশিষ্ট *'বাংলাবিশ্বকোষ'*-এ উর্দু, ফারসী ও পাঞ্জাবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর ৩০০-এরও বেশী ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষেও তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ সাহেবের ১৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এযাবৎ। ১টি যন্ত্রস্থ ও ৩টি প্রকাশের অপেক্ষায়। সফল অনুবাদক প্রফেসর সাহেবের উর্দূ থেকে বাংলায় কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম উর্দুতে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ উর্দূ ভাষাভাষীদের উপহার দেন। ১৯৬৫ সালে করাচীস্থ *'সাকী'* পত্রিকা *'নজরুল'* নম্বর শিরোনামে শুধু তাঁর এ লেখাটিকেই ক্রোড়ে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকাস্থ *'পাকিস্তান একাডেমী'* থেকে ১৯৭১ সালে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

ডঃ সাহেবের আরো একটি উর্দু গ্রন্থ *'ইকবাল আওর টেগোর'* শীর্ষক শিরোনামে লাহোরস্থ *'সাইয়ারা'*করাচীস্থ*'সাকী'* ও *'ফারান'* পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি আল্লামা ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশী যিনি উর্দু ভাষার খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের বাংলাভাষীদের সাথে এবং বাংলা ভাষার খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উর্দুভাষীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদেশে অনেক খ্যাতিমান আরবী-উর্দু-ফারসী জ্ঞানী-গুণী ওলামায়ে কেরাম বিগত হয়েছেন। তাঁদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কোন বই লেখা হয়নি। এ কাজ করার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে ডঃ সাহেব এগিয়ে এসে *'বাংলাদেশেফারসীসাহিত্য'* ও *'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ'* নামে দু'টি বই রচনা করেন। এতে করে এদেশের অনেক আলেম ও কবি-সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁদের আরবী-ফারসী চর্চার নিখুঁত ইতিবৃত্ত উপস্থাপনার ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে।

অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণাই হলো প্রফেসর সাহেবের জীবন ব্রত। সরবতার এ যুগে যশ-খ্যাতির উর্ধ্বে তিনি। নীরবে, নিঃশব্দে গবেষণাই তাঁর জীবনের অন্যতম সাধনা। তাঁর ব্যস্ত জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশই কেটে যায় গ্রন্থাগারে। এদেশের আনাচে-কানাচে গিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তিনি সন্ধানী গবেষক। স্বভাব সঞ্জাত গবেষক বলেই তিনি যেখানেই যে-কোন দুর্লভ তত্ত্ব ও তথ্য পেয়েছেন তা বিভিন্নভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন-এটা তাঁর উদারতা ও জ্ঞান সাধনারই পরিচয়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এদেশের উদীয়মান লেখক-সাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষককে উদারভাবে গাইড-লাইন দিয়ে যাচ্ছেন।

৩

জনাব আবদুল্লাহ মুসলিম জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন। ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম রাজনীতি ক্ষেত্রে যে-সব বাংলা ভাষাভাষী রাজনীতিক এবং উপমহাদেশের যে-সব দিশারী মুসলিম জাগরণের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের জীবন , কর্ম ও দর্শন নিয়ে তাঁর রচনাবলী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং যেগুলো প্রকাশ হয়নি নিম্নে তাঁর সে-সব রচনাবলীর ফিরিস্তী সন্নিবেশিত হলোঃ

আল্লামা ইকবাল

ক্রমিক	গ্রন্থের নাম	প্রকাশক	সাল	পৃষ্ঠা
১·	মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	অক্টোবর'৮০	৫৮৮
২·	স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুন'৮২	৬০৫
৩·	বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুন '৮৩	৪৪৮
৪	নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা	বাংলাদেশ ব্রাক পাবলিকেশন, ঢাকা	জুন '৮৭	৮৯
৫·	হাকিম হাবীবুর রহমান	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুন'৮১	৮০
৬·	মওলানা ওবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	আগস্ট '৮৪	১৭৫
৭·	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুলাই '৮৬	২৯৭
৮	নওয়াব সলীমুল্লাহ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	ডিসেম্বর '৮৬	৪৩৪
৯·	নওয়াব আলি চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	আগস্ট '৮৭	২১৩
১০·	মাওলানা মুহম্মদ আলী জওহর	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	মে '৮৭	১৫০
১১·	পশ্চিম বঙ্গে ফারসী সাহিত্য	ইরান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশের জন্য গৃহীত		
১২·	ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	মে '৮৬	৩১৫
১৩·	মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিঃ জীবন ও কর্ম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশের জন্য গৃহীত	'৮৮	১১১
১৪·	স্যার আবদুর রহীম ঃ জীবন ও কর্ম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুন'৯০	২৫১
১৫·	বাংলাদেশের দশ দিশারী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	'৯০	৩৩১
১৬·	মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী	(প্রকাশিতব্য)		১৮০
১৭·	নজরুল ইসলাম (উর্দু)	পাকিস্তান একাডেমী	'৭১	২৫৪
১৮	ভারতে বিদ্রোহের কারণ (অনূদিত) মূল স্যার সৈয়দ আহমদ খান	সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ ১ম, প্রঃ	নভেম্বর '৭০	৯০
১৯·	ইসলামী দর্শন (অনূদিত) ১ম ২য় খণ্ড মূলঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সেপ্টেম্বর '৮১	৪১০
২০·	মুফীদ উর্দু মাজামীন (উর্দু) ১ম ২য় খন্ড		অক্টোবর'৬২	২০৮
২১·	Some Muslim stalwarts	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	জুন '৮০	৫৬
২২·	ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ (উর্দু)			
২৩·	মুসাদ্দাস –ই–হালী (অনূদিত) মূলঃ আলতাফ হোসেন হালী	জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা বাংলাদেশ		১৪৩

মোট পৃষ্ঠাঃ ৫, ৫৫৭

স্মর্তব্য যে, মুসাদ্দাস–ই–হালী বইটি জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশের পর্যায়ে গিয়েও জনসমখ্যে আসেনি। ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। এবার বইটি ছাপার অর্ডার হলেও ছাপা হয়নি।

৪

প্রফেসর আবদুল্লাহ সাহেবের স্বরচিত ও অনুবাদ গ্রন্থ মিলিয়ে বাংলা, ইংরেজী ও উর্দুতে এযাবত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ৫,৫৫৭ পৃষ্ঠা। এছাড়া এ পর্যন্ত তিনি যে–সব প্রবন্ধ লিখেছেন তার ফিরিস্তী নিম্নরূপঃ

১. সাহিত্যে নজরুল ইসলামের স্থান, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, লাহোর, অক্টোবর, ১৯৬৪, ২· রবী ঠাকুর ও ইকবালের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, লাহোর, অক্টোবর, '৬৫, ৩· রবী ঠাকুর ও ইকবাল সাহিত্যে মৃত্যু দর্শন, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, এপ্রিল, '৬৫, ৪. জীবনের কবি রবী ঠাকুর ও ইকবাল, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, জুন '৬৫, ৫. ল ্ন শাহ এবং তাঁর সঙ্গীত, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, জুলাই, '৬৫, ৬. ইসলাম ও রবী ঠাকুর, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, আগস্ট, '৬৫ ৭. মুনশী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাহিত্য ও জাতীয় খেদমত, উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, জুলাই, '৬৬। ৮. রবী ঠাকুর ও ইকবাল কাব্যে সৃষ্টির বিবর্তন , উর্দু, মাসিক সাইয়ারা, সেপ্টেম্বর, '৬৬। ৯. হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং ফরায়েজী আন্দোলন, মাসিক সাইয়ারা, ডিসেম্বর '৬৬। ১০. সাহিত্য ও আর্টে নৈতিকতা, মাসিক সাইয়ারা, অক্টোবর, '৬৭। ১১. ইসমাঈল হোসেন শিরাজী এক নজরে, সাইয়ারা, জুন, '৬৮। ১২. পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতি, সাইয়ারা, মার্চ, '৬৯। ১৩. ধর্ম ও নৈতিকতায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অবদান, মাসিক ফারান, করাচী, মে, '৫৬। ১৪. নজরুল ইসলাম, ইকবাল ও রবী ঠাকুর এক নজরে, ফারান , করাচী, ফেব্রুয়ারী, '৬৫। ১৫. নজরুল ইসলাম ও সঙ্গীত, বার্ষিক জুয়েবার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জুন '৬৫। ১৬. নজরুল ইসলাম এক নজরে, মাসিক সাকী, জুন '৬৫। ১৭· রবী ঠাকুর ও ইকবাল কাব্যে মানবতা, সাকী, মে '৬৫। ১৮. নজরুল ইসলাম সংখ্যা, সাকী, আগস্ট '৬৫। ১৯. বাংলার ওপর আরবী, ফারসী ও উর্দুর প্রভাব, সাকী, নভেম্বর, '৬৫। ২০· পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতি, সাকী, জুলাই, '৬৬। ২১. ইকবাল ও জিহাদ, সাকী, অক্টোবর, '৬৬। ২২. ইকবাল বাংলায়, মাসিক মাহে নও, করাচী, এপ্রিল, '৬৫। ২৩· নজরুল ও জোশ, মাহে নও, মে, '৬৫। ২৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মাহে নও, জুন, '৬৫। ২৫· হালী ও বঙ্কিম, মাহে নও, নবেম্বর, '৬৫। ২৬· আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, মাহে নও, জানুঃ '৬৬। ২৭. ইসলাম ও জাতীয় প্রতিরক্ষা, মাহে নও, ফেব্রুয়ারী, '৬৬। ২৮. পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, দৈনিক যমীনদার, লাহোর, সাহিত্য পাতা। ১৩৭৫ হিজরী। ২৯. পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর নতুন রূপ, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, '৬৫, সাহিত্য পাতা, ১২ ফেব্রুয়ারী। ৩০. উর্দূ ভাষার জন্ম এবং ক্রমবিকাশে হিন্দুদের ভূমিকা, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, '৬৬, ১৪ এপ্রিল, সাহিত্য পাতা, ৩১· ধর্ম সেবায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অবদান, দৈনিক পাসবান, '৬৫ ১০ এপ্রিল সাহিত্য পাতা,

৩২. ঐ ৩৩. পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, দৈনিক পাসবান, ১৯ জুন, '৫৬, সাহিত্য পাতা, ৩৪. উর্দু ব্যাকরণ এক নজরে , পাসবান, ৩ জানুয়ারী, ৫৭, সাহিত্য পাতা, ৩৫. বাংলার ওপর উর্দুর প্রভাব, পাসবান, ২৩, জানুয়ারী, '৫৭, সাহিত্য পাতা, ৩৬· প্রাচীন বাংলা ও উর্দু, পাসেবান, ২০ আগস্ট, '৫৭, সাহিত্য পাতা, ৩৭. শেখ সাদী এবং তাঁর অমর কীর্তি –গুলিস্তাঁ, দৈনিক পাসবান, ২১ আগস্ট, '৬০, সাহিত্য পাতা, ৩৮. প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইকবালের দৃষ্টিতে, পাসবান, আগস্ট, '৬০, সাহিত্য পাতা। ৩৯. ইকবালের নয়া জাহান পাসবান, ১১ সেপ্টেম্বর, '৬০, সাহিত্য পাতা। ৪০. নজরুল ইসলাম–এক নজরে, পাসবান, ১৫ জানয়ারী, '৬২, সাহিত্য পাতা। ৪১. পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নজরুল ইসলামের প্রভাব, পাসবান ৩১ জানুয়ারী, '৬২, সাহিত্য পাতা। ৪২. নজরুল কাব্যে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের ব্যবহার, পাসবান, ১৪ ফেব্রুয়ারী, '৬২, সাহিত্য পাতা। ৪৩. নজরুল কাব্যের এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, পাসবান, ২৩ মার্চ, '৬২, সাহিত্য পাতা। ৪৪. নজরুল কাব্যে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার, পাসবান, ১৬ আগস্ট, '৬৪, সাহিত্য পাতা। ৪৫. নজরুল কাব্যে ইসলামের রূপ, পাসবান, ৫ জুলাই, '৬৪, সাহিত্য পাতা। ৪৬. বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব, ১৭ জুলাই, '৬৬, সাহিত্য পাতা। ৪৭· বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব ২৪ জুলাই, '৬৬, সাহিত্য পাতা। ৪৮. বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব, পাসবান, ৩১ জুলাই, '৬৬, সাহিত্য, পাতা। ৪৯. বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব, ৭ আগস্ট, '৬৬, সাহিত্য পাতা। ৫০. নজরুল–সাহিত্য বাংলা, মাসিক মোহাম্মদী, '৬৬, জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ়। ৫১· নওয়াব মুহসিনুল মুলক , ইংরেজী, মাসিক কারেন্ট নিউজ, ঢাকা, অক্টোবর, '৭০। ৫২. মাওলানা শিবলী নু'মানী, ইংরেজী, ঐ, নবেম্বর, '৭০। ৫৩. হাজীশরীয়তুল্লাহ, ইংরেজী, ঐ জানু–মার্চ, '৭১। ৫৪. ইকবালের নয়া জাহান, বাংলা, মাসিক সওগাত, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৭৩। ৫৫. স্যার সৈয়দ আহমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা, বাংলা মাসিক সওগাত, ঢাকা, আষাঢ়–শ্রাবণ, ১৩৮১। ৫৬, ঐ, ভাদ্র, ৫৭. ঐ। মাঘ, ৫৮. ঐ। ফাল্গুন–চৈত্র, ৫৯, ঐ, বৈশাখ, ১৩৮২। ৬০. ঐ। জ্যৈষ্ঠ, ৬১. ঐ, আষাঢ়, ৬২. ঐ শ্রাবণ–ভাদ্র। ৬৩. মানসিক বিপ্লব সাধনে ডক্টর ইকবাল, সওগাত, আশ্বিন–কার্তিক, ১৩৮২, ৬৪. ঐ ভাদ্র। ৬৫. ঐ, মদীনা, ঢাকা, জুলাই '৭৪, ৬৬. ঐ, এপ্রিল '৭৫। ৬৭. ঐ। জুলাই, '৭৬। ৬৮. প্রকৃতির ওপর মানব আধিপত্য, বি. এম. কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন, বরিশাল, আগস্ট, '৬৪। ৬৯ . পাকিস্তানের পটভূমিতে নজরুল সাহিত্য, মাসিক দর্পণ, বরিশাল, কার্তিক, ১৩৭৩। ৭০. সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাসিক মদীনা, ঢাকা, জুন, '৭৪। ৭১. জ্ঞান তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মদীনা, জুলাই '৭৪। ৭২. নীল নদের কবি হাফেজ ইব্রাহীম, মদীনা, সেপ্টেম্বর, '৭৪। ৭৩. মওলানা মোহাম্মদ আলী, মদীনা, ফেব্রুয়ারী, '৭৫। ৭৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা ও সাহিত্য সাধনা, মদীনা, জুলাই, '৭৬। ৭৬. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা), ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, বৈশাখ–আশ্বিন, ১৩৮০। ৭৭. জ্ঞান সাধনা ও জ্ঞান বিস্তারে মওলানা শিবলী নুমানী, ইসলামী একাডেমী

ঢাকা, জুন–মে, '৭৩। ৭৮. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঐ, এপ্রিল–জুন '৭৪। ৭৯. ঐ, জুলাই–মে এবং অক্টোবর–ডিসেম্বর, '৭৪। ৮০. ডক্টর তাহা হোসাইন, মাসিক তাহজীব, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৮১। ৮১. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর কুরআনের প্রভাব, ঐ, শ্রাবণ–আশ্বিন, ১৩৮১। ৮২. বিশ্ব নবীর সংস্কার–অভিযান ও তাঁর বৈশিষ্ট্য, ঐ, ফাল্গুন–চৈত্র, ১৩৮১। ৮৩. জাতীয় জাগরণে মওলানা হাসরত মুহানী, ঐ, এপ্রিল, '৭৬। ৮৪· ঐ, মে, '৭৬। ৮৫· ডক্টর ইকবাল ও কবি গোলাম মোস্তফা, তুলনামূলক আলোচনা, ঐ। ৮৬. ঐ। ৮৭. ঐ, ৮৮. ইসলামী দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর–ডিসেম্বর, '৭৬। ৮৯. ঐ, ৯০. জাতীয় জাগরণে মওলানা জাফর আলী খাঁ, মদীনা, সেপ্টেম্বর, '৭৭। ৯১. *Ibn-Taimiyah. The Great reformer of the Muslim world.* বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ নভেম্বর, '৭৭। ৯২. জোশ মালিহাবাদী ও নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা। ৯৩. বিস্মৃত এক প্রতিভা–মাওলানা আবদুল কাদের, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর–ডিসেম্বর '৮১। ৯৪. উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ–আশ্বিন '৮৮। ৯৫. বঙ্গীয় আরবী শিক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন '৮৪। ৯৬· মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা, ঐ· ফেব্রুয়ারী, '৮৫। ৯৭· নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, ঐ, অক্টোবর, '৮৫। ৯৮. *Abdul Ghafur Nassakh, Khunawisht Sawanih-i-Hayat-i-Nassakh.* এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ডিসেম্বর, '৮৭। ৯৯. আব্দুল গফুর নাস্সাখুদ–নাবিশত সাওয়ানিহ–ই–হায়াত–ই–নাস্সাখ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ডিসেম্বর, '৮৭, ১০০. সাংবাদিকতা, সাহিত্য চর্চা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আবদুর রউফ ওহীদের ভূমিকা, সাহিত্য পত্রিকা, ঢা· বি· জুন, '৮৮। ১০১. উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কিছু মৌলিক উপাদান, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র সেমিনার প্রবন্ধমালা (১), জুন, ১৯৮৫। ১০৩. শেখ ইতিসাম উদ্দীনের লন্ডন সফর, ঢা. বি. মে, '৮৯।

এই হলো প্রফেসর সাহেবের প্রবন্ধের বিবরণ। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় লেখা তাঁর ১০৩টি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা (ম্যাগাজিন) ১০১৩। অবশ্য, দৈনিক পত্রিকায় ছাপা প্রবন্ধের পৃষ্ঠার হিসাব দেয়া সঠিকভাবে সম্ভব নয়। উল্লেখ, এসব প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করেই পরে রচিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ। অনেক প্রবন্ধ বইতেও সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫

প্রফেসর সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর উপর দেশের লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী আলোচনা–পর্যালোচনা করেছেন। ভূমিকা, প্রসঙ্গ কথা, আমাদের কথায় তাঁর রচনাবলীর মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ নিবন্ধে তাঁর রচনাবলীর মূল্যায়নের কিছুটা অংশ উপস্থাপন প্রয়োজন মনে করছি।

বাংলাদেশের দশ দিশারী গ্রন্থের মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রো–ভিসি নিষ্ঠাবান গবেষক প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমদ লেখেন ঃ

"প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ একজন নিষ্ঠাবান এবং সংস্কৃতি–প্রেমিক গবেষক। ইংরেজীতে যাকে প্রোলিফিক রাইটার বলে, তিনি তা–ই। বিগত এক দশকে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হলো ১৫।···এগুলির মধ্যে ৩/৪ খানি গ্রন্থের রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন সত্তরের দশকে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ খুব কম লেখকেরই আছে। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ গবেষণামূলক। প্রতিটি গ্রন্থে শ্রম ও মেধার ছাপ আছে। তিনি প্রায় লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে নীরবে নিরলস কাজ করে এক অসাধ্য সাধন করেছেন,–আর এভাবেই তিনি *দশ দিশারীর* সন্ধান দিতে গিয়ে নিজেও একজন দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এরূপ একটি গবেষণামূলক ও গঠনমূলক কাজের জন্য আমি প্রফেসর আবদুল্লাহকে অভিনন্দন জানাই। তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে কাজের স্বীকৃতি পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।"

ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এক প্রত্যয়নপত্রে লেখেনঃ

'এতদ্বারা প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা কর্মসূচীর অধীনে কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নিম্নলিখিত গবেষণা কর্মগুলো অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করেছেনঃ

১. পূর্ববঙ্গে ফার্সী সাহিত্য

২. পশ্চিমবঙ্গে ফার্সী সাহিত্য

৩. ঢাকার কয়েকজন সুধী

৪. স্যার আবদুর রহীম ঃ জীবন ও কর্ম

উপরে বর্ণিত গবেষণা কর্মগুলো বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর উল্লেখযোগ্য অবদান বলে আমরা মনে করি। আমরা অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।'

বাংলাদেশের দশ দিশারী সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৯–৯০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখেঃ

ক. নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরী (খৃঃ ১৯১৪–বগুড়া)

খ. ব্যারিষ্টার আবদুর রসূল–(১৮৭২–১৯১৭ কুমিল্লা)

গ. নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২–১৯২২ কুমিল্লা)

ঘ. নওয়াব সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮–১৯১৩–কুমিল্লা)

ঙ. মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৬৯–১৯৩৬–টাঙ্গাইল)

চ. মৌলভী আবদুল করীম (১৮৩৬–১৯৪৩–সিলেট)

ছ. স্যার আবদুল করীম গযনভী (১৮৭৬–১৯৫৩–টাঙ্গাইল)

ঝ. খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন (১৮৬০–১৯৪১–বরিশাল)

ঞ. মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান (১৮৮৯–১৯৬০–ফরিদপুর)

এই দশজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব বৃটিশ ভারতের খ্যাতনামা মুসলমান রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আজ আমাদের দেশে আন্তরিক নেতৃত্ব দানের দারুণ অভাব। সেই প্রেক্ষাপটে সমাজ পরিবর্তনে যাঁহারা অতীতে বিশেষভাবে অবদান রাখিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী আগামী দিনের সমাজ নির্মাণে দিকনির্দেশনার কাজ করিবে। তাই গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।"

মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি–সাহিত্যিক–এর 'প্রসঙ্গ কথায়' ইসলামী ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন মহাপরিচালক এ· জেড· এম· শামসুল আলম লেখেনঃ

''মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় কবি–সাহিত্যিকগণ সম্মানজনক আসনের অধিকারী। জোয়ারের পর ভাটা পড়ে, আবার ভাটা শেষে উদ্দামবেগে ছুটে আসে কোটাল–এটাই প্রকৃতির নিয়ম। — কত যে বীর মুজাহিদের উষ্ণ খুন, কত যে ইসলামী চিন্তাবিদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা–রশ্মি, কত যে কবি–সাহিত্যিকের লোহিত লেখনী তাদের জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে, সে–সবের ইতিহাস তুলে ধরার সময় আগত।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সে পথে পা বাড়িয়েই *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি–সাহিত্যিক* শীর্ষক তাঁর বর্তমান গ্রন্থে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এমন বেশ কয়েকজন কবি–সাহিত্যিকের জাতীয় জাগরণমূলক অবদান উপস্থাপিত করেছেন, যাদের রক্ত লেখার সুধায় সয়রাব হয়ে এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ছত্র–ছায়ায় মুসলমানদের জাতীয় জীবনে এসেছে জাগরণের জোয়ার।"

লেখকের কয়েকটি কথায় ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ লেখেনঃ

''জাতির চিন্তানায়কদের নিয়ে রচিত হয় তার ইতিহাস। কেননা, তাঁদের হাতেই নির্ধারিত হয় জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত। তাঁদের উপরই নির্ভর করে জাতির ভাঙ্গা–গড়া। তাঁরা আপন চিন্তা–মুকুরে অদূর ও দূর ভবিষ্যতের এমন সব বস্তু দেখতে পান, যা সাধারণ লোকের পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয়। তাঁদের বাতলানো পথ ধরেই জাতি এগিয়ে চলে তার লক্ষ্যপানে।''

ভূমিকায় মুফাখখারুল ইসলাম লেখেন, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি–সাহিত্যিক* নামক গ্রন্থটি আমার এক সময়ের সহকর্মী (ঢাকা কলেজে ১৯৬৩–১৯৬৯) অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের বহু কঠোর পরিশ্রমের ফল। দেশ–বিদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী কবি–সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত জীবনসহ মুসলিম জাগরণে তাঁদের অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তিনি এ গ্রন্থে করেছেন। মোট ২৫টি দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধের সমাহার এ গ্রন্থটি। এতে

অধঃপতিত মুসলিমের উন্নয়নের পথে দাঁড়াবার আকুলি-বিকুলি ও সেই পথে তামদ্দুনিক অবদানের সঙ্গে চিন্তাধারাও সম্যক বিধৃত হয়েছে।"—

মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর জীবন ও কর্ম শীর্ষক বইয়ের মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন লেখেন ঃ

"বিগত কিছু দিনের মধ্যে উপমহাদেশের মুসলিম মনীষা সম্পর্কিত একাধিক সফল গবেষণা কর্মের রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। তাঁর নতুন বইটি ঔপনিবেশিক ভারতের বিতর্কিত এবং বহুল উচ্চারিত মুসলিম চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী সংক্রান্ত। উল্লেখ্য, মওলানা সিন্ধীর জীবন ও কর্মের ওপর এটাই হলো প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই।—সার্বিক প্রেক্ষাপটে মওলানা সিন্ধীর কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক দর্শন উপমহাদেশের সমাজ ও রাজনীতি সচেতন গবেষক, পাঠকের জন্য নতুন চিন্তার পথ-নির্দেশ করবে বলে মনে করি। প্রাপ্ত সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে মওলানা সিন্ধীর ওপর এমনি একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ ধন্যবাদার্হ।"

পশ্চিমবঙ্গেফার্সীসাহিত্য বইয়ে যাঁদের জীবনী এসেছে তাঁরা হলেন ঃ কলিকাতার ৩২ জন, মুর্শিদাবাদ জেলার ১১ জন, হুগলী জেলার ৯ জন, বর্ধমান জেলার ৩ জন, নদীয়া জেলার ২২ জন, মেদিনীপুর জেলার ২ জন, মালদহ জেলার ৩ জন, মোট ৬২ জন।

তাঁরা হলেনঃ মির্জা জান তাপিশ, মির্জা আলী লুতফ, রিযা হাসান খাঁ রিযা, আবদুর রহীম গোরখপুরী দাহরী, রশীদুন নবী ওয়াহশাত, আবদুর রাযযাক আফসার, মুহাম্মদ ওহদী, ফরজ আলী আসী, আমীর হাসান খাঁ, যিম মিল, ওজহুল্লাহ দাগ, নওয়াব আমীর আলী খান, উলফত হোসাইন ফরিয়াদ, আবদুল ওদুদ আওহাদ, মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন তাওফীক, ওয়াহিদ আলী শাহ আখতার, ডাঃ কামুদ্দীন সুলতান, শাহজাদা রহীমুদ্দীন, আগা আলী শামস, মোল্লা আবুল হাসান আসমারী, আবদুস সামাদ আযাম, সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন বুলবুল, এ, কুচাক, সৈয়দ মুহাম্মদ সাজ্জাদ, শিব প্রধান সাকিব, আবুল মাআলী, আবদুর রউফ ওহীদ, আসমান-জাহ বাহাদুর আনজুম, আবদুল হামিদ হামী, রাজা অপরূপ কিল্লান কুঁওয়ার, মীর্জা আহমদ আলী কাওকাব, আবদুল হাকীম শাদান, আবদুল আহাদ হাসমত, সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল গফুর শাহবায, সৈয়দ আশরাফুদ্দীন আহমদ, মীর্যা লুতফুল্লাহ মাখসুর, বারক, মীর রাযী আকদাস শুসতারী, মুন্সী সলীমুল্লাহ, সৈয়দ মুহাম্মদ আলী, আলী ইব্রাহীম খাঁ খলীল,' মির্যা আবু তালিব খান, সৈয়দ গোলাম হুসাইন খাঁ তাবাতাবাই আলীমাবাদী, নাজাফ আলী খাঁ, দুর্গা প্রসাদ শিগুফতা, নওয়াব হুসাইন আলী মীর্যা সুলায়মান, শাহ কুদরতুল্লাহ কুদরত, মুহাম্মদ সাদেক খাঁ আখতার, সৈয়দ কেরামত আলী জৌনপুরী, সৈয়দ ইসমাতুল্লাহ আনসাখ, লালা ক্ষেম নারায়ণ রিন্দ দিহলবী, জাওয়াদুল জাওয়াদ জাওদাত, মুইনুদ্দীন আলকা, আলী আসগার, আসাদুল্লাহ ওরফে আলী জান। সৈয়দ আবুদল ওদুদ আশেক নাকবী, মুনশী মুহাম্মদী খাদেম, লুৎফুর রহমান বর্ধমানী।

শিহাবুদ্দীন তালিম, শেক ইতিসামুদ্দীন, গোলাম বাতুল খাঁ তামদীন, সৈয়দ আলী দারমান ওরফে আলীজান।

মীর মুহাম্মদ মাসুম, গুলাম হুসাইন সলীম যয়দুপুরী, সৈয়দ এলাহী বখশ হুসাইনী।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা–বইয়ের প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করে হারভার্ড ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন আগাখান ভিজিটিং প্রফেসর অব ফাইন আর্টস মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম লেখেনঃ

"অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রণীত *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা* বিগত শতাব্দীতে উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজে যুগান্তর সৃষ্টিকারী এ মহামনীষীকে নতুন অথচ অতিগুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার এক প্রশংসনীয় ও সার্থক প্রচেষ্টা।"

আবদুল্লাহ সাহেব অবতরণিকায় লেখেনঃ

"চিত্রকে দূর থেকে দেখলে তার স্বাভাবিক রূপরেখা চোখের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটে উঠে। মহৎ লোক, নায়ক ও জাতির জনকদের মূল্য নিরূপণের বিষয়টিও তদ্রূপ। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার যথার্থতা দীপ্ত হয়ে উঠে তাঁদের অবর্তমানে। তাঁদের কার্যাবলীর সঠিক মূল্যায়ন হয় কালের কষ্টিপাথরে।'

মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর বইয়ের আমাদের কথায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–এর তদানীন্তন প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর লেখেনঃ "উপমহাদেশের ইতিহাসে *মওলানা মুহাম্মদ আলী* একটি সুপরিচিত নাম। তিনি এই হিমালয়ান উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রামের এক অকুতোভয় নায়ক। —দুঃখের বিষয়, আমাদের এই ইতিহাসের মহানায়কের উপর বাংলা ভাষায় ভাল কোন বই নেই। এ কারণেই ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রচিত গবেষণাধর্মী বর্তমান গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।"

ভূমিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম লেখেনঃ "—বইটির পাণ্ডুলিপি পড়াকালে আমার মনে হচ্ছিল, মতবাদে ও চিন্তাধারায় মৌলানার সাথে গ্রন্থকারের কোথাও ভাল একটা অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে। অক্লান্ত লেখক অধ্যাপক আবদুল্লাহর এই বইটি পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস।"

হাকীম হাবীবুর রহমান গ্রন্থের মুখবন্ধ–এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর সালাহ উদ্দীন আহমদ লেখেনঃ "অধ্যাপক আবদুল্লাহ সাহেব এই পুস্তকটি রচনা করে মরহুম মনীষী হাবীবুর রহমানের জীবনী ও রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সে জন্য আমরা নিষ্ঠাবান গবেষক অধ্যাপক আবদুল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ।''

এ, জেড, এম, শামসুল আলম সাহেব প্রসঙ্গ কথায় লেখেনঃ "হাকীম হাবীবুর রহমান এদেশের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাদ দিয়ে তদানীন্তন ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। '*বঙ্গভঙ্গ*' ও '*বঙ্গভঙ্গ রদ*' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে '*পূর্ব*

বাংলা'য় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে যে মুসলিম জাগরণ ও মুসলিম রাজনীতি গড়ে উঠেছিল, মরহুম হাকীম সাহেব ছিলেন তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।"

মওলানাওবায়দুল্লাহ্সুহরাওয়ার্দী গ্রন্থে আমাদের কথায় প্রফেসর আবদুল গফুর লেখেন ঃ

"যে জাতির ইতিহাস নেই, তার মতো দুর্ভাগা জাতি আর হতে পারে না। যে জাতি তার পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তার মত ভাগ্যবিড়ম্বিত কেউ হয় না। আমরা প্রকৃতই দুর্ভাগা এ কারণে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেকেরই পরিচয় জানি না, সুতরাং তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা পোষণের প্রশ্ন তো অবান্তরই মনে হবে।".....

বইটির মুখবন্ধে জনাব আজিজুর রহমান মল্লিক পি·এইচ–ডি লেখেন ঃ "মওলানা উবায়দুল্লাহ উবায়দীর জীবন ও তাঁর প্রকাশিত রচনার বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও গ্রন্থকার এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ মহৎ শিক্ষাবিদের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর একটি রূপান্তর আমাদের সামনে পেশ করে একটি উত্তম কাজ করেছেন। আশা করি, এ বইটি সুধী সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভে সমর্থ হবে। গ্রন্থকার জনাব আবদুল্লাহকে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ বইটির মুখবন্ধ লেখার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।"

লেখকের কথায় ডঃ আবদুল্লাহ লেখেন ঃ "বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাহরুল উলুম মওলানা উবায়দুল্লাহ আল–উবায়দী সুহরাওয়ার্দী ছিলেন আমাদের জাতীয় জাগরণের পূর্বাঞ্চলে উষার সংকেত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উপমহাদেশে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর স্থান অসামান্য। মুসলিম জাগরণ ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ প্রদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।"

নওয়াব আলী চৌধুরীঃ জীবন ও কর্ম শীর্ষক বইয়ের মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ কে মুহসীন লেখেনঃ "লেখকের সব বক্তব্য ও মতামতের সাথে পাঠকের ঐকমত্য পোষণ না করলেও তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সকলের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং এ গ্রন্থটি নওয়াব আলী চৌধুরী সম্পর্কিত তথ্যের শূন্যতা অনেকখানি পূরণ করবে–এতে সন্দেহ নেই। আমি গ্রন্থকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

ডঃ আবদুল্লাহ লেখকের কিছু কথায় লেখেন ঃ "বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদগাতা, মুসলিম শিক্ষা–আন্দোলনের দিকপাল, বাংলা ভাষা তথা বাঙালীর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রবক্তা, কৃষক দরদী ও সমাজ হিতৈষী জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর যথাযথ মূল্যায়ন আজো হয়নি। আমাদের জাতির ইতিহাসের পাতায় এখনো তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তাঁর মত একজন জাতীয় নেতার ক্ষেত্রে এরূপ অবহেলা অনভিপ্রেত।"

আমাদের কথায় অধ্যাপক আদুল গফুর লেখেনঃ "নওয়াব আলী চৌধুরী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা জাতির জন্য চরম লজ্জার কথা। জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের এই নিদারুণ অজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে এ বিষয়ে গবেষণামূলক একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ জানাই এবং তিনিও আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে একাজে এগিয়ে আসেন।"

বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ বই–এর পূর্ব কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তদানীন্তন চেয়ারম্যান জনাব এ, টি, এম, মুছলেহ উদ্দীন লেখেনঃ

"...*বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* শীর্ষক তাঁর এ গ্রন্থটি এদেশে আরবী চর্চার গবেষণায় আরো নতুন দিক উন্মোচিত করবে বলেই আশা রাখি। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনে আলিম শ্রেণীর যে অবদান রয়েছে তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেদিকেও প্রফেসর আবদুল্লাহর গবেষণাধর্মী দৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে–এ আশাই আমরা তাঁর কাছে পোষণ করছি।"

বাংলাদেশের ফার্সী সাহিত্য গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত–এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রো–ভাইস চান্সেলর হাবিবুল্লাহ কবীর লেখেন ঃ

"....বইটি আমাদের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যের নির্দেশ এবং অনেক জানা ঘটনাও মতবাদের সমর্থনে নতুন তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে।–আবুদল্লাহ সাহেব এ গ্রন্থটি লিখে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই অভিসন্দর্ভের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি পি·এইচ–ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করি।"

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃক প্রেরিত ভিজিটিং প্রফেসর মোর্তজা সাররাফ অভিমত প্রকাশ করেনঃ

" ..In fine, I feel pleasure to say I Have enjoyed much while reading the persaian tents of the book and I hope that Scholars as well as general readers will obtain new facts information for their research when the manuscript comes out in printed born"

নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম। বইটি ৪৩৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত। এতে ১১টি অধ্যায়, ২৭টি পরিশিষ্ট ৮ম পরিশিষ্টের 'ক' 'খ' দু'টি নিয়ে গ্রন্থপঞ্জী, নির্ঘন্ট ও লেখক পরিচিতি রয়েছে। সলিমুল্লাহর ভাষণ, সমকালীন পত্র–পত্রিকা, সরকারী প্রতিবেদন, সভা–সমিতি ও ব্যবস্থা পরিষদের চলতি বিবরণ ইত্যাদির আলোকে বইটি লেখা হয়েছে। সমালোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আবদুল বাকী লেখেন ঃ "নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন তদানীন্তন মুসলিম বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, শিক্ষা সংস্কারক, আধুনিক চিন্তা–চেতনার ধারক ও বাহক। বিশেষত পূর্ব বাংলার নির্বাচিত মানুষের ত্রাণকর্মী জননায়ক। এতদসত্ত্বেও মনে হয়, তিনি দেশ ও জাতির কাছে আজও যথাযোগ্য মর্যদা পাননি। তাঁর মত জাতীয় দিশারীর প্রতি এ দুঃখজনক অবহেলা বর্তমান গ্রন্থকারের মনে ব্যথা দিয়ে থাকবে। খুব সম্ভব এই অনুভূতি থেকেই ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নওয়াব সলীমুল্লাহর জাতীয় অবদানকে দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগ সলিমুল্লাহর স্মৃতিকে ভাবী নাগরিকদের কাছে চির জাগরুক করে রাখার

পক্ষে অনেকটা সহায়ক হবে–এটাই আমাদের ধারণা। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যে গবেষণা ও সাধনার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।"

বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য সম্পর্কে প্রফের ডঃ ওয়াকিল আহমদ লেখেনঃ "গ্রন্থে মোট ১১টি অধ্যায় আছে, এর অতিরিক্ত অবতরণিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট আছে, প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গীয় ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস শিরোনামে উনিশ শতকের পূর্বে বাংলাদেশে ফার্সী চর্চার বিবরণ আছে। গ্রন্থের প্রাক–পর্ব–ভূমি হিসেবে এ অধ্যায়ের গুরুত্ব আছে। সময়কালের শিক্ষা–সংস্কৃতির পটভূমিও আছে। উর্দু, ফার্সী, বাংলা, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা মানুষ বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এ আলোচনা থেকে তা জানা যাবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১০টি অধ্যায়–ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পাবনা ও যশোর জেলার কবি–সাহিত্যিকদের জীবনালেখ্য ও সাহিত্যকর্ম আলোচিত হয়েছে।......মধ্যযুগীয় ধ্যান–ধারণা ও ঐতিহ্যবাহী এ ধারাটি আমাদের প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। ডঃ আবদুল্লাহর কৃতিত্ব এই যে, তিনি আরবী, ফার্সী, ভাসাজ্ঞানহীন সমাজের মানুষের কাছে প্রামাণিক ও তথ্য ভিত্তিক এ ধারার ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরেন।'’......

স্যার আবদুর রহীমঃ জীবন ও কর্ম–বই প্রসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৯–৯০ তে লেখে ঃ

"উনিশ শতকের শেষার্ধ হইতে দেশ বিভাগ পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য যে–সব নেতা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন স্যার আবদুর রহীম তাহাদের অন্যতম। আইন ব্যবস্থা হইতে শুরু করিয়া তিনি পরবর্তীতে আইনের অধ্যাপক, বিচারক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, গভর্নরের শাসন পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা সভার সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করিবার সুযোগ পান এবং পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধির সম্যক চেষ্টা করেন। স্যার আবদুর রহীমের কর্ম প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক ধ্যান– ধারণার তাঁহার বিভিন্ন লেখা, বক্তৃতা, বিবৃতি, বক্তব্য ও সাক্ষাৎকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থটি গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।"

বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ বই–এর আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল বাকী লেখেন ঃ "......এমতাবস্থায় বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৮০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্তকালের বাংলাদেশের আরবীবিদের অজানা ও বিস্মৃতপ্রায় কার্যাবলীকে গ্রন্থাকারে সুধী সমাজের সামনে তুলে ধরে এক মহান জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। যে কর্তব্য বর্তেছিল আরবী শিক্ষাদানরত অনেকের ওপর, উর্দু ও ফার্সীর অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ কাজ একাই সম্পন্ন করলেন। এ জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থে মোট ১২টি অধ্যায় আছে। তদুপরি অবতরণিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গে আরবী শিক্ষার ইতিহাস শিরোনামে গোটা বঙ্গ তথা উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার চমৎকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। গ্রন্থের পটভূমি রূপে এ অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে উপমহাদেশে কি ধরনের গ্রন্থ পাঠভুক্ত ছিল, তার বিবরণও এতে রয়েছে। লেখকের এই আলোচনা তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ।"

৬

ডঃ আবদুল্লাহ প্রতিভার মূল্যায়নে এখানে আমাদের কিছু বলার আছে। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচনাবলীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৫৭। তাঁর ১০৩টি প্রবন্ধের ফিরিস্তীও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আজীবন তিনি অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত। উদীয়মান লেখক-গবেষকদের দিচ্ছেন অকৃপণভাবে গাইডলাইন। এই প্রতিভার মূল্যায়ন আমরা কতটুকু করতে পেরেছি, যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে তা প্রত্যাখ্যান করবো কোন আদলে? মূলত আমাদের দেশে মৌলিক ও কৃত্রিম এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা জাজ্বল্যমান। তোষামোদী ও খোশামোদীরা কৃত্রিমতাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ন্যায় করে লকলকিয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের তলায়, সস্তা বাহবা নিচ্ছে, খরিদ করছে প্রেক্ষাপট। সরবতার মিছিলে তাদের বক্র হাসিতে মানুষের গা জ্বালা না করে পারে না। এদেশে এমন নামধারী ব্যক্তিত্বও আছেন যাঁদের শেলফে হাজারো বই শোভা বর্ধন করে, গণমানুষের স্বার্থে তা মূক ও বধির বৈ কিছু নয়। আমাদের দেশের মৌলিক শিক্ষাবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক সবাই আজ অনেকটা আস্তাকুঁড়ে। কৃত্রিমতার দাপটে তাঁদের মৌলিকতা অনেকটা লোক চক্ষুর অন্তরালে। আমরা যে শুধু প্রফেসর আবদুল্লাহ সাহেবের কথাই বলছি তা নয়। অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যাঁরা তাঁরা গণমানুষের কল্যাণে, দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে নীরবে আজো অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। বিকৃত সংস্কৃতির করালগ্রাসে পতিত সমাজের প্রেক্ষাপটে জাতি চাটুকারদের কাছে জিম্মি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ন্যায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান ডঃ সাহেবের প্রায় সব বই প্রকাশ করলেও প্রাইজপদক কাঁদের দিচ্ছে তাও দেখার বিষয় বলে অভিজ্ঞ মহলের মত। নওয়াব সলিমুল্লাহর ওপর বই লেখেন ডঃ সাহেব, আর প্রাইজ পান কাঁরা তাও দেখবার বিষয়। ছয়টি ভাষা সমানভাবে রপ্ত করে, এতোগুলো গ্রন্থ রচনা করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতো বছর অধ্যাপনা করেও প্রফেসর আবদুল্লাহরা '*জাতীয় প্রফেসর*' হওয়ার যোগ্য নন; কি জন্যে-এর হেতু সংশ্লিষ্ট মহলই ভালো বলতে পারবেন। বলছিলাম, প্রফেসর সাহেবের প্রকৃত মূল্যায়ন করলে তাঁর কিছুই আসবে যাবে না, তিনি তো সস্তা বাহবা পাওয়ার জন্যে কাজ করেননি, জাতীয় স্বার্থে তাঁর মসী গণমানুষের জন্যে কর্মতৎপর রয়েছে। তাঁর চিন্তাপ্রসূত গবেষণা ও স্থায়ী মূল্যের অবদান এদেশের বিদগ্ধজনকে দেবে পথের দিশা, করবে অনুপ্রাণীত। সত্য যুগ, সত্য শাসন, নির্ভেজাল মানুষ আসলে তবেই গুণীজনের কদর হবে, প্রকৃত মূল্যায়ন হবে। চাটুকারদের কৃত্রিমতার লেবাস খসে পড়বে, প্রকৃত চেহারা হবে উন্মোচিত। ইতিহাসের পাতায় ডঃ আবদুল্লাহদের মূল্যায়ন যে একদিন হবে, এ ব্যাপারে অন্তত আমরা আশাবাদী। এখানে ডঃ সাহেবের একটি বই "*ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী*"-এর লেখকের কিছু কথা উপস্থাপন সঙ্গত মনে করছিঃ "বলা হয়, মহাপুরুষদের কর্মকান্ড ধ্যান ধারণার চর্চাই হলো সর্বোত্তম চর্চা। এর কারণ বুঝতে বেশী দূরে যেতে হয় না। গবেষণারও প্রয়োজন পড়ে না। এটা জানা কথা, যুগে যুগে প্রকৃতি জগতে, দেশ

ও সমাজ ক্ষেত্রে কৃষ্টির অঙ্গনে মুষ্টিমেয় মহৎ লোকেরাই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছেন, হাতে গোণা সৃজনশীল চিন্তাবিদ, নিঃস্বার্থ দেশনায়ক, সুস্থ অভিরুচির ধারক ও বাহক আর ধর্মীয় আত্মিক গুণাবলীর অধিকারী মহামনীষীরাই বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ময়দানে উন্নতি বিধান করেছেন। মানুষের চিন্তাধারা ও মানব সমাজ যদিও অনেকটা এগিয়ে এসেছে, চিন্তানায়কদের ভাবরাজ্যেও নব নব মূল্যবোধের সৃষ্টি হচ্ছে, নতুন নতুন দিগন্ত তাদের হাতছানি দিচ্ছে, তবুও আমরা পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো বিগতকালের মনীষী, দেশ ও জাতির দিকপাল, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সুকুমার শিল্পী, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক দিশারীদের ভুলে যেতে পারি না। পুরনো মূল্যবোধের সবকিছু গ্রহণীয় না হলেও সেগুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ও পাওয়ার রয়েছে। অতীতের ওপর ভর করে গড়ে উঠছে বর্তমান। আবার বর্তমানের ওপর রচিত হবে ভাবী মানব সমাজের ইমারত। যে জাতির ঐতিহ্য নেই, তার গৌরবের অনেক কিছুই নেই।"

ডঃ সাহেবের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। অনুকরণীয় দৃষ্টান্তকে কদর করতে শিখতে হবে। মূলত আমাদের হাত বাঁধা, চোখ বাঁধা, চরণশক্তি রহিত, বিবেক বিক্রেতা হয়ে টিকে আছি আমরা এক অপ্রতিরোধ্য অচলায়তনে। বিকৃত ভাবধারা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। কৃত্রিমতায়, ভেজালে ভরে গেছে দেশ ও সমাজ, প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ষড়যন্ত্রের তীব্র থাবা। আমরা নাম মাত্র মানুষ--মুসলমান। আমাদের ভাববার সময় এসেছে। গুণীজনদের প্রকৃত মর্যাদা দেবার অঙ্গীকার করার এসেছে সময়। আর যদি এতে আমরা পিছ পা হই-অন্য কথায় ব্যর্থ হই তা হলে সমাজের পরবর্তী জেনারেশন মিথ্যা ইতিহাস গলধকরণ করতে বাধ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আমাদের আবেদন, ডঃ আবদুল্লাহ সাহেবের ক্লাসিক প্রবন্ধ যথাযথ ক্লাসের পাঠ্যভুক্ত করুন। তাঁর রচনা সমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নিন, অন্য ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করুন। আর তাঁর দ্বারা তাঁর উপযুক্ত কাজগুলো করিয়ে নেয়ার প্রকল্প হাতে নিন। সব শেষে বলবো, তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নে যথাযথ ভূমিকা নিন। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন তিনি জীবিতাবস্থায় প্রত্যক্ষ করবেন, এ-ই আমাদের প্রত্যাশা।

আনন্দের কথা এই যে, ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রফেসর সাহেবকে "অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্য" গত ৬-৬-৯১ তারিখে *'ইব্রাহীম স্মরক স্বর্ণপদক'* প্রদান করেছেন।

প্রফেসর ডঃ আবদুল্লাহ সুন্নী মাজহাবী একজন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ছিমছাম ও গোছালো পরিবেশ তাঁর পছন্দনীয়। নীরবে থাকতে ভালোবাসেন তিনি। কাজই তাঁর জীবন। বিকেল বেলায় উদ্যানে হাঁটা অন্যতম রুটিন তাঁর। তাঁর ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে। তিনি বর্তমানে ১৯/এইচ, ঢা. বি. আবাসিক এলাকা ফুলার রোড-এ অবস্থান করছেন।

তথ্য সূত্রঃ

১. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর রচনা সমগ্র

২. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর রচনাবলীর সমালোচনা

৩. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত ফাইল

৪. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

The Concept of Sovereignty in the west and in Iqbal's Philosophy

Advocate Mujibur Rahman

The concept of sovereignty and its application in a political community make a great impact upon human affairs; in individual social, national, and international spheres.

Law emanates from a superior power which in the phraseology of Political Science is called 'Sovereignty'. The term ' Sovereignty' is derived from the Latin term 'Superanus' and through the French term 'Souverain' was meant to be equivalent to a Supreme Power. The type of Sovereignty also decides the nature, merit, soundness, type and values of law which regulate human activities. So the concept of Sovereignty is inseparably connected with the Rule of Law. The question of ownership of the Universe is also related to the issue of Sovereignty.

SOVEREIGNTY- SECULAR

Sovereignty as a distinct and independent concept is of recent origin in the West. The situation there was not congenial for the growth of Sovereignty even during the Medieval Age. Western civilization was then regarded as a Single Common Wealth. Ultimate power was with the Pope and the Holy Roman Emperor, the former was the spiritual head and the latter, the secular force. Due to the universalism of the Papacy, the concept of the Holy Roman Empire and Feudalism, the three important features of medieval Europe, there was no scope for any notion of Sovereignty as a distinct political concept.The unity of the Church was destroyed by the religious wars of the 16th century and the modern states were built on that destruction. Sovereignty came to be known as an essential attribute of the king, the head of the state. According to Professor Harold J. Laski, Sovereignty, in the sense of an ultimate territorial organ which knows no superior, was to the middle ages an unthinkable thing.[1] Laski further observes: Sovereignty in the modern sense had no existence before the Reformation. The territorial and omnipotent

Nation states came into existence, during the sixteenth cnetury, as the offspring of the Reformation.[2]

However, French political philosopher Jean Bodin *(1529-1596)*, during the reign of Henry III, was the first thinker who used the term and gave a clear idea of Sovereignty in the West. To bolster up the power of the French king over the rebellious Feudal lords, he postulated his theory of Sovereignty as justification. He identified Sovereignty as the Supreme power over the Citizens unrestrained by Laws.

According to Bodin, anarchy was the worst type of human catastrophe, so he became eager to find out a solution. He examined the prevailing conditions in the 'Six libres de la Republique' to find out as to how order might be secured. He thought the solution of the problem could be achieved only by a recognition of the Sovereignty of the State and by vesting the sovereign power in the king. His Republic *(1575)* is the first book on the modern idea of secular Sovereignty. Professor Laski rightly observed that Bodin was the first man to express in the clearest fashion all the characteristics of a sovereign which has the power to give laws to each and everyone of his subjects and to receive none from them.[3]

Thomas Hobbes *(1588-1679)* an English writer also declared through his Leviathan that the exercise of power by a single will was subject to no restraint whatever. Though John Locke *(1632-1704)* the English political philosopher, in his Second Treatise on Civil Government *(1690)* contended that the king was not the master but an agent of the people who could restrain his absolute power, the English writer on Jurisprudence John Austin *(1790-1859)* in fact, advanced the theory of Bodin further and he postulated in his 'The Province of Jurisprudence Determined' that the law was the command of the sovereign. He defined law as the command by the superior to an inferior. He emphasised the elements of coercion in his concept of Law. So Law according to the Western view began to be treated as what the sovereign commanded. It created a situation for excessive exercise of such sovereign power and did not confine itself within the internal affairs of a particular state, rather one sovereign started imposing his will on other sovereigns by force. This condition in international spheres led to a perpetual state of conflict,

aggression and war. To restrain the absolutism of the rulers, to ensure sovereignty of the People and the Rule of law, the Western world prescribed that it was by the democratic process alone, that Sovereignty might be exercised by the people, the law making authorities might be effectively regulated and executive actions might be controlled.

SECULAR VERSUS ISLAMIC CONCEPTS OF SOVEREIGNTY

The most glaring distinction between the Western (secular) concept of Sovereignty and the Islamic concept of Sovereignty is based on the question as to what is the repository of sovereign power. According to the secular concept, it lies with the king in a Monarchy, with a limited number of persons in an Aristocracy, with a dictator in a Dictatorship and with the people in a Democracy. But according to Islam Sovereignty lies with Allah alone.

Almost one thousand years prior to the birth of Jean Bodin *(1529-96AD)* the first writer on severeignty in the West, Al-Quran was revealed during the period *610-632* AD in which a complete code of life under the sovereignty of Allah was prescribed for mankind dealing with sovereignty as a distinct and an independent concept. The Muslim philosophers on the principles of Al-Quran dealt with the question of sovereignty in a more analytical and intellectual way. Their treatment of the subject 'sovereignty" was more scientific than that of Bodin, Hobbes, Locke, Austin and other Western Political Philosophers.

On the concept of Sovereignty, the contribution of : Ibn Abir Rabi (first half of the 9th century AD), Al-Farabi *(870-950AD)*, Ibn Khaldun *(1332-1406Ad)*, Mawardy *(1021-1082AD)*, Kaikaus *(974-1058AD)*, Ghazzali *(1058-1111AD)* and Ibn Taimiya *(1263-1328AD)*, the Muslim philosophers stood unparalleled at least about 500 years before Bodin *(1529-1596AD)*.

SOVEREIGNTY -ISLAMIC

Al-Quran establishes the Sovereignty of Allah. The following Ayate Karima, interalia, establish the Sovereignty of Allah as well as His ownership of the Universe. Allah is the only absolute and exclusive sovereign, according to the philosophy of Tauhid. Who is the creator

and 'Rabb' who sustains, cherishes and develops the universe as well as the human species, the best of His creation.[4] Allah is All Powerful, All-knowing, Wisest, Gracious and Most Merciful, To Him belongeth the dominion of the Heavens and the Earth and He hath Power over all things. [5]

In His Hand is the dominion and He hath Power over all things who created death and life so that He may try who is best in deeds and He is the Most Exalted in Might, Oft Forgiving.[6]

There is no Allah but He, the Living, the Self-Subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth.[7] Allah is He than Whom there is no other Allah, Who knows (all things) both secret and open. He is most Gracious, most Merciful. Allah is He than whom there is no other Allah; the sovereign, the Holy one, the Source of Peace (and perfection) the Guardian of faith, the Preserver above Partners, they attribute to Him. He is the Creator-the evolver.......... He is exalted in Might, the Wise. [8]

He is all Powerful and the source of All Authority: say "Allah Lord of Power (and rule), Thou givest power to whom thou pleasest and Thou strippest off power from whom Thou pleasest, in Thy hand is all good. Verily, over all things, Thou hast Power.[9]

All creatures in the heavens and on earth willingly or unwillingly bowed to His Will. This is the religion of Allah (which means "Submission' to His will) which is the law. [10]

To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth: All affairs are referred back to Him.[11] For Him is the command (it is within His exclusive jurisdiction to pass orders).[12] He is irresistible (watching) from above. He is the Wise, and acquainted with all things.[13] The command rests with none but Allah. He declares the Truth and he is the best of the judges.[14] He is the Justest of Judges.[15] He is the Wisest of the Judges.[16]

Allah is One.[17] There is no Ilah but He.[18] He to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth, no son has He begotten, nor has He a Partner in His dominion. It is He Who created all things and ordered them in due proportion.[19] The Uniformity in nature establishes His Oneness and if there were, in the heavens and the earth, other gods besides Allah, there would have been confusion in

both.[20] Since Sovereignty exclusively lies with Allah, the question of sharing does not arise and as such Partnership 'Shirk' with Him is considered to be worst wrong i.e. the worst "Zulum" (crime) [21] So the offence of Shirk is an unpardonable crime, though other crimes may be pardoned by Him. [22]

Allah alone governs the entire Universe along with all its species. Oneness of Allah (Towhid) is the basic philosophy of Islam. Everywhere, the One comes before the Many. All 'Manyness' has its origin in Oneness (omnis multitudo derivatur ab uno) and to Oneness it returns. (ad anum reducitur). Therefore all order consists in the subordination of Plurality to Unity, and never and nowhere can a purpose that is common to Many be effectual unless the One rules over the many and directs the many to the goal.

The creator is an independent and self-sufficient Authority.[23] That Sovereignty lies with Allah alone is a Natural and irresistible conclusion as a logical sequence of the Law of Uniformity of nature. The entire creation whatever might be in the heavens and on earth bowed down willingly or unwillingly to His Authority.[24] Whatever are in the heavens and the earth do prostrate themselves to Allah (acknowledging subjection).[25]

ISLAM IS A COMPLETE CODE OF LIFE

A system of life to properly regulate and conduct the affairs of man is essentially required. So having declared the sovereignty of Allah and His ownership of the Universe Al-Quran prescribes a complete system of life under His Sovereignty. Islam is not a religion in the conventional sense of the term.All other religions define and establish a private relationship between the individual and the creator. Those religions, as such, prescribe rites and rituals for that limited and private purpose. So the question of Sovereignty in respect of social, political and economic relations of mankind has got no relevance as far as those religions are concerned.

Islam on the other hand, defines the relationship between man and the creator, between a man and a man and between mankind on the one side and the rest of the Creation on the other. Islam encompasses all spheres of life, social, political, economic, cultural, national and international. In other words, it covers the gamut of life as

a whole. Over and above this, there is no division between the material and spiritual aspects of life in Islam. Every sphere of life, unlike in the West, is blended into one legal system 'Shariah' of Islam. For the guidance of mankind nothing has been omitted in Al-Quran.[26] So there is no scope for any human or non-divine and fake authority to formulate any basic law in contravention of the principles of Al-Quran. Islam is the only system of life which has subordinated Law, Government and Justice to moral values. It has been made incumbent to accept Islam in its entirety and to enter into it exclusively. [27] If there is any difference over any issue, it must be referred to Allah and His Apostle, since this is best and most suitable for final determination.[28]

In the context of the aforesaid comprehensive provisions of Islam, there is neither any scope of monarchy, dictatorship and autocracy, nor is there any scope of injustice and unfairness.

ISLAM IS SHEET-ANCHOR OF IQBAL'S CONCEPT OF SOVEREIGNTY

Dr. Iqbal is the greatest Muslim philosopher of modern times whose study of both Eastern and Western Philosophy created in him a synthesis for which he assumed a world personality. He made a deep and penetrating study of Al-Quran which convinced him of ' Oneness of Allah (Towhid)' and His ' Sovereignty' under which Islam is a complete system of life which can solve all human problems on the one side and ensure a balanced development of the individual as well as collective human society on the other. He was further convinced that under the Sovereignty of Allah, through the scientific life-style of Islam, the spiritual and material aspects of human life might be blended together to the maximum benefit and blanced development of mankind, the vice-gerents of Allah on this earth. Iqbal discarded geographical Patriotism, Nationalism and Western Civilization based on Secularism.

He says in his famous 'The 'Mysteries of Selflessness':

"Our essence is not bound to any place

The vigour of our wine is not contained.

In any bowl, Chinese and Indian

Alike the Shard that Constitutes our jar

Turkish and Syrian alike the Clay Forming our body, neither is our heart

of India or Syria or Rum

Nor any fatherland do we profess Except Islam."

IQBAL'S CRITICISM OF SECULAR DEMOCRACY

Iqbal regretted that in place of the Sovereignty of Allah, the West put the Sovereignty on human agencies and Secular Democracy was introduced as a modus operandi for the exercise of Sovereignty by the people.

He bitterly criticized and exposed secular concepts of Sovereignty and democracy. The previous Muslim philosophers, the predecessors of Iqbal, had no opportunity of any comparative study of Sovereignty and democracy- Islamic and secular, since Bodin was yet to be born and modern secular democracy was yet to grow. But Iqbal due to his scholarship in comparative study of Eastern and Western Philosophy and experience of modern history could successfully deal with the issues. He was in fact a Philosopher of traditional as well as modern thought, and Islam was the Sheet-anchor of his political Philosophy. He says in 'Zarb -e-Kalim' : Democracy counts the heads and does not weigh the brain. His view in 'Payam-e-Mashriq' is: the brain of two hundred asses cannot produce the brain of a single person. Iqbal could not reconcile himself to Western democracy on the main ground that popularity is the yard-stick, though without ability and wisdom a man can be popular. Iqbal gave this message to the West through his 'Gulshan-e-Raz' that Satan was let loose through Western Democracy which is a naked sword in the hand of the political factions. Iqbal heard the voice of imperialism in the flute of Western democracy, in his 'Khizr-e Rah'. In Bang-e-Dara he says. "the western form of democracy is the same old thing which is nothing but imperialism. The devil of tyranny is dancing in the garb of democracy, and you fool, you think that the dancer is a Nil Pari (a fairy). "According to him the institution and civilization built upon secular democracy can never be sound. Dr. Iqbal pointed out the defects of the narrow concept of dialectical Materialism and capitalistic Western Democracy, and according to him

Class war is the result of Western democracy whereas justice and Unanimity are the results of Islamic Democracy.[29] The Islamic system of life is based on Sovereignty of Allah, and Islam does not allow us to deal with others unjustly, nor does it allow others to be dealt with unjustly.[30]

DEMOCRACY-SECULAR

Having studied the drawbacks and results of secular democracy the Western political philosophers themselves are convinced that democracy cannot ensure at all the purposes for which it is theoretically designed and it failed due to its inherent defects. England is considered to be the cradle of modern democracy. Prof. Laski observes that one cannot understand the parliamentary system in Great Britain unless one recognizes that, beneath the appearance of democracy, this is the economic and social system it is intended to uphold. It was made by the owners of the instruments of production in the interest of their property: and the safeguarding of their conception of their rights is inherent in all the rulers by which it moves. It has been compelled to confer the franchise upon the masses; it has been careful to maintain for property the substance of effective authority.[31] Professor Laski corroborates Iqbal who had made the observation about the purpose of Western democracy, that its sole function was to exploit the poor in the interest of the rich.[32]

Laski in his. 'Democracy In Crisis' refers to Rousseau and observes that there is a vital truth in Rousseau's, taunt that the electorate is free only at elections and that freedom is but the prelude to a new domination. It cannot choose the representative it wants: it can only strike blindly against those at whom it feels a passing indignation. Every political conflict is the battle of two active minorities for the possession of the inert multitude.[33]

British statesman Sir Stafford Cripps in 'Democracy -Up-To-Date' is of the opinion that in fact democracy does not exist in any country to make an approach to achieve Government of the people by the people and for the people ; and he further holds the view that the Western European Countries survive as democracies only in name.[34]

Sir Stafford Cripps having analysed modern democracy as a system of Government, says: " To all intents and purposes the British democracy is today accepting the dictatorship of the Prime Minister as a substitute for its own actions. It is not necessary to review the very similar symptoms of democratic Government, which have made themselves apparent all over the world in some places to a greater and in others to a lesser degree.[35]

Democracy was bluntly rejected in other countries. In the meantime, the West saw the rise and fall fascism in Italy, Nazism in Germany and Communism in Russia and other Eastern European countries.

The Western Political Philosophers wanted to graft democracy on a heterogeneous and secular society divided by racialism, colour prejudice, difference of Nobles and Commoners, exploiters and exploited, dictarors and dictated with the unavoidable result that the values of democracy proved to be artificial and foreign bodies to their secular society.

The bloody beginning of an attempt at democracy through the French Revolution ended in a political fiasco. It is after the French Revolution *(1789)* that the Western World knew no peace and, within 15 years, Napoleon took power and declared himself an Emperor.

DEMOCRACY-ISLAMIC

Islam, on the other hand as far back as the 7th century A.D., made a silent revolution in establishing democracy under the Sovereignty of Allah with a surprising impact on human history. Charis Waddy takes it as a surprise that though Islam had preached and practised the principles of liberty, fraternity and equality, the constituents of democracy, one thousand long years before the French Revolution (1789 AD) the historians of the West date democracy from the French Revolution without uttering a word about Islam.[36] Sarojoni Naidu in one of her speeches in London, referring to Prophet Muhammad (p.h.) drew the attention of the West: What the West dreamt today was not merely a dream but was fulfilled 1400 years ago when the lonely dreamer of the desert, communing with the stars,

first realised the brotherhood of man, the right of every individual to freedom and equality. That camel driver was the only true begetter of human democracy. Islam is the only undisputed system of life which not only taught the loftiest principles of Liberty, Equality and Fraternity, but also ensured cultural, social, political and economic democracies.

The basic reason behind the success of democracy in Islam, under the concept of the Sovereignty of Allah, is that the Islamic State is a homogeneous institution of Islamic brotherhood, based on a common cultural, social, political and economic code backed by supremacy of law and independence of the judiciary. Ruler and ruled are to co-operate in executing the common programme as prescribed and guided by Al-Quran and Sunnah. There is, as such, no scope for any free style exercise of politics, usurpation of power and exploitation in Islam.

IQBAL'S LEADERSHIP

The bitter conflict between the Church and the intellectuals of the Christian world was the result of a blind and fanatic stand supported by the Church and its active opposition to the pursuit of knowledge based on reason, by the intellectuals, who had got the light of knowledge from different Muslim centres of learning in Spain. The Church had to yield through the Renaissance movement. With the gradual development of science, the West made a surrender to it and religion was considered to be a rotten and reactionary institution. The West felt that religion would be replaced by science which itself would evolve a new standard of morality without any sanction from metaphysics. The apparent success of science attracted not only the West but also dazzled the eyes of the Muslim world. The Muslim world due to lack of proper knowledge of Islam and limitations of science, started falling in line to surrender to science and to abandon Islam.

At this critical juncture in the history of Islam, Iqbal appeared on the scene; he not only called a halt to what was happening, but also declared that science is not the only source of knowledge and scientific development cannot fulfil the entire requirement of

mankind. He declared: "Natural Science deals with matter, with life and with mind but the moment you ask the question how matter, life, and mind are mutually related, you begin to see the sectional character of the various sciences that deal with them and the inability of these sciences, taken singly to furnish the complete answer to your question. In fact, the various natural sciences are like so many vultures falling on the dead body of nature, each running away with a piece of its flesh. Nature as the subject of science is a highly artificial affair, and this artificiality is the result of that selective process to which science must subject her in the interests of precision. The moment you put the subject of science in the total of human experience it begins to disclose a different character. Thus religion, which demands the whole of Reality and for this reason must occupy a central place in any synthesis of all the data of human experience, has no reason to be afraid of any sectional views of Reality. Natural Science is by nature sectional, it can not, if it is true to its own nature and function set up its theory as a complete view of Reality.[37] He further holds: "In the domain of science we try to understand its meaning in reference to the external behaviour of reality; in the domain of religion we take it as a representative of some kind of reality and try to discover its meaning in reference mainly to the inner nature of that reality. The scientific and the religious process are in a sense parallel to each other. Both are really descriptions of the same world with the difference only that in the scientific process the ego's standpoint is necessarily exclusive whereas in the religious process the ego integrates its completing tendencies and develops a single inclusive attitude resulting in a kind of synthetic transfiguration of his experiences.[38] He said, that the development of science without a concomitant spiritual development, would lead mankind to decay and destruction. He further declared that Islam unlike other religions provides for both material and spiritual development and instead of opposing scientific investigation rather encourages it . The history of the Muslim world corroborates this fact and Europe got a lesson and inspiration from Islam for a start and advancement of science. He in the context of passage of time, advocated freedom of Ijtihad with a view to rebuild the Law of shariah in the light of modern thought and

experience. So he advised the Muslim Ummah: "The only alternative open is to tear off from Islam the hard crust which has immobilized an essentially dynamic outlook on life, and to rediscover the original verities of freedom, equality and solidarity with a view to rebuild our moral social and political ideals out of their original simplicity and universality.[39]

Iqbal strongly felt that Islam, a complete system of life should be implimented in its entirety and the Muslim world should go back to the Pristine Purity of Islam which was practised by the Prophet (p.h.) and Khulafa-e-Rashedeen, under the Sovereignty of Allah. He maintained that if religion were separated from politics as was done in the West, what remained was mere a Chengizee. To uphold the Sovereignty of Allah, he emphasised that Allah is not only the Creator and Sustainer but also the owner of the Universe as a whole inclusive of this material world. He in his poem 'Al-Ardh' (The Land of Allah) in Bal-e-Gibril poses questions in a challenging tone:

"Who nourishes the seed in the lap of the dark earth?

Who creates vapour out of the surface of the ocean?

Who brings favourable wind from the West?

Whose land is this?

To whom belongs the light of the sun?

Who has filled pearls of wheat in the sheaf?

Who has taught the season to change?

Then he asserts: "Oh; the Land lord, this land is not yours- is not yours. It is not your father's- nor yours, nor mine."

Allah's ownership of this Universe, of which He is the Creator and Sustainer makes Him the repository of Sovereign Power and as such His laws are to be followed and obeyed exclusively. His laws are for the benefit of mankind, His best creation and vice- gerent on earth . As a corollary to His Sovereignty and ownership of the universe, a man in possession cannot claim ownership, rather, he is a trustee and

he is to conduct himself in dealing with this amanat' according to 'Shariah'. An exploitation-free society, on the Islamic economic system, has been ensured by Islam. Al-Quran recognizes and declares the right of the needy in the wealth of the rich.[40] Usury is an instrument of exploitation, so Islam encourages trade and forbids Usury.[41] Islam forbids hoarding.[42] To avoid monopoly and to check capitalism circulation of wealth among the wealthy people alone is also forbidden.[43] In the context of a sound Islamic economic system, Iqbal says that Al-Quran is a message of death for the capitalists and a patron of the have-nots and slaves.[44] He in one of his speeches said: "Both nationalism and atheistic socialism must draw upon the psychological forces of hate Suspicion and resentment which tend to impoverish the soul of man and close up his hidden sources of spiritual energy. Neither the technique of medieval mysticism nor nationalism nor athiestic socialism can cure the ills of a despairing humanities.[45]

Islam under the concept of the Sovereignty of Allah and His ownership of the Universe, established an ideal society in political, economic and cultural spheres of mankind and thereby the Muslim Ummah got world leadership. Iqbal appealed to the Muslim Ummah to abide by the traditional code of Islam based on the concept of Sovereignty of Allah transmitted through the Prophet (p.h.)

In Asrar-i-Khudi he says:

"Who so would master the sun and the stars
Let him make himself a Prisoner of Law.............
The star moves towards its goal
With the head bowed down in surrender to a Law
thou that art emancipated from the old custom
Adorn thy feet once more with the same fine silver chain
Do not complain of the hardness of the Law
Do not transgress the statutes of Mohammad (p. h.) [46]

The West in the absence of knowledge about Islam and its role in the past, cannot conceive of the specialities of Islam as a complete system of life.

Keith Callard, Associate Professor of Political Science, McGill University says: "In the context of 2000 years of Christian experience and 1600 years of coexistence of Church and State as separate entities, it is difficult for the West, to understand a Muslim when he talks of the Sovereignty,' of God, 'ideological state' and an 'Islamic Republic' . Early Christians had no opportunity to run a civil government. But the Prophet and the early Caliphs had. There was no dual authority in Madina. There was no Church apart from the State."[47]

With the passage of time and dislodgement of the Muslim world from the Islamic system of life, Muslim intellectuals felt bewildered.

With the change of time a new leadership was essential for refashioning the classical Islam. It was Iqbal alone who gave this leadership excellently well. W.C. Smith says: "Classical Islam, at its highest, was a religion admirably conceived to give courage, dignity and serenity to man facing a life of adversity and to give him charity towards his fellow-men. Today if it would function in this radically new world, in which we find ourselves, it must be refashioned to give dynamic initiative and vision to man facing a life of opportunity, and to give him creative love towards the community of his fellow-men. Such a refashioning was a service rendered to Islam chiefly by the outstanding Muslim poet and thinker of the century, Muhammad Iqbal. The need for his service may be measured in terms of the universal attention and veneration which he has attracted. He is great because he said with supreme eloquence and convincing passion what his follows were vaguely beginning to feel but were unable to formulate."[48]

REFERENCES :

The Concept of Sovereignty in the west and in Iqbal's Philosoply.

1. Harold J. Laski - The Foundation of Sovereignty and other Essays pp 1-2 Goerge Allen & Unwin Ltd, Museum Street, London.
2. Harold J. Laski - A Grammar of Politics. P 45
3. " I bid P.17
4. Al-Quran - Fatiha: 2
5. " (a) Al-I-Imran: 189
   " (b) Maide; 43
6. " - Mulk: 1-2
7. " - Baqara: 255
8. " - Hashr; 22-24
9. " - Al-I- Imran:26
10. " - do: 83
11. " - Hadid:5
12. " - (a) Yusuf: 40
    " - (b) Qasas: 88
13. " - An'am: 18
14. " - " :57
15. " - Hud: 45
16. " - Tin: 8
17. " - Ikhlas:1
18. " - Bagara : 255
19. " - Furqan:2
20. " - Anbiyaa: 22
21. " - Luqman:13
22. " - Nisaa: 116,48
23. " - Ikhlas: 1-4
24. " - Al-I- Imran: 83
25. " - Rd'a: 15
26. " - An'am: 38
27. " - Baqara: 208, 85
    " - Nisaa: 150-51
28. " - Nisaa: 59

29. Thoughts and Reflections of Iqbal. Edited by Syed Vahid. Ashraf Publications, Lahore.p37
30. Al-Quran - Baqara: 279
31. Harold J. Laski - Parliamentary Government in England, p43 Goerge Allen and unwin Ltd.
32. Dr. Sir Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in published by Javid Iqbal, son of the poet. P 179
33. Harold J. Laski - Democracy In Crisis. George Allen * Unwin Ltd. Museum Street, London. p75
34. Sir Stafford Cripps. - Democracy Up-to Date. George Allen & Unwin Ltd Museum Street London, P 20
35. Ibid do P 54
36. Charis Waddy - the Muslim Mind P 40. Longman. London & New York.
37. Sir Muhammad Iqbal - The Reconstructionof Religious Thought in Islam. Published by Javid Iqbal, son of Dr. Iqbal. p 42.
38. Ibid Do p 196
39. Ibid- Do p 156
40. Al-Quran- (a) Zaryat: 19
- (b) Ma'arij: 24-25
41. ,, - Baqara: 275-278
42. ,, - Tauba: 34-35
43. ,, - Hashr: 7
44. W.C Smith - Modern Islam in India. P 119 (quoted from Paygham-e-Afghani ba Millat-e-Rusiya in Javidnama p 89).
45 (1) Sir Mohammad Iqbal. Ibid N 188-189
46. W. C. Smith - Modern Islam In India. p 149 (quoted from Iqbal's Secrets of the Self)
47. Keith Callard - Pakistan. A Political Study pp 194-196.
48. W. C. Smith Ibid p 104.

A COMPARATIVE STUDY OF IQBAL AND GHALIB

Nazeer Siddiqi *

As Urdu poets, Iqbal and Ghalib are among the three poets of the Sub-continent of India and Pakistan whose greatness is absolutely unquestionable. The third is Mir Taqi Mir. But Iqbal and Ghalib are not only Urdu poets; they are not even merely poets. Mir, Ghalib and Iqbal are also Persian poets. Mir may be ignored as a Persian poet; indeed little notice has been taken of him as such. But the Persian poetry of Ghalib and Iqbal has always posed the question: Are they greater as Persian poets or as Urdu poets? On this question Ghalib himself was very clear in his own mind. That is why he could claim:

فارسی بین تابہ بینی نقش ھائے رنگ رنگ

بگذر از مجموعہ اردو کہ بے رنگِ من است

Unlike Ghalib, Iqbal was never so proud of his Persian poetry, but it outweighs his Urdu poetry not only in quantity but even in quality. Bal-e-Gibreel and Zarb-e-Kaleem are certainly superb enough to make a poet immortal, but books like Payam-e-Mashriq, Zaboor-e-Ajam and Javed Nama are definitely greater achievements, As far as prosewriting is concerned, both Ghalib and Iqbal have written in more than one language; Ghalib wrote in Persian and Urdu while Iqbal wrote in Urdu and English. In his Urdu prose Ghalib stands incomparably superior to Iqbal. Undoubtedly Iqbal enjoyed extraordinary command over a foreign language like English, but then Ghalib was a much greater stylist in Persian than Iqbal was in English. By making these points I simply intend to underline the fact that, as poets or writers, Iqbal and Ghalib are multidimensional and their comparative study has to be made in their various dimensions.

Although Iqbal and Ghalib are among the most written about poets and writers of our language, no one can claim that every drop of meaning has been, milked from their creative attainments. They are decidedly among the geniuses of world literature, and a genius never

---

* Visiting Professor, Department of Urdu, Peking University , China.

completely yields to any analysis or study, however deep and penetrating it may be.

I wonder if justice can be done to the subject under discussion since it requires the space not of an essay but of a book.

Both Ghalib and Iqbal knew that they were great poets. Both of them were sure of their immortality. Both were confident that they would be truly appreciated and recognized better by future generations. Ghalib predicted that.

شہرت شعرم بگیتی بعد من خواھد شدن ۔

and Iqbal visualized the future, of which he said:-

پس از من شعر من خوانند و دریا بند و می گویند ۔

جھانے را دگر گون کرد یك مرد خود آگا ھے ۔

Ghalib was a no less self-conscious person than Iqbal. While Iqbal was probably the most learned of all Urdu and Persian poets, Ghalib was one of the most self - educated and well educated poets in those languages. While Ghalib was probably the best flower of the Indo-Iranian culture developed in India, Iqbal was the finest fruit of the Indo-Iranian, and Western culture. While Iqbal knew the art of turning philosophy into poetry, Ghalib knew the art of making poetry philosophical. While Iqbal was essentially the spokesman of his nation, Ghalib was the representative of common humanity. Where Ghalib is logical Iqbal is ideological. While Ghalib is concerned with the actualities of human life, Iqbal is concerned with the values of collective life. He speaks in terms of his nation or the nations at large: While there is something Miltonic about Iqbal, there is something Shakespearean in Ghalib. Iqbal seems intent upon justifying the ways of God to man and brings all his creative powers to compel man to tread the path of Godliness. Ghalib pleads for the shortcomings inherent in human nature which keep man from treading the path of Godliness despite all its benefits:

جانتا هون ثواب طاعت و زهد

پر طبیعت ادهر نهین آئی

However Ghalib does not advocate the waywardness of human nature. He does believe in some sort of ethics which apparently look too simple to regulate human life but which are capable of making human life worth living. In one of his Urdu Ghazals he says:-

روک لو گر غلط چلے کوئی　　بخش دو گر خطا کرے کوئی

نہ سنو گر برا کہے کوئی　　نہ کہو گر برا کرے کوئی

These two verses of Ghalib embody as much ethics as is contained in this verse of Hafiz:-

مباش در پئے آز ار و ہر چہ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازین گناھے نیست

If all humanity could adopt and practise this one principle, violent clashes in this world could reasonably be expected to disappear from both individual life and international affairs. Here I am reminded of a very beautiful and wise saying of the American Philosopher George Santayana who said;

"We need no new philosophy, we need only

the courage to live up to the oldest and best"

As a matter of fact any rational philosophy whether new or old, is good enough to regulate human life provided it is practised. Otherwise even the best philosophy is useless if one cannot live up to it. It is a mere academic exercise to discuss and prove which religion is the best and which philosophy of life is the wisest. The tragedy of the best religion and the wisest philosophy is that they are not practised by the overwhelming majority of human beings. We human beings can at best pay lip service to the best religion and the best philosophy of the world.

However one must not be unaware of what is the best religion and what is the best philosophy of the world. But this question has never been settled, and constitutes one of the major causes of conflict among the nations of the world. It is said that God created religions according to the gradual mental development of mankind. But the history of mankind does not attets to this claim. The old religions have

never been replaced by the succeeding religions, culminating with Islam. The majority of every community has preferred to cling to its ancestral religion. This psychological trait of mankind has not only divided it into innumerable religions groups but has also made them inimical towards each other. The result is that mankind is not prepared to listen to a Hafiz or A Ghalib or a Santayana.

You my think that may digression from the topic under discussion has gone too far. As a matter of fact. I have not digressed at all. If you come to think about the attitudes of Iqbal and Ghalib towards religion and ethics, you cannot escape some of the religious and ethical issues to which I have drawn your attention.

Iqbal's approach to religion and his attitude to ethics are undoubtedly idealistic. His lifelong meditation drove him to the conclusion that Islam is the best religion which provides the most perfect ethical code of life. Despite his strongest arguments in favour of this claim, the majority of mankind, I am afraid, whould not wish to agree with him. But those who are intellectually interested in religion and ethics cannot help turning to a profound thinker like Iqbal whose passion for the betterment of the human condition can neither be denied nor disregarded. Ghalib spoke to humanity very much in a human voice, while Iqbal addresses himself to humanity in a prophetic manner. Iqbal is generally regarded as a philosopher-poet. In him there is something of a prophet as well. Very often he speaks from the high pedestal of a prophet. In the middle of the 19th century there was an English critic, Henry Craik, who said of the English poet William Collins:

"The defect of his poetry in general is that there is too little earth in it but in the purity and depth of its beauty it resembles the bright blue sky."

I think this opinion is more applicable to Iqbal. There is too little earth in Iqbal's poetry, but in the purity and depth of its beauty it cortainly resembles the same bright blue sky.

The Romantic poet, Keats, said: "We hate poetry that has a palpable design upon us. "Although Iqbal's poetry has a palpable design upon

us, no reader of Iqbal can afford to hate it on that ground. At best one can differ from the design of Iqbal.

Iqbal is one of the very few life-affirming poets of the world, particularly in the present century. According to one disinguished British writer, Colin Wilson, almost all western literature is suffering from what he calls the Fallacy of Insignificance of Man. All the modern heroes of modern fiction are anti-herose, that is, they are heroes without heroic qualities. The outlook of all the modern Western writers (except Bernard Shaw) is absolutely negative and pessimistic. An atmosphere of defeat and doom is brooding over the 20th century literature of the West.

Colin Wilson has confined his statement to Western literature. But his statement is no less applicable to Eastern literature of the current century. The same outlook on life pervades the literature of the East as well. Just as Bernard Shaw is an exception to the general mode of thinking and feeling about life in the West, so Iqbal is an outstanding exception in the literature of the East. Perhaps it will not be out of place to mention Earnest Hemingway and Saul Bellow, the American Nobel Prize Winners, in the company of life-affirming writers like Shaw and Iqbal.

Iqbal has a close resemblance to Saul Bellow in one respect. Just as Bellow does not cherish any romantic view of human life and yet considers life worth living, so Iqbal too does not suffer from any romantic concept of human life and yet his poetry is not a lamentation on human life. He is conscious of the fact that man has to encounter the red claws of Nature, yet he does not believe in cursing life or fate:

خون دل و جگر سے ھے سرمایہ حیات

فطرت لهو ترنگ ھے غافل نه جل ترنگ

Iqbal accepts life and wants it to be accepted by mankind not as a curse but as a challenge. Like the hero of Hemingway's novel "The Old man and the Sea" Iqbal believes in facing up to life at all costs. He exhorts man to break, but not to bend, At the same time, like Browning he never relinquishes hope. His optimism survives all dark circumstances.

In Ghalib's Poetry one does not find the same emphatic affirmation of life which is found in Iqbal's poetry. He appears to be full of complaints against life and the creator of life that is, God; neverthless he believes in valuing life in spite of all its sorrows and misfortunes. His attitude to life resembles that of the American playwright, Thornton Wilder in his play "Our Town".

نغمہ ھائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانئے

بے صدا ھو جائےگا یہ ساز ھستی ایک دن

Iqbal seems to be supersaturated with religion. He mainiained that "a religous outlook alone can save humanity, but this outlook itself requires re-examination and reconstruction.

Ghalib is not a religion-oriented poet like Iqbal. His poetry is not inspired by any national or international motives. Nationalism or internationalism had not taken any distinct shape in his age, particularly the social set-up he was living in. His great contribution to poetry is probably that he was a very perceptive observer of human life. Keats has said about Shakespeare that: "He has left nothing to say about nothing or anything".

This is what we feel while we read Ghalib though he cannot be favourably compared to Shakespeare. One of the qualities of good and great poetry claimed by Keats is that:

"It should strike the reader as a wording of his own highest thoughts and appear almost as a remembrance".

While reading Ghalib we are reminded of this quality which reminds us of his own words;

مین نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل مین ھے

Both Ghalib and Iqbal are among the glories of world literature. They display rare artistic energy in composing poetry of sustained excellence. Whatever language they use in their poetry, it comes

alive under therir hand. They are makers of their own language which was neither used by their predecessors nor adopted by their successors. Both of them were exceptionally precocious; consequently even their earliest performances in poetry are quite marvellous. Though Ghalib rejected the major portion of his Urdu poetry composed up to the age of 24, the remaining portion of his poetry contains a number of overses which are as immortal as Ghalib himself.

Similarly, Iqbal composed several unforgettable verses at a very early age. Their poetry is richest in its superb lyricism. There is a masculine note in the poetry of both although it is sharper in Iqbal than in Ghalib. Similarly, both Ghalib and Iqbal believed not only in the dignity of man but also in the divinity of man. But Iqbal has affirmed this aspect of man in a much more impressive and impassioned manner than Ghalib has been able to do Iqbal has added a new dimension to the relationship of man with God. His poetry tells us that if God is the creator of the Universe, man is the co-creator. Probably, with the exception of Mir, Iqbal and Ghalib tower over all other Urdu poets. Perhaps it can never be decided in a decisive manner who is superior, Iqbal or Ghalib. Both are worthy of life long study and much still remains to be done for both of them.

IQBAL AND OUR NATIONAL PERSPECTIVE

Mohammad Nurul Islam

Education means the transmission of experience from one generation to the next. The ultimate role of education is to preserve the cultural heritage of a society, its ideology and knowledge and pass it on to posterity.

Iqbal, through his creative philosophy and pragmatic vision of life, identified such a specific and normative role for education. But he did not formulate any detailed technique for imparting education. He focussed on the basic principles in a dynamic education system reguired for the foundation of a living human society.

Iqbal's concept of education rests on the Quranic scheme as developed and followed by the messengers of Almighty Allah, particularly Prophet Mohammad (SAS) for setting up and reforming human society. In the Quranic scheme, man is the central theme and the Prophet's mission envisaged the all-round development of the individual—in body, mind and spirit, as a pre-requisite for founding the society on a healthy and sound basis.

Iqbal's Ideas on education lie mainly embedded in his poetry, speeches and essays.

They stirred the Muslims of the sub-continent to their depths:

The flame of life cannot be borrowed from others; it must be kindled in the temple of one's soul.

It was in 1932, that Iqbal in his presidential address at the all-India Muslim League Conference held at Lahore, gave the Muslims a sense of direction.

Earlier in 1916 he wrote:

The ultimate end of all human activity is life glorious, powerful, exuberant. All human art must be subordinated to this final purpose, and the value of everything must be determined in reference to its life- yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face the trials of life manfully. All that brings drowsiness and makes us shut our eyes to Reality around,

on the mastery of which alone life depends is a message of decay and death. There should be no opium-eating in art. The dogma of `Art for the sake of Art' is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power.

He also believed that what man needed was collective action in addition to individual effort is only to escape torpor. It is an organised society which alone can create an ambience in which the individual can develop his potentialities to their fullest:

فرد قائم ربط ملت سے هے تنها کچه نهیں
موج هے دریا مین اور بیرون دریا کچه نهیں

An Individual exists in the society,
Alone he is nothing,
The wave has its strength in the river,
Out of the river, it has no entity.

He rejected the negative approach of the muslim mystics. He quotes Abdul Quddus Gangoh, a great Muslim saint of India, who says:

Mohammad of Arabia ascended the highest Heaven and returned. I swear by God that if I had reached that point, I should never have returned.' Iqbal observes "The mystic does not wish to return from the repose of 'unitary experience' and even when he does return, as he must, his return does not mean much for mankind at large. The Prophet's return is creative. He returns to insert himself into the sweep of time with a view to control the forces of history, and thereby to create a fresh world of ideals. For the mystic the repose of funitary experience' is something final; for the Prophet it is the awakening within him, of world-shaking psychological forces, calculated to completely transform the human world.'

Thus, Allama Iqbal gave a sense of direction to political thinkers and activists, charted a way for the cultural forces and instilled a strong sense of social responsibility in the minds and attitudes of those who found themselves lost in inaction.

The ideals implicit in the Prophet's mission he reinterpreted in a modern idiom. He believed that these ideals could regenerate the world.

Iqbal dreamt of such a regenerated world. He advocated the creation of a separate homeland for the Muslims of the sub-continent. It was a dream not only for a mere land-mass, but a dream for founding a nation charged with a noble mission:

ندرت فکر وعمل کیا شے هے ؟ ذوق انقلاب

ندرت فکر وعمل کیا شے هے ؟ ملت کا شباب !

ندرت فکر وعمل سے معجزات زندگی

What is that originality of thought and action?
A call for revolution!
What is that originality of thought and action?
A renaissance in national life!
It is but the source of the secret of life.

Iqbal's dream of a separate homeland was but a vision of a new world-order, a new social and economic system. We owe our independence, in both Bangladesh and Pakistan, to the thought of Allama Iqbal. Had there been no renaissance among the Muslims leading to the establishment of a separate homeland, there had been no Bangladesh.

A landmass may be amputated, but not an ideology. A people may be organically divided, but the ideology binding them together can never be divided. Even a small population filled with the spirit of a strong ideology can play the role of an atom which is pregnant with the potential of a mighty explosion.

We have been liberated in the physical sense only; but we are still in cultural servitude;we are economically subservient.

We have to determine and demaracate the real frontiers of our independence. If this independence is considered to rest on the foundations of geography alone, there is the danger of our being swallowed up in a large geographical unit. If it is said to rest on language, how can we preserve ourselves from cultural encroachment by others across the border who speak the same Language? If the colour of our skin forms the basis of our independence, can we deny that there are other groups who have the same pigmentetion? The ideology of Islam alone can give us an identity which cannot be effaced. The stronger this ideology, firmer will be the foundations of our collective existence as a nation. This is the essence of Iqbal's concept of education.

THE ORIGINS AND SOURCES OF IQBAL'S PHILOSOPHY

BY

DR. WAHEED ISHRAT[1]

ENGLISH TRANSLATION

BY

DR. M. A. K. KHALIL[2]

Introduction

[This paper was first read on November 1, 1987 during the Iqbal week celebrations at the Foreman Christian College, Lahore, Pakistan. It was published in Iqbaliat, Vol. 28, No. 4, January-March 1988 pp. 393-424, This translation has been prepared with the permission of the author for the benefit of those who do not know Urdu].

Though Iqbal is universally admired and respected as an intellectual, philosopher and, above all, as an eminent Islamic thinker, like all other intellectuals he is, sometimes, not given his proper place as a thinker and Islamic revivalist. This is due either to an incomplete comprehension of his thinking or to a myopic view of the main subject of his thought and discussion, i.e. Islam itself. In this medley of criticism his alleged lack of originality is often orchestrated. This criticism is very ably answered by the author in this paper. In the first place the author rightly points out that "the history of philosophy does not have the concept of any completely original thought" All scholarship and high thinking is the joint heritage of humanity on whom it is bestowed by Allah (S.W.T) either in the form of revelation through His prophets or by inspiration through His wise men. This being so all knowledge has to be a continuous and evolutionary

---

1. Present address: Assistant Director, Iqbal Academy Pakistan, Federal Ministry of Education, 27-F Model town, Lahore, Pakistan.
2. Present address: 106 Highland Drive, St. John's, Newfoundland, Canada, A1A 3C3

process. This fact will be obvious to students of revealed books as well as to those of philosophy. Secondly, the paper clearly brings out that in the multi-dimensional sphere of Iqbal's thought the Holy Qur'an occupies the central position, like the nucleus to the atom or that of a biological cell . Like the former the Holy Qur'an emanates the light of the Truth, and like the latter it controls all the details, which together, constitute Iqbal's thought. That the *raison d'etre* of Iqbal's poetry is the elucidation and elaboration of the wisdom of the Holy Qur'an and of being a vehicle of its secrets, as well as to be the instrument of the renaissance of the Muslim Ummah and its consolidation into a united entity, as required by the Holy Qur'an, is clear from a study of his works as well as from his own admission. He says:

میری نوا ئے پریشان کو شاعری نہ سمجھ

کہ مین ہون محرمِ رازِ درونِ میخانہ

Do not consider my seemingly disjointed song as poetry

As I am aware of the inner secrets of the tavern

کئے ھین فاش رموزِ قلندری مین نے

کہ فکرِ مدرسہ و خانقاہ ھو آزاد

I have opened the secrets of Qalandari [3]

So that the thinking of the school and the monastery may be freed [4]

نغمہ کجا و من کجا ساز سخن

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

There is a vast difference between poetry and me, poetry is only an excuse

I am pulling the unbridled she-camel into the line.

---

3. A qalandar is a dervish not following all the injunctions of the religious and social law and is often taken for the highest mystical symbol.

4. Freedom of thinking to Iqbal does not have the conventional meaning. It means freedom of Islamic thought from the fetters of un-Islamic alien philosophies like Greek philosophy.

This truth is contained in Iqbal's "Reconstruction of Religious Thought in Islam" like a seed and blossoms out in his poetical works Serious study of references No. 3,7,24,31 and 45 as well as the following book is strongly recommended for a clear understanding of the issues discussed in this paper.

Ansari, Muhammad Abdul Haq (1986), "Sufism and Shari'ah", (A study of Shaikh Ahmad Sirhindi's Effort to Reform Sufism); Published by the Islamic Foundation, Leicester, UK.

A word about the translation itself appears appropriate. Translation of technical terms of *tasawwuf* (Islamic mysticism) is a difficult task. Though mysticism and its literature exists in the West and its terminology is found in Western languages, including English, the West has not been fortunate enough to experience Islamic or Qur'anic mysticism, which is called *tasawwuf*. The acquisition of mystical knowledge or *irfan* (gnosis) by the special sources of *kashf* and *ilham* (explained later in the paper) is peculiar to *tasawwuf*. Hence, in the absence of appropriate words in English the method of annotation has been used in preference to translation. The annotations are given in foot notes when the term appears first to maintain continuity of the text. In all subsequent uses of the term the original term in Arabic or Persian is used in italics without repeating the annotation. Full names with dates and short notes of persons referred to in the text are also given. References cited are indicated by Arabic numerals at the end of each citation.

Translation

The search for the sources of thought of an eminent and multi-dimensional philosopher like Iqbal is a most difficult task, specially so as his thought is creative as well as harmonizing. It is creative in the sense that he showed a new direction to his period by his philosophy of "*Khudi*", [5] and theory of dynamism. It is harmonizing in the sense that, looking critically into the thoughts of the Eastern and Western philosophers in the light of his creative theory he established

---

5. Self cognizance

harmony between them and gave his own opinions. The history of philosophy has produced either those philosophers who presented their creative thought and the results of their creative thinking about life and the universe, or those who established harmony and relationship between the philosophers preceding them and reconciled the theories and thoughts of different thinkers. Allama Iqbal is one of the few philosophers in the history of philosophy who themselves fixed the orbit of their creative thinking, established some basic premises of their thought and then tested the thoughts of different philosophers and sages on the basis of them and gave their own opinion after critical study. These are the dimensions of creative and harmonious thinking, overlooking which creates difficulties in grasping the sources of Iqbal's thought. Those who study Iqbal's philosophy superficially sometimes ignore its ethical aspects, and sometimes consider Iqbal's philosophy as mere gleanings from different philosophers on account of faulty comprehension of his harmonizing aspect. In my opinion both these attitudes result from failure to distinguish between the creative and harmonizing aspects of Iqbal's thinking.

Perhaps nobody has so far claimed the existence of a complete system of thought in the creative aspect of Iqbal, or that Iqbal had developed a philosophic order from his thought. In fact, if Plato [430-347 B.C] is the first link in the chain of the European philosophical system then Hegel [Ernst W. Kaufmann Hegel (*1770-1831*) is its last link. Nobody after Hegel attempted organizing his philosophical thoughts into a system. The system of Marx [Karl Marx 1818-1883 C.E.] was not philosophical and we do not count it as a philosophical system. We see the best organization of a philosophical system in Iqbal, after Hegel, though Iqbal himself has never claimed it. In fact, like some eminent philosophers he has denied being a philosopher. For this reason perhaps it may appear unreasonable and an exaggeration, at first sight, but Iqbal has the components of a partially organized philosophical system in his concepts of the Truth, the universe, spiritual reality, the *Mard-i-Munin*[6] or the Fard-i-*Musaddiqa*,[7] the *Khudi* and its political interpretation, and

democracy and its political interpretation. These should be researched just as the scattered pearls of wisdom of Socrates [469-399B.C] were researched and consolidated into a philosophical system by Plato. Perhaps nobody has looked upon Iqbal from this angle, because most of the work on Iqbal to date has been of the nature of compilation, translation and explanations. Iqbal has not yet been researched and discovered in his entirety because, for this purpose, a creative and all embracing mind was needed after Iqbal as was created in the person of Plato after Socrates.

I want to state a basic fact before dealing with the sources of Iqbal's philosophy. This is that no philosophy develops in a vacuum. Every philosophy needs a special soil, air and environment for its cultivation and growth. If you want to witness this you can see that the Greek thought grew in a special sophisticated social and cultural environment of the second millennium before Christ. When this environment ceased to exist the Greek philosophy disappeared with it forever. Moreover, if you also look at the thoughts of Socrates and Plato they were not original in the sense that nobody had previously expressed such thoughts. A careful study and analysis of the thoughts of Socrates and Plato will reveal the echo of the thoughts of Socrates and Plato about God in Xenophius [430-355 B.C], a thinker of the period of the Illiad. In the same way the poems of Parmenides [d. 475 B.C.] "The Way of Truth" and "The Way of Syllogism" provide material for Plato's "Discourses" and the concept of "*Wahdat-ul-Wujud*"[8] of Parmenides and Xenophius, which hypothesizes one existing entity is the basis of the main thought of Plato. In the same way the thoughts of philosophers such as Plotinus (A.D. 204-70) Kindi [d.870 C.E.], Farabi [Abu Nasr Muhammad Ibn-i-Muhammad

---

6. The true believer
7. The authentic being
8. The belief that all Existence is one .Monism orWujud (Being) Pan-thesism.

"Ibn-i-Tarkhan Ibn-i-Afzalgah Farabi 870-956 C.E.] and Hegel etc. have the elements of their preceding philosophers. In other words the existence of the effects of the thoughts and theories of preceding philosophers. In the thinking of some philosophers is not a reflection on the originality of his thoughts. This is so because the study of the evolution of thought in the history of philosophy will clearly show that in the field of thinking the currents of thought run in a continuous stream and a philosopher draws inspiration only from the thoughts of his predecessor philosophers and after renovating their thinking with his originality presents them according to the objective conditions of his time. So it is not surprising to find some reflections of the thoughts of earlier philosophers in Iqbal's thinking and this does not negate the originality of his thought.What is important to find out is whether Iqbal has read and presented the thoughts of philosophers preceding him in a historical and unquestioned manner or has critically reviewed them to organize his own thoughts. Serious study of Iqbal's "Lectures"[9] and other works gives a strong impression of his critical approach to the works of earlier philosophers and will create the feeling that Iqbal has adopted an academic and critical approach in grasping and adopting them. Therefore, people who say that Iqbal's thinking is not original and that he has indulged in gleaning from such and such a philosopher appear to be ignorant of the history of human thought.The history of philosophy has no concept of any completely original thought, and the torch of thinking progresses through many hands. All this leads to the conclusion that Iqbal was an original thinker and grasped and adopted the earlier philosophies in a critical manner.

Basically, in its origin, Iqbal's philosophy is an extension of the tradition of Islamic thought alone. Iqbal's thought is organically linked to his own Muslim background. Iqbal's concept of the Truth, God, the universe, *Khudi and Mard-i-Mumim* themselves have roots in Islamic

---

9. Six Lectures on the "Reconstruction of Religious Thought in Islam" by Allama Dr. Muhammad Iqbal delivered at the Muslim University, Aligarh, India in 1929 and at Madras in 1930.

thinking. He himself traces the roots of each of his concepts to the history of Islamic philosophy, and when he finds the affirmation and support of his concepts in Western science and philosophy he cites them as additional support. He also criticises the philosopher whose thinking is not in conformity with the foundations of his thought. In this connection he criticises Plato, Aristotle [382-322 B.C], Hegel, Marx and several other

Western thinkers and even the Muslim writers of his own circle, such as Ibn-ul-Arabi [Muhiuddin Ibn-ul-Arabi d. 1240 C.E.] and Hafiz Shirazi [Muhammad Shamsuddin d. 1389 C.E.]. In his creative thinking he first presents his own theories about the Truth, life and the universe and then tries to obtain further explanation and proof from Western learning and researches of Western philosophers. Dr. Annemarie Schimmel has unveiled this attitude of Iqbal in her famous book "Gabricl's wing". She says:

" Iqbal continued to establish connection between Islamic traditions and new Western research by these comparative studies. His stand was that Muslims should learn Western knowledge and wisdom for as the West has been indebted to Islamic civilization for learning and wisdom, Muslims would not lose anything by learning Western science and technology". (1)

Iqbal is not among the philosophers who get engulfed in abstract concepts and theories and engage themselves only in the superfineness of linguistic and logical excellence. Iqbal is a revolutionary philosopher, and in accordance with the saying of Marx that the much greater function of philosophy is to alter the normal conditions existing around it rather than subjective analysis of the universe. Iqbal also, with his original thinking, established a system of thought which aimed at revolutionizing the conditions existing in his time. The main aspect of his entire system of thought was practical, dynamic and revolutionary. He discarded, after criticism, every thought, concept and theory which preached inaction, and which was also a great obstacle to Iqbal in the task of changing and activating the existing conditions of Muslims. As Dr. Ishtiaque Hussain Quraishi explained, after detailed analysis, in his paper "The

Psychological Sources of the Philosophy of Iqbal" (2) that the centuries old static life of the Muslim Ummah, their declining preparedness, the destruction of the *khilafah*, the fall of Samarqand, Bukhara and Spain, the Hindu stratagem of absorbing the Muslims in, and the conditions militating against their organization as a political power, in the Indian sub-continent were movers for disturbing Iqbal and creating a storm within him. He criticised all those theories which were against the concept of dynamism in life and the universe., Iqbal's concept of life and the universe was that of having a soul in motion. Motion or dynamism is the basic component of his philosophy.

Motion or dynamism is the principle which moulded Iqbal's thought. He writes about dynamic thinking:

"In its essential nature, then, thought is not static; it is dynamic and unfolds its internal infinitude in time like the seed which from the very beginning, carries within itself the organic unity of the tree as a present fact. Thought is, therefore, the whole of its dynamic self-expression, appearing to the temporal vision as a series of definite specifications which cannot be understood except by a reciprocal reference" (3)

The greatest opponent of Allama Iqbal's dynamic philosophy of life and the universe was the belief of *Wahdat-ul-Wujud*. This belief in *Wahdat-ul-Wujud.* whose rationale was based on Plato's theory of the universe, developed later in his system as a static monastic way as part of mysticism, diverted Muslims from the Islamic thinking of conquest and consolidation of the world towards the shame-ridden attitude of divorcing all worldly relations. As a result of this the Islamic world developed the monastic attitudes of inaction, pacifism and other worldliness, and the whole Islamic world was engulfed in a paralytic mystic state. Becoming estranged from the understanding of the universe, and from performing an active role in the reconstruction, shaping, conquest and organization of the world, it became progressively caught into slavery. The Arab writer Najla Izzuddin [*1933*] has analyzed this state of affairs as follows:

"The decline of the internal creative power and expeditionary zeal of the Arab civilization was more devastating than the misfortunes and catastrophes that befell if from outside. The ardent desire for intellectual inquiry and the pride of performance which were characteristic of the early times were throttled by the strong pressure of religious dogmas and centralization. Freedom of thought was banished and conservatism reigned supreme. Unbridled search for Truth was branded as atheism and irreligiousity. The fearless and bold people of the earlier times were relegated to obscurity. The brain trust engaged itself in preparing the explanations and abstracts of well-known subjects instead of using their intellect in discovering new avenues of knowledge." (4)

This was the state of affairs which perturbed Iqbal. He revolted and rejected every theory which was against his dynamic concepts. This hit Aristotle most after Plato because Aristotle believed in the eternity of the universe. In the words of Dr. Schimmel:

"Aristotle's concept of the eternity of the universe is antithetic to the Islamic concept of God, because according to this religion only the Living and Dynamic God is Eternal and not the universe. Iqbal considers life also as fleeting. Life is not only beauty and balance; it is also action and power." (5)

According to Dr. Schimmel the strongest reason for Iqbal's intellectual revolt against Greek thought was:

"In Iqbal's view Greek philosophy is extremely abstract and conjectural and man cannot perform any productive work under its influence. It is an impractical philosophy and cannot even meet God through its concept devoid of Love." (6)

See Iqbal's "Asar-i-Khudi" section VII titled "Exposition that Plato the Greek whose Thought greatly influenced the Mysticism and Literature of the Muslim Nations followed the Sheep's Doctrine and that We must beware of and eschew his Thought and Theories." The climax is reached in the last verse which says:

قومها از سکرِ او مسموم گشت

خفت و از ذوقِ عمل محروم گشت

Full many a nation poisoned by his intoxication

Sank into deep sound slumber and lost the thrill of action's bliss

The whole purpose of this detail is to lead you to the basic concepts of Iqbal's thought. What permeates the whole world of his philosophical organization like a principle is the concept of a Living and Dynamic God, who is not identical with the universe, but who is Unique, Unparalleled, Unequal in His own Being and Essence. The universe and life are expositions of His Creativeness which are vibrant with life. Dr. Ishrat Hassan Enver in his book "The Metaphysics of Iqbal" has explained that to Iqbal God's *Zat* [10] is dynamic and extremely creative. His words are:

"Consequently, the nature of God as revealed by intuition is, firstly, dynamic and highly active in its essence. "Reality is one infinite life. It is a self-directing, self-conscious energy, continuously active. Every act of it is itself life which in turn is a self-directing energy. Looked at from outside these acts are spatial things and events. Some of the acts in the course of development have become self-conscious. These are 'I' and 'You'. " (7)

Detailing Iqbal's concept of the universe he writes:

"There is a gradual rising note of egohood in the whole universe. We are conscious of it firstly in our own self; secondly, in the objective nature before our eyes; and thirdly in the ultimate principle of all life, viz. God Iqbal's philosophy is thus the Philosophy of Egohood. Egohood is for him the pivot of all reality. " (8)

Khudi, which can also be called "Gnosis of self" or "Gnosis of Zat" is found in Socrates' philosophy as "Know Thyself" and which also appears in the famous saying, "He who knows his Self knows his God". Iqbal himself writes in his Fourth Lecture:

"What then is matter? A colony of egos of low order out of which emerges the ego of a higher order, when their association and interaction reach a certain degree of co-ordination..... The emergent,

10. Essence

as the advocates of the Emergent Evolution teach us, is an unforeseeable and novel fact on its own plane of being, and cannot be explained mechanistically. ... We have seen that the ego is not something rigid. It organizes itself in time, and is formed and disciplined by its own experience." (9)

A well-known professor of philosophy, Dr. Absar Ahmad explains Allama Iqbal's concept of *Khudi* thus:

"In Iqbal's thinking *"khudi"* is that unit of intellect which is 'Self Knowing' and 'Self Cognizant' and is conscious of its *Zat* and its goals. *"Khudi"* here does not mean mind or discretion but is something which has to be kept well in mind or on account of which man has mind and discretion. The same faculty in man calls himself 'I' on account of being self-knowing or self-cognizant. So Iqbal calls it 'ana', or 'ego' or 'I'.

In Iqbal's view this *"Khudi"* passes through three stages in its evolution which he has described thus in Javid Namah:

زندہ یامردہ یا جان بلب　　از سہ کن شہادت راطلب

شاہد اول شعور خویشتن　　خویش را دیدن بہ نور خویشتن

شاہد ثانی شعور دیگرے　　خویش را دیدن بہ نور دیگرے

شاہد ثالث شعور ذات حق　　خویش را دیدن بہ نور ذات حق

"Whether thou be alive or dead, or on the verge of death

Depends on three things

A sense of one's own existence

One's own self to see with the help of one's own inner light

Then secondly,

A sense of existence of others; one's own self to see with the help of the light of others

And, thirdly, a sense of the existence of God,

And the power to see One's Self in the light vouchsafed by God" (11)

This means that in the first stage Man requires a witness on himself through the intellect of his own existence, assays the limits of his own objectives, organizes his essence, sees himself in the light of his existence and shapes his faculties and potentialities. When he passes from this stage to the second one he tests himself with the intellect of others or with the eyes of history and makes history as a witness for his actions and character. In this way he fixes his place in the pages of history. In the third stage he makes the *Zat* of God a witness over his existence, presents himself to God and organizes his "Khudi" or his Zat within the premises of the purpose of submission to God. Iqbal states the following purpose of these stages of *"Khudi"*

برمقام خود رسیدن زندگی است

ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

"Life lies in reaching one's own destined station

It lies in beholding the One Central Self without a veil" (12)

That means that man reaches a stage where the *Zat* manifests itself to him with all its profundity. Soren Kiekegaard, the founder of the concept of *Wujudiyat* [11] has also described similar three stages in his philosophy which are beneficent, ethical and religious. However, Kiekegaard could not reach the depths of thought traversed by Iqbal though his beneficent, ethical and religious periods also reflect the different stages of development of Man's personality. (13)

In the process of explaining the sources of Iqbal's philosophy on the one hand we have to point out the internal sources which are subjective and are a part of his internal self without which Iqbal could not have been what he was and on the other hand we have to discover those objective sources which formed the basis for the formation of his thinking. Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadvi in his

11. Pan-theism

book "Nauqush-i-Iqbal" has very beautifully referred to the creative elements which have played a very important role in the formation of Iqbal. During a lecture at the Cairo University in 1951 he said:

" In fact Iqbal acquired the creative elements which created and developed his personality in his own internal school. There are five creative components which made Iqbal's personality everlasting". (14)

Enumerating these five components he said:

"The first of these components which Iqbal acquired on the very first day of his entering his internal school is "Faith and Belief". This very belief is Iqbal's first patron and mentor and is the source of his power and strength and is the fountainhead of his wisdom and intelligence. The second component of Iqbal's personality is what is present today in every Muslim home, though alas the Muslims themselves are deprived of its light and have made themselves devoid of its knowledge and wisdom. I mean the Holy Qur'an. The third component which has greatly affected the development of Iqbal's personality is cognizance of his soul and *Khudi*. The fourth component which made and nourished Iqbal's personality is the early morning prayer and lamentation. It was Iqbal's rising in the small hours of the morning, prostrating himself before his Lord and lamenting and crying which continuously provided a new happiness to his soul, a new light to his heart and a new intellectual nourishment to him. Iqbal has himself highlighted the importance of early morning lamentations. For example he says:

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی
نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی

"It may be Attar, or Rumi, or Razi, or Ghazali, [12]

12. These are four of the most prominent and original Islamic thinkers, viz. Shaikh Fariduddin Attar (d. 1230 C.E.) Maulana Jalaluddin Rumi (d. 1273 C.E.) Fakhruddin Muhammad Razi (d. 1228 C.E) and Abu Hamid Muhammad Ghazali (d. 1111 C.E.).

Nothing is achieved without early morning lamentation (15)

Though the winter air had the sword's sharpness

Even in London I did not lose the habit of early morning rising (16)

And the fifth component which constituted the basis of Iqbal's thought was the study of Rumi's *"Mathnavi"*

The three components stated by Maulana Abul Hasan Ali Nadvi or Ali Mian are subjective whereas the Holy Qur'an and Rumi's Mathnavi are objective and are the fountainheads of his genius.. In fact the deep study of and constant meditation on the Holy Qur'an was the criterion on which he tested all the old and new philosophies. Whatever he felt to be close to the teachings of the Holy Qur'an he regarded as the Mumin's missing wisdom and accepted it. Similarly, he rejected, after examination and criticism what he considered as remote from this current of thought. Iqbal dived into the Holy Qur'an and adopted it as the basis and standard of his entire thinking.

Regarding the study of the Holy Qur'an the anecdote which Iqbal himself stated is very important. According to this Iqbal's father had advised him to study the Holy Qur'an as if it had been revealed to him (17). This changed Iqbal's view of the Book of God.

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

"As long as the Book is not revealed to your heart

Neither Razi nor the author of Kashshaf[13] will clarify the meaning

The Holy Qur'an itself on being revealed to Iqbal's heart opened the hidden aspects of his thought. Therefore, he always considered his

13. Abul Qasim Mahmud Zamakhshari of Khwarizm (d. 1160 C.E) The tafsir written by him known as the Kashshaf is very full in the explanation of words and idioms. The tafsir takes a decidedly rational and ethical view of doctrines. Numerous tafsirs have been written on it. Similarly " Tafsir-i-Kabir" by Fakhruddin Muhammad Razi is very comprehensive and strong in interpretation from a sufi or spiritual point of view.

whole thought and poetry to be the *tafsir*[14] of the mystery of *Iman*[15]

ولایت ، پادشاهی علم اشیا کی جهانگیری

یه سب کیا هین ، فقط اك نکته ایمان کی تفسیر ین

"Walayat[16], kingship, the universality of the knowledge of things

What are all these? Only tafsirs of the secret of Iman"

He has prayed to God for a curse on himself in the sense that if he had included anything in his thinking and poetry outside the explanations of the Holy Qur'an he be deprived of the honour of paying the most humble homage to the Holy Prophet by kissing his feet on the Day of Judgement. This is a curse which no Muslim can impose on himself. On this basis alone it can be said that Iqbal himself, not only considers the Holy Qur'an to be the source of his thought and poetry, but calls his thought and poetry to be a *tafsir* of the Holy Qur'an. He says:

گرد لم آئینه بے جوهر است ور بحر فم غیرِ قرآن مضمر است

اے فروغت صبح اعصار و دهور چشم تو بیننده مافی الصدور

خشك گردان باده در انگور من زهر ریز اندر مئے کافور من

روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسه پاکن مرا

"If my heart is a mirror with no worth

And in my word if anything except the Holy Qur'an is concealed

O Thou who art the Light of the morning of time

They eye sees what is in our hearts

14. Exegesis
15. Faith, Belief
16. Nearness to God involving His support and protection; Saintship

Dry up the wine in my grapes

Throw poison in my pure wine

Make me wretched and ignominious on the Judgement Day

Deprive me of kissing the feet (of the Holy Prophet)

Syed Nazir Niazi, who has translated "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" into Urdu, considers the Holy Qurtan to be the fountainhead of Iqbal's thought in his "Introduction to the "Lectures".

"If fact the real fountainhead of this thought is the Holy Qurtan, as stated earlier. And to the Holy Qur'an alone we will have to have recourse in solving all problems and difficulties which may appear in explaining it. If the author of " The Lectures" has used the present day terminology it is so for the sake of us Westernized people, because he is really addressing us and the rest of the world through us" (21)

Another pious researcher of Iqbal, Dr. Raziuddin Siddiq[17], has written in the preface to Dr. Yusuf Husain Khan's book, " Rooh-i-Iqbal":

"In poetical aspects and in the light of modern knowledge Iqbal's works are a complete commentary of the holy Qurtan. If the Mathnavi of Maulana Rumi was considered "The Holy Qurtan in the Persian Language" eight hundred years ago, we can give the same status to Iqbal's works in this second millennium". (22)

Maulana Saeed Ahmad Akbarabadi in his "A view on Iqbal's Lectures" has attested similarly that:

"The high calibre of thought in "The Lectures" leaves no doubt that the Holy Qurtan is their real fountainhead" (23)

---

17. He is a prominent mathematician and was professor of Mathematics at the Osmania university in Hyderabad, Deccan in pre-partition India. He is an eminent educationist of Pakistan and has the establishment and development of two universities to his credit, viz, Peshawar and the Qaid-i-Azam University of Islamabad

Maulana Dr. Ghulam Mustafa Khan in his book "Iqbal and the Qurtan" (24) has documented the encirclement of Iqbal's thought by the Holy Qurtan and a study of

Professor Muhammad Munawwar's book "The Reasoning of Iqbal" shows the sovereignty of the Holy Qurtan on Iqbal's thought. Though it is not possible to go into details, selections from Iqbal's verses, letters, speeches, statements and lectures give us the message of Iqbal that:

گرتومی خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز به قرآن زیستن

"If thou wantst to live as a Muslim

It is not possible except living by the Holy Qurtan" (25)

This is the all pervading wisdom of his thought. This is so because he considers the Holy Qurtan to be a means of creating an exalted and elegant understanding of the varied innate relationships of Man and the surrounding universe. Iqbal got the greatest stimulation from the Mathnavi of Rumi in obtaining the philosophical understanding and depth of thought of the Holy Qurtan. Therefore, Maulana Jalaluddin Rumi's "Maulvi's Intellectual Mathnavi" which has been described as the Holy Qur'an in the Persian language, is the basic source of Iqbal's philosophy. Iqbal took Maulana's Mathnavi as a means of obtaining the insight into the Holy Qur'an:

چو رومی در حرم دارم اذان من　　ازو آموختم اسرار جان من

به دور فتنه عصر کهن او　　به دور فتنه عصر روان من .

"Like Rumi I am calling for prayer (azan) in the Haram [18]

18. The Holy Sanctuary of the Ka'aba.

I have learnt the secrets of life from him

He lived in the days of the mischief of the old

I live in the mischief of the current age" (26)

In the seditious age in which beliefs and concepts were being destroyed and Muslims had become frustrated Maulana Rumi restored Man's beliefs and confidence and stabilized Faith and perceptions. This disunity, distress and helplessness of thought and insight was also the characteristic of Iqbal's times. The harmony and mature thinking, the affection and attachment to the Holy Qur'an were the meeting points for these eminent thinkers. The mysticism and mystics who had considered knowledge to be a great veil had forgotten the Qurtanic edict that knowledge and science were the greatest virtues in its view. To Iqbal Maulana Rumi is the opener of the secrets and wisdom of the Holy Qur'an. He goes more into the intrinsic rather than the extrinsic values of the Qur'anic injunctions. The wisdom of Deen is his special field. The doctrine of *Taqdir*[19] is the most important point of the companionship of Rumi and Iqbal. Iqbal got the theory of Will in his concept of *Khudi* from Rumi, that the *Khudi* on reaching its climax embraces God's Will. Iqbal and Rumi both think that the wrong understanding of Destiny has done much harm to Man's Khudi and ethical life. Following Rumi Iqbal gave a new meaning to human freedom and free will. Both believe in immortality and evolution, and are the philosophers who create the fervour for subjugation of the universe.

It is often stated in describing the influence of Maulana Rumi in shaping Iqbal's thought that Iqbal's concept of *Wahdat-ul-Wujud* has been taken from Maulana Rumi. There is a long line of people who regard Maulana Rumi to be a believer in *Wahdat-ul-Wujud*. But whether Maulana Rumi was really a believer in *Wahdat-ul-Wujud* is no longer considered as fully proven. There are several indications denying his belief in *Wahdat-ul-Wujud*. Professor Nicholosn who is a researcher in Islamic learning writes:

---

19. Destiny

"Some people get the impression at first sight that Maulana Rumi believed in *Wahdat-ul-Wujud.* I had the same belief earlier when I was not so well versed in the history of Islamic mysticism as I am now". (27)

Actually Nicholson even denies that Mansur Hallaj was a believer in *Wahdat-ul-Wujud*. Just as fixation of fundamentals of Iqbal's philosophy is the result of Maulana Rumi's influence the shaping of the aspects of Iqbal's thinking was done by Hadhrat-i-Mujaddid Alf Thani[20] The concepts of *Wahdat-ul-Wujud* which started creeping into Muslim society through Plato, Plotinus and Ibn-ul-Arabi[21] and brought the doctrine of *sukr*[22], which paralysed the entire Muslim society, met with strong opposition. Commenting on the Schopenhauer's theory (Arthur Schopenhauer (C.E) of *Wahdat-ul-Wujud*, a Philosopher has said that this belief was veiled atheism. This veiled atheism sowed the seeds of withdrawal from the world, asceticism and inaction in Muslim society. This poison rendered Muslim minds unproductive and pushed them into decline. The teachings of Mujaddid Alf Thani are an important source for moulding Iqbal's thought:

"Junaid Baghadadi[23], adopted the system of sahv[24] as opposed to sukr. Maulana Rumi taught Khudi in spite of being inclined towards *Wahdat-ul-Wujud* and Shaikh Ahmad Sirhindi, Mujaddid Alf Thani

---

20 Shaikh Ahmad Sirhindi (1564-1624 C.E). He was a very eminent sufi and was born at Sirhind close to and northwest of Delhi, India. His main achievements are his jihad against the secularism and anti-Islamic practices of the Mughal Imperial court during the reigns of Akbar and Jahangir, and his struggle to purify tasawwuf of all non-Islamic concepts and base it again on purely Qur'anic teachings. That is why he is called Mujaddid Alf Thani or Revivalist of the Second Millennium.

21. Muhiyuddin Ibn-ul-Arabi (d. 1240 C.E) he is an eminent Muslim philosopher and was perhaps the first philosopher to introduce the philosopy of Wahdat-ul-Wujud from the Greek school into the Muslim world. In his own days he was opposed by other Muslim thinkers, the most prominent among whom is Ibn Taymiyah (d. 1327 C.E)

22. Intoxication caused by a powerful spiritual experience.

23. Abul Qasim Al-Junaid Baghdadi (d.909 C.E)

24. Sobriety. The stage in the spiritual experience of a sufi in which he has overcome intoxication.

criticized and rejected Shaikh Muhiyuddin Ibn-ul-Arabi's Theory of *Wahdat-ul-Wujūd* and presented the theory of Abdiyat[25] in opposition to it strongly supported their efforts". (28)

Iqbal's intellectual and cordial relationship with Hadhrat Mujaddid Alf Thani can be judged from the fact that he said about Nietzsche (Friedrich Nietzsche d. 1900 C.E.) that if he were alive in the time of Hadhrat Mujaddid and had been associated with him he would have been remunerated with eternal happiness:

کاش بودے در زمانِ احمدے

تارسیدے بر سرور سرمدے

"If God granted that he had lived in the time of Ahmad

He would have attained eternal happiness" (29)

Iqbal got evidence from Hadhrat Mujaddid Alf Thani against the theory of *Wahdat-ul-Wujud.* Commenting on Ibn-ul-Arabi's theory of *Wahat-ul-Wujūd* Hadharat Mujaddid said that the great Shaikh, Muhiyuddin Ibn-ul-Arabi could not distinguish between Wujud and *Zāt*[26,27]. He could not rise above *Wujūd* to reach the *Zāt* of God. He said the same thing about Plato, that he became besieged with *Wujūd* and

25. Servitude, or condition in which a person regards himself as a slave of God. In the Holy Qurtan the word abd designates the nature status and destiny of man that he is a slave of God, not a Divine Being that he has no share in God's powers and rights and that he is to realize his ubudiyat or slavehood and be a perfect servant or slave of God (Abd).

26. Being and Essence respectively.

27. The distinction of Zāt and Sifāt is very nearly the distinction of substance and attributes. At times it looks like that of Existence and Essence. It can be rendered as the distinction of Being and Nature, or It and Its Qualities. Asma (plural of Ism), means divine names with reference to particular Sifāt or Zāt as they occur in the Holy Qur'an for example Ar Rahim the Merciful as they are the names of Allah in virtue of his Qualities or Activities, i.e. an Ism combines Zāt and Sifāt.

could not reach the *Zāt* because the *Zāt* is higher than and separate from *Wujūd*. The *Zāt* is Unequalled and Unique and Solitary. Hadhrat Mujaddid said:

"The glorious Shaikh (Shaikh Muhiyuddin Ibn-ul-Arabi) did not view their depravity, defects and discord, and fixed the truths of the possible as the cognitional forms of Allah (S.W.T), because these forms have assumed and external form after being reflected in the Eminent Allah's Mirror of Purity. This has been so because nothing existed outside it . He has not differentiated between these cognitional forms an the Attributes of Allah (S.W.T) So he asserted the positive opinion of *Wāhdat-ul-Wujūd*. And he called the *Wujud* of the possible identical with the *Wujūd* of Allah (S.W.T)." (30)

Dr. Burhanuddin Ahmad Faruqi in his "Hadhrat Mujaddid's Conception of Tawhid" has described Ibn-ul-Arabi's conce pt of *Wāhdat-ul-Wujūd* thus:

"Ibn-ul-Arabi's position with regard to Tawhid is that Being is one-it is that which exists. This Being is Allah. Everything else is His manifestations. Hence the world is identical with Allah." (31)

This means that it would be correct to say that Ibn-ul-Arabi considers Being and Allah or the universe and God as identical to each other. He writes:

"The identity of the world and Allah is conceived on the basis of the identity of His *Zat-o-Sifat* or Existence and Essence -substance and attributes; the world being only a *Tajalli* [28] or manifestation of His Sifa't or Attributes" (32)

---

28. Tajalli is really shining forth. The conception underlying is that God is Light and this Light shines forth as if bodily in many forms . Hence, it may be translated as Irradiation, Effluence, Emanation, Manifestation and in philosophical terminology as equivalent to Mode. When the Light shines forth on itself it is Tajalli-ba-Nafsihi. As the Light shines forth in various grades to the mystic it is Tajalli-i-Zati of Sifati etc. with reference to the mystic it means the vision of the Light or illumination by it. If this vision is that of the Being or Zāt of Allah it is Tajalli-i-Zati (Notes. 27 and 28 have been taken from Dr. Faruqui's "Mujaddids Conception of Tawhid.")

"Maulana Jami(Jami 1414-92 C.E) while explaining the *Wahdat-ul-Wujud* of Shaikh Muhiyuddin Ibn-ul-Arabi said:

"The Being is indeterminate it is the stage of *La-ta'ayyun* or Indeterminateness of the Unity. In its descent or Determination it passes through five stages. The first two are *Ilmi* or Cognitive and the last three are *Khāriji* or Existential. In the first Descent, the Unity becomes conscious of itself as pure Being, and the consciousness of Sifāt is only *Ijmali*, i.e. general - it is implicit. In the second Descent the Unity becomes conscious of itself as possessing the attributes; that is the stage of *Sifāt-i-tafsilli*, i.e. attributes in detail,- it is explicit. These two Descents seem to be conceived in conceptual or logical rather than actual; for they are out of time, and the distinction of *Zat* and *Sifat* or its attributes is only *Zahni* or logical. - Then began the real actual Descents. The third Descent therefore is *Ta'ayyun -i-ruhi* or the determination as spirit or spirits, the Unity has broken itself up into so many spirits, for example angels. The fourth of its Descents is *Ta'ayyun-i-mithali* or ideal determination; thereby the world of Ideas comes into being. And the fifth Descent is *Ta'ayyun-i-jasadi* or physical determination; it yields the phenomenal or physical beings. These stages are only gradual realizations of the capacities that were already latent in the attributes". (33)

This means that this series of Descents or Determinations resembles the theory of Emanation of Plato, Plotanius and Ibn-i-Sina (Abu Alal Ibn-i-Sina 980-1050 C.E) (34). Ibn-i-Sina also, basing it on his rationality believes in Emanation of the material universe from God and admits the universe and God to be each other's shadow and identical. But these philosophers seem to fail to visualize any *Zāt* above and beyond the level of *Wujūd*. That is so because *Wujūd* is the *Shuhūd*[29] of *Zāt* and *Wujūd is* contingent on makan[30] while *Zāt* is *Lā makan*[31]. How can the *Wujūd* contained in *makān* and the

29. Vision; apparentism.
30. Space.
31. Independent of space.

Lā Makān Zāt be the same? Hadhrat-i-Mujaddid Alf Thani criticised the philosophers on this point and said:

"The Creator of the universe *(Subhanahū wa Ta'ala)* has none of the above relations proven to exist between Him and the universe. The comprehension of and approach to Allah (S.W.T) is not of *Zāt* but is one of *Ilm*[32] as has been accepted by the *Ahl-ul-Haq*[33] and He (S.W.T) is not united with anything and Allah is Allah and the universe is universe. That Unique and Indescribable *Zāt* (S.W.T) cannot be identical with non-unique and the describable. The Eminent *Wajibd*[34] cannot be said to be identical with the *Mumkin*[35]. The *Mumtana-ul-Adam*[36] *Zāt* cannot be identical with the *Jaiz-ul-Adam*[37]. The changing of the Truth is impossible intellectually and according to the Shariah. One cannot be borne by the other". (35)

the "Creator "[38] and the "created"[38] have the relationship of the person reasoning and the article reasoned about. Hadhrat -i-Mujaddid says:

"Though the universe is the theatre for the display of the reflections of the perfection of Sifāt and appearance of Divine Names, the view of the Real is not visible and the shadow of the Real is not the Real, as is the religion of the people who believe in *Wahdat-ul-Wujūd*"(36)

"The one who is identified by symbols (Allah) cannot be contained in the times and cannot exhibit His Self in the articles which only have the quality of *Mumkin āt*. The *La makani Zat* cannot be contained in *makān*"(37)

Hadhrat-i-Mujaddid also passed through the stage of *Wahdat-ul-Wujud*. He says about this stage of his:

---

32. Cognition.
33 Thinkers who follow the Truth.
34. The one whose non-existence is inconceivable
35. The one whose neither the existence nor the non-existence is inconceivable.
36. Immortal
37. Mortal
38. Allah (S.W.T) and the universe respectfully.

"If this *faqir*[39] had accepted *Wahdat-ul-Wujud* it was on the basis ot *kashf* [40] and not through *taqleed*[41]. My denial of it now is also on the basis of *ilham*[42] and ilhām does not have room for denial, although it is not an argument for others either" (38)

Here Hadhrat-i-Mujaddid has stated three things which deserve consideration, One is that his belief in *Wahdat-ul-Wujud* was not through *taqleed* but through *kashf.* This means that *taqleed* is bad and *kashf* is a stage of knowledge experienced by all believers in *Wāhdat-ul-Wujud.* The next higher stage is ilhām which is the most reliable way of attaining deserve special mention. They are Abdul Karim Al-Jelli, Davvani and Iraqi.

Jalaluddin Muhammad Ibn-ul-Asad Davvani: He was born in Davvan, District of Gazrun. His father was a qadi, was educated in Shiraz and appointed qadi of Faris. He wrote treatises and annotations on philosophy and tasawwuf. In Persian he wrote the wellknown book, "Lavama-ul-Ishraq fi makarim-ul-Akhlaq", which is also called, "Akhlaq-i-Jalali". Iqbal has referred to his book "Zavvar" in the theory of time and has compared his theory of time with that of Professor Royce according to which:

"..... if we take time to be a kind of span which makes possible the appearance ot events as a moving procession and conceive this span to be a unity then we cannot describe it as an original stage of Divine activity, encompassing all the succeeding states of that activity. But the Mulla (Mulla Jalal-ud-Deen Davvani) takes good care to add thet a deeper insight into the nature of succession reveals its relativity; so that it disappears in the case of God to Whom all events are present in a single act of perception".

---

39. A person who loves God to the extent of renunciation of his personal will in his affirmation of the Beloved's (God's) Will.
40. Literally it means unveiling. It is apprehension of facts and events as well as truths, mundane as wellas celestial by inner sight or light. Generally the apprehension is symbolic.
41. Blind and unquestioned following of some person doctrine.
42. Ilham is inspiration; technically it is confined to mystics; it is reception of guidance or inspiration from above. The guidance thus received is not absolutely infallible, hence it is not binding on all but only on the recipient of it, provided it is not contrary to any injunction received through the Holy Prophet.

In addition to Jalauddin Davvain Iqbal also talked about the famous sufi poet Fakhruddin Ibn-ul-Ibrahim Iraqi (d. 1289 C.E.) in connection with his concept of time. Iraqi was a Persian sufi poet, *hafiz* [46] and was brought up in Hamadan. He was a disciple of Shaikh Bahauddin Zakariya of Multan, meditated at Multan and became *sahib-i-hal* [47] sufi. He was married to the daughter of Khwaja Bahauddin Zakariya, served his Shaikh for twenty five years, travelled to Asia Minor (Konia), Egypt and Sham (present day Syria and Iraq) and settled in Damascus. He is associated with the book titled, "Suluk-i-Iraqi" and "Kuliat-i-Lama'at" is his famous book (42). Iqbal has given importance to Iraqi also in his concept of time. He writes:

"The sufi poet Iraqi has a similar way of looking at the matter. He considers infinite varieties of time, relative to the varying grades of being intervening between materiality and pure spirituality. The time of gross bodies which arises from the revolution of the heavens is divisible into past, present and future; and its nature is such that as long as one day does not pass away the succeeding day does not come. The time of immaterial beings is also serial in character, but its passage is such that a whole year in the time of gross bodies is not more than a day in the time of an immaterial being. Rising higher and higher in the scale of immaterial beings we reach Divine time-time which is absolutely free from the quality of passage, and consequently does not admit of divisibility, sequence and change. It is above eternity; it has neither beginning nor end. The Eye of God sees all the visibles, and His ear hears all the audibles in one indivisible act of perception. The priority of God is not due to the priority of time; on the other hand, the priority of time is due to God's priority. Thus Divine time is what the Qur'an described as the 'Mother of Books' in which the whole of history, freed from the net of causal sequence, is gathered up in a single super -natural 'now' (43

46. One who knows the Holy Qur'an by heart.

47. A sufi who is in a passing feeling expression, such as elation, suppression, hope, fear etc., contrasted to more durable or permanent states such as patience, gratitude, love and trust, which are called Maqām (station).

The method of investigation of Iraqi in relation to time worked like a source for Iqbal's thought on the problem of time. Allama Iqbal wrote an entire paper on Abdul Karim Al-Jelli (d.1408C.E.) which explains his theory of "Absolute Unity". Al-Jelli's concept of the *Insan-i-Kamil* [48] is the foundation of Iqbal's concept of *Mard-i-Mumin* [49] or Insan-i-Kamil of Iqbal himself. Iqbal himself has said about this "He combined in himself poetical imagination and philosophical genius".

A review of the influence of Abdul Karim Al-Jelli on Iqbal needs volumes. We have sampled only a few prominent and representative personalities of the tradition of Muslim thought, otherwise scores of Muslim thinkers are included in this vast study from whom Iqbal has nurtured his mind and after strengthening them with the study of modern knowledge and thought has presented them in a purified form.

The study of Western knowledge and wisdom has a key position as a representative source of Iqbal's thought, because the study of Islamic learning and its comparison with and verification and confirmation from Western learning is common in Iqbal's works. Iqbal considered Islamic civilization as the forerunner of Western civilization, or considered the Western civilization as having evolved from Muslim civilizations. He thought that if the Islamic civilization had not become static and had grown in its natural way it would have been prosperous like the Western civilization. Moreover, the Islamic civilization, on account of its spiritual components would have been free from the evils which have appeared in the West due to relinquishing religion and compartmentalizing religion and politics.

جلال پاد شاهی هو که جمهوری تماشه هو

جدا هو دین سیاست سے تو ره جاتی هے چنگیزی

"it may be the majesty of kingship or the fun of democracy
If religion is separated form politics the latter becomes mere tyranny.

Iqbal appreciates the intellectual heights and scientific and technological achievements of the West but is vehemently critical of

48. Perfect Man
49. The true Believer

the confinement of the Western civilization to materialism and relegating religion and ethics to an unimportant position separating them from state craft. He is not dazzled by the glamour of Western civilization, but descending into its interior he has pointed out the branch on which this civilization is standing and moving towards its end. Iqbal has viewed the fruits of Western knowledge and arts with open eyes and has adopted and accepted them after testing them on a special standard and has presented them as an argument and affirmation of the fruits of his thought. He has also traced the origins of the products of Western knowledge in the Islamic knowledge and arts and in the works of Islamic theologians, orators and philosophers. In the whole Eastern world Iqbal's philosophical evaluation of Western knowledge is distinct and unique. Iqbal has not adopted the attitude of the defeatist, apologist or blind follower, but one of criticism and creativity . Iqbal adopted this attitude during the period when the sun did not set on the Western civilization and the whole East, excepting a few countries, was under the political subjugation of the West. Under these conditions it was strange for a person to adopt towards the West a critical attitude at the intellectual level, to trace the origins of Western civilization and pronounce judgement on its merits and demerits. In the entire Islamic world Iqbal alone was thus favoured to reach this intellectual level.

However, in spite of all this it is not wrong that the acquisition of Western knowledge played an important role in the moulding of Iqbal's thought. About benefitting from Western knowledge Dr. Ishrat Hasan Enver, describing the two stages of Allama Iqbal's thought pre-Intuitional and Intuitional says:

"The thought of Iqbal seems to have paseed through two stages-the Pre-Intuitional and the Intuitional. In the first statge, Iqbal follows the traditional ways of thought which due to their affinity with Pantheism appealed most to the broken and tottering society of the Muslims of the time. But his visit to Europe energized his spirits, strengthened his will, and brought in its wake a political reaction in him. He began to emphasize action, activity and self-assertion rather than passivity, indifference and self-negation. He gained strength for his thought from the study of Bergson (Henri Bergson 1859-1941 C.E), Friedrich

Nietzsche and McTaggart. This led him to accept the reality of the self and the force of the will as fundamental"

It is not impossible to infer from this that Western knowledge had influenced Iqbal's thought to some extent. The study of Western learning helped him in arriving at and moulding the end-results of this thinking. The evidence of benefitting from Western knowledge is amply available in his works. However, the benefits derived by Iqbal from the West are in the detail and not in the principle. As far as principles are concerned his thoughts are not only Eastern but really an extension of Islamic thinking. Still his works show the trend of benefitting from Western knowledge in the organization, shaping and explanation of details... For example, Allama says:

"A greater part of my life has been spent in the study of Western philosophy and this point of view become second nature to some extent. Consciously or unconsciously I study the truths of Islam from this angle." (46)

مے از میخانہ مغرب چشیدم

بجان من کہ درد سر خریدم

نشستم با نکویانِ فرنگی

ازان بے سوزِ تو روزے ندیدم

"I draw my wine from the tavern of the West
I purchase a headache for myself
I have sat with the good men of the West
But I have not seen a day with them without the longing for thee"(47)

Here Iqbal has accepted the Western trend in his thinking and its influence on the study of Eastern and Islamic learning. The following letter indicates the extent of Westernization in his thinking and philosophy. Hence, denying the influence of Western knowledge on Iqbal is neither factual nor realistic. Iqbal says:

"I admit that I have benefited from Hegel, Goethe (Johanne Wolfgang von Goethe 1749-1832 C.E), Mirza Ghalib (Mirza Asadullah Khan Ghalib d. 1869 C.E.), Abdul Qadir Bedil (d. C.E) and Wordsworth

(William Wordsworth 1770-1850 C.E.). Hegel and Goethe have guided me in penetrating the internal truth of things. Bedil and Ghalib taught me how to keep the spirit of the East alive in my feelings and their expression in spite of absorbing the values of Western poetry and Wordsworth helped in protecting me from materialism during my educational days".[48]

In the above extract whereas Iqbal has admitted that Wordsworth saved him from materialism and Hegel and Goethe guided him in reaching the internal truth of all matter, he has also said with reference to Mirza Ghalib and Abdul Qadir Bedil that in spite of absorbing the values of Western poetry the ambition and motivation of keeping alive the spirit of the East in his emotions and expressions was derived from them. Iqbal's entire thinking and manner or expression is represented by the conclusion that he absorbed the spirit of Western poetry and philosophy and benefitted from Western philosophy in the comprehension of the truth about matter, but at the same time he also retained orientalism together with the traditions of Muslim thought in a systematic way and reached their truth. These are the goals of the Holy Qur'an and Islam . He was impressed by Western thought, not because he had himself reached its Islamic origins, but because he considered Western civilization as only an extension of Islamic civilization. He points this out in his paper "Islam and the New Learning".

Bacon (Roger Bacon 1216-1292 C.E), Descartes (Rene Descartes 1596-1650 C.E) and Mill (John Stuart Mill 1806-1873 C.E) are considered to be Europe's most eminent philosophers, whose philosophy is said to be based on experience, but the fact is that Descartes "Method" is present in Imam Ghazali's "Ihya-ul-Uloom" and they are so similar that an English historian has written that if Descartes knew Arabic we would have admitted that he committed plagiarism. Bacon himself was educated at an Islamic university. The objection raised by John Stuart Mill against the first hypothesis of logic is exactly the same as raised by Imam Fakhruddin Razi and all the fundamental principles of Mill's philosophy are present in the famous book of Shaikh Abu Ali Sina, "Shifa". In short, all the principles which form the foundations of modern learning owe their existence to the

beneficence of Muslims. In fact I claim that not only with respect to modern learning but there is not one good aspect of human existence which has not been enlivened by Islam's extremely invigorating influence". (49)

If Iqbal considered European civilization to be only an extension of Islamic civilization the question arises as to why he did not content himself with the Islamic civilization and why he objected to Western knowledge and philosophy. There are three answers to this. First, Iqbal considered the European civilization to be an extension of the Islamic civilization and so considered benefitting from the thinking of European philosophers and thinkers as tantamount to retrieving the links of his own civilization. He considered it possible to create a stir in the centuries old static condition of Islamic civilization by accepting the products of Western learning in some measure. As this Western wisdom is not alien to Islamic wisdom its acceptance could bridge the gap which has occurred between the rise and present fall of Muslim civilization. Secondly, as his audience comprised those who understood the language of Western learning it was necessary to talk in their own language. Thirdly, Iqbal knew that if the Islam civilization had also continued to evolve it would have positively produced the same results in science and technology as were produced by the West.Also, the products of many departments of learning have supported and confirmed Qur'anic concepts. So when the modern theories confirmed the truths of Islam Iqbal showed the world where their real source was.

Recently the Iqbal Academy has published a book by Dr. Muhammad Ma'ruf titled "Iqbal and His Contemporary Western Thought", in which the author has presented the study of the philosophers and schools of thought of the twentieth century whose influences are available in Iqbal's philosophy. According to Dr. Ma'ruf this book will open up many hidden niches and will help in fixing the position of Iqbal's thought in the world thought. In this book he has contradicted the thoughts of people like M.S. Rashchid in the matter of comparison of Iqbal with Western philosophers that Iqbal's concept of God was borrowed from Hegel's concept of the Finite and has considered such thoughts as meaningless and prejudiced (50). This is so

because Hegel's concept of the Finite cannot be concordant with Iqbal's "*Al-hayy-ul Qayyum* "[50] .This book is very important in the study of Iqbal in which the concordance of Iqbal's thought with Western thought has been viewed ona philosophical basis and includes a comparative study of Hegel, conceptualists, Kant (Immanuel Kant (1124-1804 C.E) naturalism, pragmatism and realism and other sociologists.

I will talk about four Western philosophers who are said to have influenced Iqbal much. I have Nietzsche, Bergson, Goethe and Newton (Sir Isaac Newton 1642-1723 C.E.) in view, although each philosopher deserves a separate volume on account of his place and status. Kant and Dante (Alighieri Dante 1265-1321 CE.) also deserve attention to some extent. This is so because it is said that Iqbal wrote his "Javid Namah" in the style of Dante's "Divine Comedy". The "Divine Comedy" was certainly in Iqbal's view but the "Divine Comedy" itself was written in the style of Mi'raj Namahs written in Spain. There were several Mi'raj Namahs in Islamic literature apart Dante's but the Mi'raj[51] of the Holy Prophet was the greatest source of inspiration for Iqbal. Iqbal took neither the style nor the happenings of the intellectual journey of the "Divine Comedy". Still a gap would have remained if Iqbal had ignored Dante at the time of writing the story of his intellectual journey. It is an accomplishment of Iqbal that in view of his acquaintance with Western literature in addition to the Eastern he did not ignore the "Divine Comedy" but in fact praised some of its literary sytle. In the same way he used the products of Immanuel Kant's thought for affirmation of religion, because Kant had tried hard to demolish the excessive power of intellect by fixing its limits in his book "A Critique of Pure Reason" and had freed Faith from the bondage of pure reason, He was talking about the "reason" which while affirming the existence of the problem in a partial way, fails to see the Truth in its fullness.

عقل گو آستان سے دور نیهن

اسکی تقدیر مین حضور نهین

50. The living, Self Subsisting, Eternal

51. Celestial Ascent of the Holy Prophet.

"Though reason is not far from threshold
It is not fortunate enough to reach the Presence of God"

This means that while rationalism can guide Man to the Wujud of Allah (S.W.T) it cannot comprehend and describe His *Zat.*

Analyzing the conditions of the eighteenth century Germany Iqbal says that at that time in Germany also reason was considered an ally of religion but when in a short period of time it became evident that dogmas could not be proved rationally the Germans had no alternative but to eliminate the portion of dogma from religion. But by relinquishing dogmas morality became pragmatic and so religiosity held sway under the influence of rationalism. This was the state of affairs of religious meditation and thinking when Kant appeared in Germany .When the limitations of human intellect became evident from "A Critique of Pure Reason" the stratagem fabricated by rationalists about religion became a code of absurdity. Hence, it was correctly asserted that Kant was the highest favour bestowed by God on Germany. Iqbal compares Knat's doubts with those of Ghazali and obtains proof from him in the struggle between rationalism and religion. The products of the nature and limitations of rationalism in the works of Ghazali and Kant are echoed in Iqbal.

As regards Nietzsche, asserting that his "Superman" is in any way connected with Iqbal's *"Mard-i-Mumin"* betrays ignorance of both Iqbal and Nietzsche. This is so because in calling Nietzsche *Majzub-i-Farangi*[52]. and being unaware of God, Iqbal exposes the spiritual ineptness of Niezsche.

اگر ھوتا وہ مجذوب فرنگی اِس زمانے مین

تو اِقبال اس کو سمجھا تا مقام کبریا کیا ھے

"If that Majzub-i-Farangi were alive at this time
Iqbal would have shown him the elegance of the Status of God"

52. Majzub is the one absorbed in God. Majzub-i-Farangi means one absorbed in the materialism of the west.

Again when Iqbal says that would God grant Nietzsche to live during the period of Hadhrat-i-Mujaddid and be associated with him he would have been rewarded with the truths of Eternal Happiness, it does not show even partial concordance and harmony between his and Nietzsche's thoughts. Dr. Iqbal has himself cleared this state of affairs in his letter to Dr. R.A. Nicholson. He says:

"He could not understand my concept of *Insan-i-Kamil* correctly and confusing the issue, assumed my *Insan-i-Kamil* and the German thinker's "Super-man" as the same. I had started writing about the *tasawwuf's* belief of *Insan-i-Kamil* about twenty years ago, and this was the time when neither the sound of Nietzsche's beliefs had reached my ears nor had I read his books. Nietzsche is a thinker of the school of *Baqa-i-Shakhsi*[53]. He asks all those who are anxious for acquiring subsistence whether they want to burden the earth permanently with their load. He has written like this because his concept of time was wrong. He never tried to understand the ethical side of the problem of time. On the contrary, in my view *baqa* is the highest longing of Man and is such a precious wealth on acquiring which Man concentrates all his powers. That is why I consider all forms and shapes of action, including conflict and war, to be necessary and according to me, Man attains increased stability and firmness through them. Therefore, in pursuit of this thought, I have rejected the concept of a static being and similar *tasawwuf* , which is based on mere conjecture. I consider conflict necessary in ethical and not political ways, although on this subject the centre of Nietzsche's though is perphas politics" (52)

Perhaps it will be ill-intentioned to say after this analysis by Iqbal himself that he has taken his concept of *Mard-i-Mumin* from Nietzsche. This is so because the "Super-man" is blind, materialistic power, while the *Mard-i-Mumin* is adorned with *Wahi* and is a Godly man, whose climax is *Adbiyat*. In Iqbal's view the model *Mard-i-Mumin* in the applied world is the personality of the Holy Prophet, which is guided by *Wahi*, is master of ethical eminence and revolutionary and

---

53. The mystic experience of an individual's subsistence or living by and in God after dying (fana) of the individual.

which resurrects new values of life with his actions, while Nietzsche's "Superman" in scholastic interpretation was Hitler, who was greedy for power and authority and was prepared to do anything to attain them. Iqbal's *Insan-i-Kamil* is a mercy to the human race, while Nietzsche's "Superman" is a destructive blind force which brings about destruction after tumult and oppression in the entire world. The late Abdur Rahman Tariq in his book, *"Jahan-i-Iqbal"* has very Heautifully brought out the distance between Iqbal and Nietzsche comparing their works (53).

Dr.Annemarie Schimmel, being German, has very skilfully drawn parallels in the thoughts of Iqbal and Goethe. In her book "Gabriel's Wing" which has been translated into Urdu by Dr. Muhammad Riaz under the name *"Shahpar-i-Jibreel"* she has compared Iqbal and Goethe. She tries to harmonize Goethe's concept of God, "God, the Lord, Complete, Movement, in Eternal Endeavour and Action" with Iqbal's concept of God . Secondly, Goethe considers the existence of Ibis and Evil necessary for the evolution of life as does Iqbal show his approval of the usefulness of Ibis and Evil. No doubt, Iqbal has praised Goethe as a visionary poet and student of Eastern learning. But we have to realize that while the centre and orbit of Goethe's longing and the limits of his thought is in orientalism he is reduced to the position of a pointer at best, which guides Iqbal to his own real East. If so, why should Iqbal not be considered attached to the East throught his thought and longings rather than through those of Goethe?

Iqbal praised Goethe only because he loves orientalism. Goethe's disappointment with the West and his inclination to the East has been an important matter to Iqbal. Goethe's own *Divan*[54] titled "West-Oestlicher Divan" is known as.

"Movement of the East" in the history of German literature . In the words of Iqbal "Apart from Hafiz Goethe, is indebted for his ideas to Shaikh Attar, Sa'di (Shaikh Muslehuddin Sa'di d.1292 C.E), Firdausi (d.1020 C.E.), and Islamic literature in general.

---

54. Poetical collection

Now, in the words of Iqbal, when Goethe tried to create a Persian spirit in German literature, it is obvious that Iqbal was aware of the secret of the existence of Persian thinking in Goethe's thought. Schimmel is right to the extent of the existence of unlimited resemblance between the mode of thinking of German philosophers and Iqbal. Goethe is not related in any way with the sources of Iqbal's thought. By praising Goethe's literature Schimmel, cannot prove it to be the source of Iqbal's thought.

Bergson is given much importance as the source of Iqbal's thinking. Certainly the conclusions of Bergson's intellectual thought had greatly influenced the shaping of Iqbal's thought. Bergson's strengthened Iqbal's thought by rejecting the materialistic interpretation of life, excessive emphasis on rationalism and the sameness of the body and the soul in the twentieth century. This is so because Bergson was intellectually a constructive and firm intellectual. In the words of the late Bashir Ahmad Dar:

"What attracted Iqbal to Bergson was the fact that Bergson was a strong supporter of the deeper consciousness of human thought. In other words it can be said that he was a strong believer in the spiritual side of human existence and the function of intuition which creates the experience of motion." (56)

"Based on solid facts Bergson exposed the reality of the evolution which was considered by the West to be the last nail in religion's coffin" (57)

"During the course of a meeting with Bergson Iqbal told him of the *Hadith* [55], "Do not curse time because I am myself time" he was astonished. (58)

The front established by Bergson against science and materialism provided much strength to Iqbal's thought. Professor Jagannath Azad in his book, "The Intellectual Proximity and Remoteness of Iqbal and Bergson" has very well traced the movements which were common between Iqbal and Bergson and has also detailed their

55. Traditions and sayings of the Holy Prophet.

-intellectual remoteness. The limitations of the mechanics of the length of life imposed by materialism and the non permanence of time brought Iqbal close to Bergson because this was Iqbal's intellectual closeness to him. His intellectual distance from Bergson in Iqbal's own words was that:

"For Bergson conscious experiences have merely the status of the past, the past, which running with the present, ultimately merges into it. Bergson ignores the fact that it is also an aspect of consciousness that it runs the future. Life is the practical realization of a thought and thought, assuming a practical form without any objective

is inexplicable, irrespective of the practical form being conscious or sub-conscious. Not only this, but the fixation of the activity of our perception and basic thought also is governed by our immediate objectives" (59)

In the same way the prolongation or permanence of time is purposeless in Bergson's view while time is meaningful to Iqbal, because if evolution has no objective it is entirely meaningless in Iqbal's view.

The relationship between Einstein (Albert Einstein 1879-1955 C.E) and Iqbal is created by the theory of relativity. As the most important aspect of relativity is the discovery of time and space the prolongation of our life and the distance travelled by us in the vast field of time become absolutely unimportant. Appreciating the theory of relativity and fixing its usefulness Iqbal says:

"The philosophical value of the theory is twofold. First it destroys not the objectivity of Nature, but views substance as simple location in space- a view which led to materialism in Classical Physics. 'Substance' for modern Relativity -Physics is not a persistent thing with variable states, but a system of inter-related events. In Whitehead's (Alfred North Whitehead 1861-1947 C.E.) presentation of the theory the notion of 'matter' is entirely replaced by the notion of 'organism' .Secondly, the theory makes space dependant on matter.

The universe, according to Einstein, is not a kind of an island in an infinite space; it is finite but boundless; beyond it there is is no empty space. In the absence of matter the universe would shrink to a point" (60).

Iqbal saw identity in Einstein's theory of relativity, which negated materialism. However, the Allama had strong differences with Einstein in some matters. As Iqbal, like Bergson is a believer in the reality of time he does not agree with the discovery of Einstein, which apparently denies time. This theory considers even the existence of time as unreal. At any rate Iqbal has praised the positive aspects of the theory of relativity and has criticized its negative ones.

The truth emanating from a detailed study of this subject is that Iqbal's mind was not imitative but creative, and was the one establishing connections between different thoughts. He established his theories and used the inferences drawn from the old and the new thinkers as his sources for the confirmation and elucidation of his own theories. Still he wanted religion to be defended in the present day world and had in view its explanation and interpretation in the language of the present age. Hence, he tried to benefit from the products of the thinking of the new thinkers with open eyes to explain the matter to the new minds in the new way and in doing so he did not allow the prejudices of the East and the West to blind him. He accepted everything good and criticized every faulty though in the manner of a thinker endowed with enlightenment of the heart and the mind. In this way he brought into use his highest intellect in order to keep alight the torch of thinking of the human race. Still, if any single thing can be considered to be the source of his thought it is none other than the Holy Qur'an, because all the remaining products of Iqbal's intellect were explanations of this simple secret of Faith.

ولایت پاد شاهی علم اشیا کی جهانگیری

یه سب کیا هین ، فقط اك نکته اعیان کی تفسیر ین

"Walayat, kingship, the universality of the knowledge of things
What are all these? Only tafsirs of the secret of Iman.

REFERENCES

1. SCHIMMEL, Annemarie 1987. Gabriel's Wings Urdu Translation by Dr. Muhammad Riaz, titled, "Shahapar-i-Jibreel" Globe Publishers: P. 393

2. QURAISHI, Ishtiaque Hussain (1966). The Psychological Sources of Iqbal's Philosophy. Annual Convocation Address, Punjab University, Lahore, Punjab, Pakistan.

3. IQBAL, Allama, Dr. Sir Muhammad (1930). Reconstruction of Religious Thought in Islam; Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan (1982): P.6.

4. Najla Izzuddin; Translated by Muhammad Hussain, Maktaba-i-Jadid, Lahore. 1960

5. SCHIMMEL, Annemarie 1987, Gabriel's Wings Urdu Translation by Dr. Muhammad Riaz, titled, "Shahapar-i-Jibreel", Globe Publishers: P 392.

6. Ditto:

7. HASAN, Ishrat Enver (1944). The Metaphysics of Iqbal. P.7-8 Extracts from Presidential Remarks by Professor Dr. Syed Zafarul Hassan on "The Six Lectures" delivered by Iqbal at the Muslim University, Aligarh, (1929): P.7.

8. Ditto: P.8.

9. IQBAL, Allama, Dr. Sir Muhammad (1930). Reconstruction of Religious Thought in Islam; Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan (1982): P. 106-107

10. AHMAD, Absar (1973) "Islami Taleem" July-August 1973:P14

11. IQBAL,Allama Dr. Sir Muhammad (1932) Javid Namah. Versified English Rendering by A.Q. Niaz. Published by the Iqbal Academy, Lahore, Pakistan (1984): P.22-23

12. Ditto: P.23

13. QADI, Javid. Wujudiat "Nigarishat" Lahore: P.38

14. NADVI, Maulana Abul Hassan (1948). Nuqush-i-Iqbal. Idara-i-Nashriat-i-Islam, Karachi, Pakistan: P.55

15. IQBAL, Allama Dr. Sir Muhammad (975), Kulliat -i-Iqbal, Urdu: p.348

16. Ditto: P. 332

17. SYED, Nazir Niazi (1981). Iqbal Ke Huzoor. Published by the Iqbal Academy, Lahore, Pakistan: P. 60-61

18. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1975). Kulliat-i-Iqbal, Urdu P. 370

19. Ditto: P 271

20. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1975). Kulliat-i-Iqbal: Farsi P. 20

21. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1930) Reconstruction of Religious Thought in Islam. Urdu Translation by Syed Nazir Niazi (1981): introduction.

22. KHAN Yussuf (1944) Husna -Rooh-i-Iqbal -Introduction

23. AKBARABADI, Maulana Saeed Ahmad (1987) Khutubat-i-Iqbal Par ek Nazar. Iqbal Academy, Lahore, Pakistan: P.19

24. KHAN Gulam Mustafa Khan (1988) Dr. Iqbal aur Qur'an Iqbal Academy, Lahore, Pakistan. (This book is based on Iqbal's verses and Qur'anic vreses). Professor Muhammad Munawwar's "Burhan-i-Iqbal" Published by Iqbal Academy, Lahore, Pakistan see "Iqbal ba Huzoor-i-Qur'an " and other paperss.

25. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1975). Kulliat-i-Iqbal: Farsi:P.123.

26. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1938). Armaghan -i-Hijaz. Published by Dr. javid Iqbal, First Edition: P 77

27. NICHOLSON, R.A (1964) The ideu of Personality in Sufism..

28. NADVI,Abdul Bari (1949) Tajdeed-i-Tasawwuf aur Suluk, First Edition: P.160

29. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1975). Kulliat-i-Iqbal:Farsi : P. 741

30. MUJADDID, Alf-i-Thani(1984). Maktubat-i-Imam-i-Rabbani: P. 58

31. FARUQI, Burhan Ahmad (1940). The Mujaddid's Conception of Tawhidd. Published by Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore ,Pakistan: P 58

32. Ditto : P.58

33. Ditto: P. 58

34. ISHRAT, Waheed-Ibn-i-Sina ka Tasawwuf-i-Hasti (Unpublished Paper). Proceedings of Seminars, Department of Philosophy, Punjab University, Lahore, Pakistan.

35. MUJADDID, Alf-i-Thani (1984). Maktubat-i-Imam-i-Rabbani: p.III

36. Ditto:

37. Ditto: P.113

38. Ditto : P.114

39. Ditto : P.58

40. SYED, Abdullah (1977) (Compiler) "Muta'alliqat-i-Khtubat-i-Iqbal" Iqbal Academy, lahore, Pakistan: P. 94

41. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad(1930). Reconstruction of Religious Thought in Islam. Published by Dr. Javid Iqbal through Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan (1982): P. 75

42. Ditto: P.144

43. Ditto: P. 65-76

44. SHERWANI, Latif Ahmad (1977). Speeches, Writings and Statements of Iqbal. Iqbal Academy, Lahore,. Pakistan: P. 70

45. HASAN, Enver Ishrat (1944). The Metaphysics of Iqbal; Published by Shaikh Muhammad Ashraf,P. viii.

46. SHAIKH Ataullah (1946) Iqbal Nama: Published by Shaikh Muhammad Ashraf, Vol. 1. P.4

47. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1985). Kulliat-i-Iqbal, Farsi: P 929.

48. SIDDIQUI, Iftikhar Ahmad (1923) Translator. Shuzrat-i-Iqbal Bazm -i-Iqbal, Lahore, Pakistan: P.105

49. MUINEE, Syed Abdul Vahid (1963). Maqalat-i-Iqbal: Published by Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan: P 239-240

50. MAROOF, Muhammad (1987) Iqbal and His Contemporary Western Religious Thought: Published by Iqbal Academy, Lahore, Pakistan: P.

51. Ditto: Introduction

52. TARIQ, Abdur Rahman (1949). Jahan-i-Iqbal: Published by Malik Deen Muhamm, Dar-ul-Isha'at, Lahore, Pakistan: P.19-20

53. Ditto: See the paper titled, "Iqbal aur Nietzsche.

54. SCHIMMEL, Annemarire (1987). Gabriel's Wings. Urdu Translation by Dr. Muhammad Riaz titled, "Shahpar-i-Jibreel" Globe Publishers, Lahore, Pakistan: P 406-407

55. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1971) Payam-i-Mashriq, Thirteenth Edition 1971: Published by Shaikh Ghulam Ali & Sons Ltd., English Translation.

56. DAR, Bashir Ahmad (1956). Iqbal aur Bergson: Bazm-i-Iqbal, Lahore Pakistan: P. 103

57. Ditto: P. 104

58. IQBAL, Justice Dr. Javid (1984). Zinda Rood Vol.3, Published by Shaikh Ghulam Ali &Sons Ltd., Lahore, Pakistan: P. 496

59. Shifa-i-Iqbal (1987). Bazm -i-Iqbal, Lahore, Pakistan: P 299-300

60. IQBAL,Allama Dr.Sir Muhammad (1930) Reconstruction of Religious Thought in Islam: Published by Dr. Javid Iqbal through Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan (1982): P. 38

Allama Iqbal *

Mohammad Ganjidoost

IN THE NAME OF ALLAH, THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL

My dear Muslim Brotheren, Assalam-U-Alaikum.

It is an honour and previlege for me to address this august gathering organized by the Allama Iqbal Society of Bangladesh to commemorate the fifty-third anniversary of the demise of Dr. Allama Mohammad Iqbal, a great Islamic personality of this century.

It is not easy to talk about Iqbal. specially, when he is to be seen as a personality who blossomed and turned into a mobilizing institution. For, in knowing Iqbal lies the realization of a devoted line of thinking, a dignified way of intellectual life and the secret of the Islamic influence and its dynamism in enabling one to serve his people as well as human society.

From among our people there have been very many who have left their homeland for the West, supposedly in search of higher education so as to help their fellow countrymen. However, despite large investments made on them at the cost of deprivation of the down-trodden people of Their country, rarely there have been the ones who have kept up with their primary objective. It is unfortunate that not only have most of them forgotten their moral commitment but also in many cases there have been the ones who have turned into agents to serve, knowingly or unknowingly, the interest of the colonizers and against the interest of their own people. On the other

* An address delivered as chief guest at a Semine r on Allama Iqbal held under the auspices of Allama Iqbala Society on 15 May '91

hand, this process of exploitation of the desire for getting higher education in the West has been so beneficial for the vested interest that since long it has been adopted as a method of influence for manipulation by the colonizers. It is noteworthy that, in some branches of science, particularly socio-political ones, even the very content of science has lost its merit to the formulas to be kept in mind wherein the thinking is channelized and the conclusions are framed and contained. It is due to this very fact that, the most important problem in dealing with some Western educated elites is often to make them feel the real atmosphere they live in, the realistic situation prevailing in their societies, the particular problems facing their communities and the merit of their own culture and beliefs in finding solutions to them. All they have gathered, after years of dwelling in the west seemingly to enhance their knowledge, is a colored glass to be put on to see everything through that and an ear to receive and a mouth to transmit whatever is whispered to them through the communication network of the arrogant powers.

In view of these realities, it is not unjustified that despite large numbers of Western educated elites, their contribution to the solution of the problems of Muslim states have not been positive. Not only that but in many cases such West in toxicated elites have added new problems and have been the very cause of degradation and humiliation of their people. It is interesting to note that for example in the Iranian history in the recent century there is almost no instance of a treacherous and humiliating agreement but the signature of so called elites is under that. On the other hand, the number of those who have gathered their knowledge from the West and have positioned themselves in the rank of the ones who struggled for the just causes of their oppressed people have not been many.

Iqbal was one of those pioneer intelligentsia, who were truly educated and in the process of their learning, got the most benefit of what could be offered by the West as pure scientific thinking and valuable experiences uncontaminated with elements of the Western corruption. Neither the glamours of the West lured him, nor the superstitions prevailing in his society in the name of religion alienated him from his own culture.

He identified the traps set by the manipulating hunters of the West and enlightened the new generation as to the pitfalls in their way and thus directed them to the true path of universal search for knowledge in science and technology.

Iqbal had a rightful vision of his time. He was aware of the problems of his society and knew the conditions prevailing in the Muslim world. Moreover, his deep understanding of Quranic tenets while having a good knowledge of contemporary ideologies enabled him to offer correct solutions.

Iqbal diagnosed very wisely the core of the illness of the Muslim societies as their alienation from their own true culture which unless cured would result in their getting lost in the wilderness of nowhere. He emphasized the need to return to the self. The immortal self of pride and dignity. The self that makes out of a man of clay, the viceregent of Allah. The true Islamic self.

In short, we are today commemorating a great philosopher, as highly logical as Iqbal, who was at the same time characterized as a committed Islamologist with a burning heart of an elegant poet. He had a true appreciation of the Pearl of Islam and a good awareness of it merits and thus was fully confident of its dynamic effect for individual as well as social human evolution.

No doubt, the eternal life of Iqbal like those of the other great servants of Allah has been even more fruit giving after his physical death. We talk of Iqbal not only as a great person, but also as a Muslim thinker whose personality has turned into an institution to serve the cause of Islam to save humanity.

Today, not only the Muslims of the subcontinent, rather, Muslims all over the world, need Iqbal more than ever before. His efforts to awaken his society and the Muslim Ummah to return to their cultural self of Islam so as to gain back their glory is yet to be followed up.

Let us pray for his dignified soul and hope that his way will be continued. I thank ones again the organizers of this seminar for arranging this programme to uphold his name and his way.

Iqbal aur Alami Adab

by Dr. Abdul Maghni

Iqbal Academy, Lahore
604 pages
Second Edition 1990

The book is a reprint of an Indian publication. It purports to be a detailed rejoinder to a work by Dr. Kalimuddin of Patna in which he is said to have drawn a comparison between Iqbal and Dante and Milton and to have concluded that neither in scope and plan nor in execution does Iqbal's Javed Nama come anywhere near the epics written by Dante and Milton. Dr. Kalimuddin, as far one can judge from quotations from his work given by Dr. Maghni, is of the view that Western literature is far superior to anything Eastern writers have produced.

The attack on Iqbal and the general assumption that Eastern works are in- ferior to Western literary products appear to have infuriated Dr. Maghni. His rejoinder is at the same time a personal attack on Dr. Kalimuddin and a criticism of whatever the West has produced. Undoubtedly, Dr. Kalimuddin's judgement on Iqbal is unjust, but reading Dr. Maghni one wonders whether sweeping generatisations to the effect that Shakespeare, Dante, Milton and other Western writers have written nothing which is worth anything compared to the works of their counterparts in the East, can be sound criticism. Dr. Maghni dismisses Western drama as something althogether objectionable from the moral point of view and on that account he is not prepared to admit that Shapespear's creations deserve any praise. He finds himself at this point so worked up as to declare in cold print that whatever the merit of Shakespeare as a dramatist he did not write any poetry which as poetry could challenge comparison with Iqbal's verse.

Since Dr. Kalimuddin had the 'audacity' to observe that Dante's 'Divine Comedy' by which Iqbal is said to have been influenced is far greater as a work of art and displays better knowledge of astronomy, Dr. Maghni tries to demolish the argument by saying that Dante's astronomy was a tissue of absurdities.

There are remarks of the same kind about numerous other Western authors. All this is amusing; indeed, sometimes one feels regularly tickled by Dr. Maghni's indignation. He appears to be a well-read man with considerable knowledge of Western culture. Why he should have been so provoked by Dr. Kalimuddin may bot be difficult to understand but what surprises one is why he should have thought that it is only by painting Iqbal as the greatest of all creative writers that one can best defend him. The result, we regret to say, is likely to be that his defence would fall flat on all those with a sense of proportion.

There is no denying that Iqbal was a great poet, but there is no single great poet in the world who can be said to have produced something immortal in every genre of literature. Not to speak of such different literary forms as poetry (there are so many kinds of poetry)---, drama, prose fiction, biography, belles lettres, no writer, however gifted, can possibly in a single lifetime, exhaust all possibilities in any one form. Shakespeare wrote superb plays; few compare with him in dramatic poetry; his sonnets are some of the most beautiful love poetry in the world, but who but a lunatic would claim that there is nothing outside his works which is worth attention? Firdausi, Hafiz and Rumi are great names in Persian literature, but each is famous for one kind of poetry. Their greatness is in no way diminished by the fact that there exist so many types of literature which were either unknown in their time or which they did not attempt.

It is not a question of any writer having limitations. The term limitations suggests a failure of creative power, but why should we accuse a person of any failure merely on account of the fact that he does not go beyond certain areas?

For the same reason, comparisons between writers. cannot be stretched too far. The general test applied in the evaluation of the

greatness of a creative author is to measure his ability to lay bare the diversity and many-sidedness of human nature, Shakespeare is believed by many critics to have possessed a range which few others suroassed. But even this is no infallible test. Similarly the theory to which Dr. Maghni resorts, that Eastern and Western literature represent absolutely watertight campartments is not acceptable either. If we accept that great literature has an appeal which transcends geographical boundaries, a fact attested by our actual expereience, why should it be necessary to pit a Western or Eastern writer against his counterpart in the other hemisphere to prove his greatness or worthlessness?

Dr. Maghni quotes the notorious observation by Macaulay that a single shelf of European literature is worth all the output of the East, a statement which has made its author the butt of jokes all over the world. But in claiming that Iqbal surpassed every known author in the West, isn't he committing the same sort of blunder? This hyperbole loses his defence the credibility it needed to have in order to be convincing.

It has sometimes seemed to me that in implying that such literary forms as either Iqbal or other Muslim writers did not either practise or excel in were not worth much Dr. Maghni proves himself to have the same kind of blindness with regard to the world as Macaulay had.

We appreciate Dr. Maghni's anxiety to defend Iqbal, but we do not believe that he has hit upon the right method. Incidentally in trying in connexion with Milton to prove that Milton distorted religious dogma in his epic, he makes the mistake of supposing that literature and dogma could follow the same rules. The critic who evaluates Iqbal has to have first a sense of proportion, which Dr. Maghni lacks. Wild claims on behalf of any writer, exaggerated praise, does him more harm than good. The last thing any lover of Iqbal would want is to expose him on account of the hyperbole of his admirers to ridicule anywhere.

Syed Sajjad Husain

Abstract of articles in Bengali

Syed Sajjad Husain

Ahmad Nadim Qasimi's article, written on the occasion of the Iqbal centenary celebrations, reviews the whole of the poet's career and artistic achievements. He traces Iqbal's debt to tradition and his place in the corpus of Islamic literature judged as a unity. The writer emphasises that unlike many others Iqbal was from the beginning conscious of a mission, which was multi - dimensional, political, philosophical and educational. It was this consciousness which accounts for the transition from Indian nationalism in his early poetry to pan-Islamic sentiments in his later work.

Dewan Muhammad Azraf notes that what distinguishes Iqbal is the dynamism of his thought. He was no mere Hedonist like earlier poets in Urdu. This dynamism had its roots in Iqbal's approach to Islam as a religion which denounces renunciation as an ideal and calls upon humanity to mould and remould the world in the light of the higher ideals enunciated in the Quran.

Abu Sayed Nuruddin discusses the nature of Iqbal's Tasawwuf with special reference to his doctrine of Khudi and agrees with Dewan Azraf that the source of the poet's Tasawwuf was to be found in the Quran.

Saleh Ahmad provides some information about Iqbal's contemporaries, both Eastern and Western, and shows that in his assessment of them the poet was guided by his commitment to Islam as the highest ideal.

Muhammad Abdullah, professor of Urdu in the University of Dacca, throws light on the wider implications of Khudism, on how it enables man to subordinate nature to his creative purposes in the creation of a world after his heart's desire. Man alone in the whole universe possesses this power, a fact which explains why he is truly God's vice-gerent on earth.

Iqbal had his eyes fixed on posterity, writes Ghulam Mustafa, who argues that this must have been due to the way he reacted to the chaos and anarchy he noticed in the present world. The poet was opposed to passive sufism; his rejection of pantheism was unqualified; and he believed that Islam offers a synthes is of matter and spirit which holds the key to mankind's true salvation.

Muhammad Mahfuzullah writes on Farrukh Ahmad's translations from Iqbal and draws attention to his influence on the Bengali poet. To poets like Farrukh Ahmad Iqbal was a source of inspiration both literary and philosophical.

Tajammul Husain in his note calls attention to the role played by religion in European education, a fact attested by the invariable presence of a chapel on each campus, and says that it was Iqbal's recognition of this truth which led him to emphasise that education divorced from religion was meaningless. Mr Husain also refutes the belief that Iqbal's dream of Pakistan did not include the eastern part of the subcontinent. He shows by a quotation from a letter written by the poet to Muhammed Ali Jinnah that Bengal had a definite place in his scheme.

Zulfiqar Ahmad Qismati writes that the Mujahideen in Kashmir draw their inspiration from Iqbal's belief in every racial group's right of self-determination.

Fahmidur Rahman discusses the nature of Iqbal's Insan-i-Kamil. The concept is derived from Iqbal's understanding of the character of the Prophet of Islam who exemplified the perfection that man is capable of achieving. Insan-i-Kamil in Iqbal's view must possess three characteristics : he must have patience and tolerance, courage and selflessness. Selflessness implies non-attachment to the world.

Matiur Rahman Mallik and Abu Naim illustrate humour in Iqbal's writings. They say that the usual view that Iqbal was much too serious to have a sense of humour is without foundation.

A.F.M. Husain Ahmad describes Iqbal's Khudism as a call for a struggle against wrong and evil in the world. It has to be looked upon as a jihad.

Far uk Ahmad offers a Bengali translation of Dr. Muhammad Baqer's essay on Iqbal and Sufism.

We are also printing a translation of Iqbal's essay on the essence of Muslim culture which is the work of several hands.

The article by Shariful Mujahid is an assessment of the works of Dr. Muhammad Abdullah who is recognised as one of the leading Iqbal scholars in Bangladesh today. He has been writing for decades on Muslim thinkers and writers and leaders in general. One of his books is a work in Urdu on Nazrul Islam, the only book of its kind.

'আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন' শীর্ষক সেমিনার

আহমেদ সেলিম রেজা

আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মর্মবাণীর সার্থক ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রপথিক ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের ৫৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ২১শে এপ্রিল। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ 'আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে হোটেল প্রীতম-এর তৃতীয় তলায়। সভাপতি বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ইকবাল স্কলার ডঃ আবু সাঈদ নূর উদ্দীনের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংসদ উপদেষ্টা জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ গাজি দোস্ত। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ঢাকাস্থ হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামালও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সংসদ উপদেষ্টা এবং সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটির চেয়ারম্যান, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-সাবেক তথ্যমন্ত্রী, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বাংলাদেশ, ইবনে সীনা ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ-সৌদি আরব মৈত্রী সমিতির প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মুজীবুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সংসদ উপদেষ্টা প্রিন্সিপাল কে, এ, রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডঃ এ· কিউ· ফজলুল ওয়াহিদ, দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক কবি আল মুজাহিদী ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সংসদ উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

আলোচনায় বক্তাবৃন্দ ইকবালের কালজয়ী আবেদনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। বক্তারা বলেনঃ ইকবাল-দর্শন চর্চা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য। কারণ, ইকবাল সাহিত্য ও জীবন-দর্শনে কুরআন-সুন্নাহ ও মৌলিক শিক্ষাকে লালন করেছেন। ইকবালের এই তৌহিদী শিক্ষা জাতিকে জাগরণশক্তি যুগিয়েছে। তাঁরা বলেন, আজকে আন্তঃদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ও নৈতিক অবক্ষয়ের মোকাবেলায় ইকবালের দর্শন আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাঁরা বলেন, জাতির এই দুর্যোগের দিনে ইকবাল দর্শনের শিক্ষা হলো আত্মশক্তি অর্জন করা এবং বিবেক-বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জয় করা।

ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ গাজি দোস্ত প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, শুধু এ উপমহাদেশেই নয়; সারা বিশ্বের মুসলমানদের অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে আজ ইকবাল চর্চার প্রয়োজন অনেক বেশি। ইকবাল মুসলিম উম্মাহকে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যাওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আল্লামা ইকবাল শুধু একজন মহান ব্যক্তিই নন; তিনি

একটি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শনের মাঝে কোন ধরনের দ্বিধা বা আপোষকামিতা ছিলো না।

এডভোকেট মুজীবুর রহমান বলেন, ইকবালের সমগ্র দর্শন চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আল কুরআন। তিনি মুসলিম উম্মাহর কাছে ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তিন–চতুর্থাংশ অমুসলিম অধ্যুষিত অখণ্ড ভারতে ইসলামের নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন আল্লামা ইকবাল।

প্রিন্সিপাল খোন্দকার আতাউর রহমান বলেন, ইকবাল পৃথিবীর এক মহত্তম মানবতাবাদী কবি। ইকবাল চর্চা করলে আমাদের তরুণ সমাজ নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য নব–উদ্দীপনা এবং দিক–নির্দেশনা খুঁজে পাবে।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, ইকবাল দর্শনের মূল কথা খুদী বা আত্মশক্তি এবং বেখুদী বা স্বার্থ বিসর্জন। ইকবাল প্রকৃতি নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি প্রকৃতি স্টাডি করে বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জয় করতে বলেছেন।

ডঃ এ· কিউ· ফজলুল ওয়াহিদ বলেন, প্রতিভাবে কোন ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। প্রতিভা বিশ্বমানবতার জন্য। আল্লামা ইকবাল বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শন থেকে উপকৃত না হলে তাতে ইকবালের কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি আমাদেরই হবে।

কবি আল মুজাহিদী বলেন, সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দী করার যে ষড়যন্ত্র চলছে ইকবাল চর্চা করে আমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারি। আমাদের জাতিসত্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে ইকবাল চর্চার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর থেকে ইকবালকে উপস্থাপন করা হলে তিনি নোবেল পুরস্কার অবশ্যই পেতেন। তিনি হাতে গোনা ডজনখানেক কবির মধ্যে অন্যতম।

জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ইকবালের খুদী দর্শনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে বলেন, ইকবালের দর্শন জীবন ও সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। জাতীয় জীবনের বর্তমান সংকটময় সময়ে তাঁর দর্শন আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এর পূর্বে তিনি ঘূর্ণিদুর্গত, পীড়িতদের জন্য এবং যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মুনাজাত করেন।

ডঃ আবু সাঈদ নুরু উদ্দীনের মূল প্রবন্ধে বলা হয়, খুদী দর্শন প্রচার করাই আল্লামা ইকবালের জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো। আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর এ জীবন দর্শন আজ সারা বিশ্বে নন্দিত ও বহুল আলোচিত।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সভাপতির ভাষণে বলেন, আল্লামা ইকবাল মুসলিম উম্মাহকে এক নতুন চিন্তা ও দর্শন উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁর চিন্তা জ্ঞানের জগতে নতুন নতুন দিকের উন্মোচন করেছে। তাঁর খুদীর ধারণা বিশ্ব সাহিত্যে নতুন সংযোজন।

সেমিনারে ইকবালের উর্দু গজল আবৃত্তি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ডঃ উম্মে কুলসুম।

সংসদের আজীবন সদস্য এডভোকেট মীজানুর রহমান ভূঁইয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে চা চক্রের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

সেমিনারের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব চৌধুরী গোলাম মাওলা ও জনাব আনোয়ারুল হক।

আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন' শীর্ষক সেমিনার

আল্লামা ইকালের ৫৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে হোটেল প্রীতমে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ গাজ্ঞি দোস্ত

সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন। উপবিষ্ট ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান ও ইরানের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার কামাল ও মোহাম্মদ গাজ্জিদোস্ত

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন   সৈয়দ তোসারফ আলী   প্রিন্সিপাল কে. এ রহমান   এডভোকেট মুজীবুর রহমান   ডঃ মুহাম্মদ আবদুল

ডঃ এ কিউ. ফজলুল ওয়াহিদ   কবি আল মুজাহিদী   মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম   ডঃ উম্মে কুলসুম   মাহমুদুল হাসান

"আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন" শীর্ষক সেমিনারে শ্রোতৃবৃন্দের একাংশ ..

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30994
LAHORE

B 2

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No.........
LAHORE

00030994